**KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA**
**18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009**

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication : ৫৪ সুকিয়া স্ট্রীট, কল-০৬ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : আচার্য্য রহমান |
| Title : চতুরঙ্গ | Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number : ২০/১<br>২০/২<br>২০/৩<br>২০/৪ | Year of Publication : বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৬৮<br>শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৬৮<br>কার্তিক - পৌষ ১৩৬৮<br>মাঘ - চৈত্র ১৩৬৮ |
| | Condition : Brittle Good |
| Editor : মুহম্মদ কবির | Remarks : |

C.D. Roll No. : KLMLGK

# চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮

॥ সূচীপত্র ॥

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ॥ প্লেট নদীর তীরে রবীন্দ্রনাথ ১৯৬
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ॥ বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ ১৯৩
আইজায়া বার্লিন ॥ রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ ২০৪
লর্ড হেলসাম ॥ রবীন্দ্রনাথ ২১৬
আঁদ্রে অস্টারলিং ॥ রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার ২২১
হিরণকুমার সান্যাল ॥ আধুনিক সাহিত্য ২২৪
সমালোচনা—অমলেন্দু বসু, নীহাররঞ্জন রায়,
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ,
হ্যারলড ল্যাস্কনেস, হরপ্রসাদ মিত্র,
ভবতোষ দত্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়,
দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ রায়,
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, সুধাংশু ঘোষ ২২৯

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

ত্রয়োবিংশতিতম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা চতুরঙ্গ কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৬৮

# প্লেট নদীর তীরে রবীন্দ্রনাথ

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুনলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুয়োনেস এয়ার্স হয়ে পেরু যাবেন। সেই থেকেই কবির জন্যে কি অধীর আমাদের প্রতীক্ষা। আমরা যারা জিদ-এর ফরাসী অনুবাদে, ইয়েটস-এর ভূমিকা সংবলিত তাঁর নিজের অনুবাদে ও জুয়ান র‍্যামন জিমেনেজ-এর স্ত্রী জেনোবিয়া ক্যামপ্রুবি-র স্প্যানিশ ভাষার অনুবাদে তাঁর কবিতা পড়েছি তাদের কাছে সে বৎসরের সেটা একটা মস্তবড় ব্যাপার। আমার জীবনে ত সেটি মহত্তম ঘটনাবলীর একটি।

তখন "লা নেসিঁয়" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে সবে আমি সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি। ওই পত্রিকায় আমি প্রথম যে তিনটি প্রবন্ধ পাঠাই তার বিষয়গুলি উল্লেখ করবার মত। প্রবন্ধ তিনটির বিষয় হল 'দান্তে' 'রাস্কিন' ও 'মহাত্মা গান্ধী'। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে সেগুলি প্রকাশিত হয়। চতুর্থ প্রবন্ধটির নাম ঠিক হয়েছিল, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা পাঠের আনন্দ'। রবীন্দ্রনাথকে সংসঙ্গেই আলোচনা করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁর সঙ্গীদের একজন তাঁর স্বদেশবাসী। একজন ইতালীয় কবি, একজন ইংরেজ প্রবন্ধকার ও আমার পূজনীয় যে ভারতবাসীর যথাযোগ্য বিশেষণ আমি খুঁজে পাই না—এই তিনজনকেই আমার আলোচনার বিষয় করা থেকে আমার সাহিত্যিক ক্ষমতার দৌড় না হোক মনের ঝোঁক কোনদিকে তা অন্ততঃ বোঝা গেছে।

সান ইসিদ্রোতে সেবার মধুর উষ্ণ বসন্ত অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই সঙ্গে গোলাপ ফুলের আশ্চর্য ছড়াছড়ি। সারা সকাল সমস্ত জানলা খুলে দিয়ে আমি সেই গোলাপের গন্ধ উপভোগ করতাম আর রবীন্দ্রনাথ পড়তাম। তাঁর কথা ভাবতাম, তাঁকে চিঠি লিখতাম আর তাঁর প্রতীক্ষা করতাম। তখনকার সেই পড়া লেখা ভাবা আর অপেক্ষা করার ফলই পরে "লা নেসিঁয়"-তে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জন্যে সেই পথ চেয়ে থাকার দিনে একবারও ভাবতে পারিনি যে কবি সান ইসিদ্রোর শৈলবাসে একদিন আমার অতিথি হবেন। বুয়োনেস এয়ার্স-এ স্বল্পকালের অবস্থানের মধ্যে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে দেখা করবার তিনি সময় পাবেন এ আশা করার সাহসও হয়নি। আমি অবশ্য ভক্তদেরই একজন।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা পাঠের আনন্দ' প্রবন্ধটি আমি আবার পড়েছি। এ প্রবন্ধের নাম 'রবীন্দ্রনাথের জন্যে প্রতীক্ষা'ও দেওয়া যেত। "টেস্টিমোনিয়স" নামে পরে প্রকাশিত আমার রচনা সংগ্রহে এ প্রবন্ধটি আমি দিইনি, কারণ রবীন্দ্রনাথকে পৃথকভাবে একটি বই উৎসর্গ করার বাসনা আমার ছিল।

উল্লিখিত প্রবন্ধটিতে ফরাসী লেখক প্রুস্ত ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনামূলক একটা আলোচনার চেষ্টা ছিল। একদিকে পাশ্চাত্ত্য জগতের অস্থির যন্ত্রণার একজন প্রতীক, আর একদিকে এক বাঙালী মনীষী যিনি শুধু প্রাচ্যের প্রতিভূ নয়, পূর্ব ও পশ্চিমের সেতুবন্ধনের সূচনাস্বরূপ।

আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর শুভমুহূর্তে তাঁর কাছে আমার ঋণের কথা বলার প্রয়োজন আমি অনুভব করি, তাঁর জন্মভূমির মানুষ যাতে আমার আমার কথা শুনতে পায়। তাঁর সঙ্গে আবার আলাপ করার এই সবচেয়ে ভালো উপায়। ১৯২৪ সালের সেই গোলাপের প্রাচুর্যে ভরা বসন্তে জীবনের মত যত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে পেয়েছিলাম আজও তেমনি পাচ্ছি, কারণ 'অসতো মা সৎ গময়ঃ' তিনিই আমায় শিখিয়েছিলেন।

"গীতাঞ্জলি" আমার হাতে যখন প্রথম আসে তখন তা যুগল আশীর্বাদের মতই হয়ে উঠেছিল, কারণ তখন আমার জীবনে এমন একটি সংকটকাল চলছে যৌবনের কাছে যা উদ্দেশ্যহীন বলে মনে হয়। কোনো একজনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার প্রয়োজন আমি অনুভব করেছিলাম। একমাত্র ঈশ্বরকেই সেই একজন ভাবা যায়। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার ছিল না, অন্তত প্রতিহিংসাপরায়ণ সংকীর্ণচিত্ত চিররুষ্ট সীমিত যে ঈশ্বরকে আরাধনা করতে আমায় বৃথাই শেখানো হয়েছিল সে ঈশ্বরে নয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি এই অবিশ্বাস আমার জীবনে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল এবং সে সঙ্কটে অভাবের ভেতর দিয়েই একটা উপস্থিতির তীব্র অনুভূতি হয়ে উঠছিল। সেই অনুভূতিই আমায় যেন বলেছে—একমাত্র আমার কাছেই তোমার হৃদয় তুমি উন্মুক্ত করতে পার। আমাকে ছাড়া দুঃসহ তোমার নিঃসঙ্গতা।

মনের এই অবস্থায় আমি "গীতাঞ্জলি" খুলে ধরি :—

বিধিবিধান বাঁধন ডোরে
ধরতে আসে, যাই যে সরে
তার লাগি যে শাস্তি নেবার
নেব মনের তোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

রবীন্দ্রনাথ এসব কবিতায় যে প্রেমের কথা বলেছেন তার দ্বারা আমি তখন জর্জরিত নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর এমন একজন, যাঁর কাছে সেই পার্থিব (আমার কাছে পবিত্র) প্রেমের কথাও বলা যায়। মহৎ ক্যাথলিক লেখক Peguy এই প্রেম সম্বন্ধেই বলেছেন যে এ প্রেম হল সেই আরেক প্রেমেরই, 'প্রতিমা ও সূচনা, কায়া ও সাধনা।' সেই আর এক প্রেম, শিরাবাহী যে শোণিতের দুর্বহ ভারে আমরা মর্তভূমিতে বদ্ধ সে ভার যার নেই। Peguy যার জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন আমি যেন সেই ব্যাধ-বিতাড়িত মৃগীর মত, লুকোবার জায়গা না পেয়ে যে ছুটে বেরিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের এইসব কবিতা পড়তে



পড়তে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আমার চোখে জল এসেছিল। অত দূরের বাণীও আমার কাছে অপরিচিত মনে হয়নি।

সংসারেতে আর যাহারা আমায় ভালবাসে
তারা আমায় ধরে রাখে বেঁধে কঠিন পাশে।
তোমার প্রেম যে সবার বাড়া
তাই তোমার-ই নূতন ধারা—
বাঁধ নাকো লুকিয়ে থাক
ছেড়েই রাখ দাসে।

নিজের মনে আমি বলেছিলাম,—হে রবীন্দ্রনাথের দেবাদিদেব, তুমি কিছু থেকেই আমায় আড়াল করতে চাও না, যে অন্ধকারে তোমায় আমি রেখেছি, তাও তুমি গ্রাহ্য করো না। কি গভীর ভাবেই না আমায় তুমি চেনো। তুমি সেই গোপন দেবতা যিনি জানেন চিরদিন আমি তাঁর সন্ধানী। সেই করুণাময় ঈশ্বর, যিনি জানেন তাঁর কাছে আমার যাবার পথ স্বেচ্ছাধীন।

কোন্‌খানে কোন্ মুহূর্তে ব্যাপারটি ঘটে যায় আমার স্পষ্ট মনে আছে। ফিকে ধূসর রেশমী আবরণে সজ্জিত একটি ঘর। শ্বেত মর্মরের একটি অগ্নিকুণ্ডের দেয়ালে আমি তখন হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

সে বাড়িটি আর নেই। যাদের কাছে আমি ব্যথা পেয়েছি সেদিন আর যাদের ব্যথা দিতে পারি বলে আশঙ্কা করেছি তারাও নেই কেউ। নেই সেই কবিও, পরম বন্ধুর পক্ষেও যা অসাধ্য সেই অশ্রুজলের আশীর্বাদ যিনি আমার জীবনে এনেছিলেন। আমার মনে যে সব ছবি শুধু স্মৃতিতে জেগে আছে, আমার সঙ্গেই সে সব অমোঘভাবে শূন্যতায় হারিয়ে যাবে, ইতিপূর্বে সব যেমন গেছে।

আমার চোখের জল যা ঝরিয়ে ছিল সেই "গীতাঞ্জলি" কিন্তু থাকবে। রবীন্দ্রনাথ না তাঁর ঈশ্বরের কথা ভাবছিলাম ঠিক না বুঝেই আমি আবৃত্তি করেছিলাম,—

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

হে রবীন্দ্রনাথের দেবতা!—মনে মনে আমি ভেবেছিলাম,—এমন কেউ কি আছে, যে কোন না কোন ক্ষণে বিরহ বেদনার তীব্রতা অনুভব করেনি, এ বেদনার স্বরূপ সে বুঝুক বা না বুঝুক। মিলনের এই যে আকুতি, কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে, সর্বত্রই প্রেম বলেই অভিহিত।

গীতাঞ্জলির একটি কবিতা এই সূত্রে উল্লেখ করছি—

হেরি অহরহ তোমারই বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কতরূপ ধরে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।

সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়
পল্লব দলে শ্রাবণ ধারায়
তোমারি বিরহ রাজে হে।

## দুই

সেই আমার প্রথম রবীন্দ্রনাথ পড়া আর চোখের জল ফেলার দশ বছর বাদে ১৯২৪ সালের ৬ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ বুয়োনেস এয়ার্স-এ আসেন। রোমেঁ রোলাঁর বইয়ের মাধ্যমে গান্ধীর সঙ্গে, আর প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পর পরই ঘটে। আমার জীবনের আরো অনেক কিছুর মত এই ঘটনাচক্রের মিল এমন বিস্ময়কর যে কোন বিচিত্র নক্সার মত এ জীবন আগেই পরিকল্পিত বলে আমার সন্দেহ হয়েছে।

স্বরাজ, অহিংসা, সত্যাগ্রহ, স্বদেশী প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে কয়েকমাস ধরে আমি যখন পরিচিত তখনই সেই 'মহান প্রহরী' প্লেট নদীতে দেখা দিলেন। দেশপ্রেম দুজনেরই সমান তীব্র হলেও নবভারত নির্মাতা এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে গরমিল যে কত আমি তখনই জানতাম। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও পশ্চিমের সহযোগিতায় বিশ্বাসী। গান্ধী ইংরাজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন একমাত্র আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন মনে করেছেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। সে আন্দোলন যখন চার বৎসর পার হয়েছে তখন রবীন্দ্রনাথ এখানে পদার্পণ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনের কয়েকটি দিকের কথা ভেবে তিনি তখন উদ্বিগ্ন। 'নিজেকে আর সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন দেশের মুক্তি হতে পারে না। হয় সকলের সঙ্গে মুক্তি নয় অবলুপ্তি'—তিনি লিখেছিলেন। ভয় তাঁর গান্ধীকে নয়। গান্ধীকে শাশ্বত কালের একজন মহামানব বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর ভয় ছিল সংকীর্ণ দল পাকান গোঁড়াদের। মহতের বাণী গন্ডলিকার কাছে পৌঁছবার পথে কিভাবে বিকৃত হয় জেনে তিনি শঙ্কিত হয়েছেন।

আর সকলের মত রবীন্দ্রনাথও সুতো কাটুন আর বিদেশী পোশাক পুড়িয়ে ফেলুন। আজ এই আমাদের কর্তব্য—বলেছিলেন গান্ধী।

একদিকে মহাত্মা, আর একদিকে কবিগুরু। অনেকেই আমরা কার দিকে হেলব কাকে বেশী ভক্তি করব বুঝে উঠতে পারি নি।

ভাগ্যই এই দুজনকে প্রায় একসঙ্গে আমার জীবনে আবির্ভূত করেছিল। তাঁদের রহস্যাচ্ছন্ন দেশ থেকে এসে দুজনে আমাকে এই জ্বলন্ত প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিলেন—সুন্দরের সাধনা না সাধুপুরুষ হবার? আমি বুঝেছিলাম যে এঁদের একজনের প্রবণতা নিজের বাইরের কিছুকে নিখুঁত করে তোলার দিকে (যা শিল্পীর ধারা) আর একজনের চেষ্টা তাঁর কর্মের ভেতর দিয়ে নিজেকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার। (যা সাধুপুরুষের সাধনা) লেখক বা যে কোন শিল্পী তাঁর সৃষ্টিকে যতখানি নিখুঁত সৌন্দর্য দিতে পারেন, তাঁর মহত্ত্ব ঠিক ততখানিই। তাঁর নিজের জীবনে সে সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা নাও থাকতে পারে। নিজের জীবন যদি অকলঙ্ক মাধুর্যে মণ্ডিত করতে পারেন তাহলে তাতেই সাধুপুরুষের সার্থকতা। তাঁর জীবন তাঁর শিল্প।

"গীতাঞ্জলি"র ভূমিকায় ইয়েটস লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কোন স্বনামধন্য



স্বদেশবাসী তাঁকে কোন সময়ে বলেছিলেন—আমাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ঋষিপ্রতিম পুরুষ যিনি জীবনকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর বাণী জীবন থেকেই উদ্বুদ্ধ। সেই জন্যেই তিনি আমাদের পরম প্রিয়।

শিল্প ও ঋষিকল্পতা সম্বন্ধে আগে যা বলেছি তার মানে এই নয় যে সত্তার পূর্ণতার কোন দাম রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল না বা তিনি তা অবহেলা করে শিল্পের পরম সৌষ্ঠবকেই বড় করে ধরেছেন। বরং কথাটা ঠিক তার উল্টো বলে আমি ভালো করেই জানি। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে গান্ধীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ছিল অনেক সরল, কারণ যতদূর জানি শিল্পী ও সাধকের যে নিদারুণ দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে গান্ধী তা কখনো অনুভব করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মত গান্ধী বহির্জগতের রূপ-রস সম্বন্ধে একান্ত সচেতন ছিলেন না। তিনি তাই তাঁর সমস্ত প্রেমের সঞ্চয় ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যেই ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। আমাদের এই শতাব্দীতে যে দুজন মহাপুরুষ সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁচেছেন তাঁদের সম্বন্ধে এই অন্ততঃ আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

যে দ্বিধাদ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ সে সময় জর্জরিত ছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করার সময় যার আভাস আমি পেয়েছিলাম বলে মনে করি, এখান থেকে চলে যাওয়ার কিছুকাল পরে লিখিত তাঁর দুটি পত্রেও তার চিহ্ন রয়েছে।

প্রথম চিঠিটি ১৯২৫-এর ১৩ জানুয়ারী 'Giulio Cesare' জাহাজ থেকে লেখা। তিনি লিখছেন :

তুমি দেখেছ অনেক সময় দেশের জন্যে আমার মন কেমন করেছে। এই ব্যাকুলতা ভারতবর্ষের জন্যে ততটা নয়, যতটা সেই শাশ্বত সত্যস্বরূপের জন্যে যার মধ্যে আমার অন্তর মুক্তি পায়। আমার ব্যক্তিসত্তার ওপর যে কোন কারণে মনোযোগ যখন প্রগাঢ় হয়ে ওঠে এই সত্যস্বরূপ তখন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই আমার সত্যকার আবাস, যেখানে আমার মধ্যে যা পরম তা প্রকাশের ডাক পরিবেশের মধ্যেই আমি পাই। কারণ তাতেই অমোঘভাবে আমায় বিশ্ববোধের গভীরতায় নিয়ে যায়। আমার মনের জন্যে এমন একটি নীড় একান্ত প্রয়োজন যেখানে আকাশের বাণী অবারিতভাবে বর্ষিত হতে পারে। আলোক ও মুক্তি ছাড়া আর কোন প্রলোভন সে আকাশের নেই। এই নীড় আকাশকে ঈর্ষা করে' তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার বিন্দুমাত্র উপক্রম করলেই আমার মন যাযাবর বিহঙ্গের মত সুদূর কোন উপকূলে উড়ে যেতে চায়। আলোকের মধ্যে আমার যে মুক্তি তা কিছুক্ষণের জন্যেও ব্যাহত হলেই আমার মনে হয় কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন প্রভাতের মত আমি যেন কোন ছদ্মবেশের বোঝা বইছি। নিজেকে আমি আর দেখতে পাই না, আর এই অস্বচ্ছতা দুঃস্বপ্নের মত তার দুর্বহ শূন্যতায় আমার শ্বাসরোধ করে দেয়। অনেকবার আমি তোমায় বলেছি যে আমার স্বাধীনতা ত্যাগ করবার স্বাধীনতা আমার নেই। কারণ এ স্বাধীনতার ওপর প্রথম দাবী আমার জীবনদেবতার তাঁর নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে। কখনো কখনো এই সত্যটুকু ভুলে গিয়ে আরামের বন্ধনে নিজেকে আমি আলস্যভরে বাঁধা পড়তে দিয়েছি। কিন্তু প্রতিবারই তার পরিণাম হয়েছে সর্বনাশা। রুদ্র এক দেবতা আমায় ভগ্ন প্রাচীরের পথে মুক্ত প্রান্তরে ঠেলে পাঠিয়েছে...

বিশ্বাস করো আমার মধ্যে এমন একটি দাবী কাজ করে যা আমার নয়। মায়ের ওপর শিশুর দাবী ত ব্যক্তির দাবী শুধু নয়, সে দাবী বিশ্বমানবতার, পবিত্র তার উৎস। বিধাতার কোন বিশেষ অভিপ্রায় পূরণের জন্যে যারা আসে তারা ওই শিশুর মত। ভালবাসা ও

আনুগত্য যদি তারা পায় ত নিজেদের উপভোগের জন্যে নয়, তার চেয়ে মহৎ কোন উদ্দেশ্যেই তা নিয়োজিত হওয়া উচিত। শুধু ভালোবাসাই নয় আঘাত ও অপমান অবহেলা ও অস্বীকৃতি তাদের ধুলোয় গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে নয় তাদের জীবনের শিখা আরও উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যেই তারা পায়।

এ চিঠির একটি অর্থ আছে। চিঠি যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন তখন এবং তার অনেক আগে থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং আমি আর এল. কে. এল্মহার্স্ট ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী তাঁকে বিশ্রাম নেওয়াতে চেয়েছিলাম। তাঁকে আরো কিছুদিন থেকে যাবার জন্যে আমি পীড়াপীড়ি করি। একসঙ্গে অনেক লোককে দর্শন দিয়ে তিনি যাতে নিজেকে অতিরিক্ত ক্লান্ত না করেন সে বিষয়েও আমি তাঁর ওপর জোর খাটিয়েছিলাম। তাঁর সম্বন্ধে এই উদ্বেগের দরুণই, রবীন্দ্রনাথকে আমি বেড়া দিয়ে রাখতে চাই বলে লোকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। যে কেউ তাঁর কাছে আসতে চায়, তাদের সকলের জন্য দ্বার মুক্ত না করে রাখার জন্যে রবীন্দ্রনাথও অনুযোগ জানিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর কথামত কাজ করে দিনের শেষে তাঁর অসীম ক্লান্তি দেখে আমি সত্যই অত্যন্ত ভাবিত হয়ে উঠি। কি আমার তাহলে কর্তব্য?

নিজের ঘরে বসে কবিতা লিখে বা বাগানে পায়চারী করে সময় কাটানো রবীন্দ্রনাথের অনেক সময়ে অন্যায় মনে হত। এদিকে ডাক্তারের বিধানের বিরুদ্ধে নিজেকে তিনি ক্লান্তিতে ক্ষয় করছেন দেখলে আমরাও কেমন অপরাধী বোধ করতাম।

সেই বছরেরই আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে আমায় লিখলেন :

রোমে রোলাঁ সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর বাড়ির কাছে একটি স্যানাটোরিয়মে ডাক্তার যতদিন থাকতে বলেন ততদিন আমায় ধরে রাখতে চান। তুমি সেখানে আমায় অভ্যর্থনার জন্যে থাকলে খুশি হতাম। কিন্তু তা বোধ হয় হবে না।...নদীর ধারের তোমার সেই সুন্দর বাড়িটিতে গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলাম না বলে চিঠিতে তুমি দুঃখ প্রকাশ করেছ। তুমি ত জানো না কতবার মনে হয়েছে যদি থাকতে পারতাম। সেই মধুর নিভৃতি থেকে কর্তব্যের আহ্বানই আমায় টেনে বার করেছে। সেই নিভৃত কোণটি যেন শুধু নিষ্ফল আলস্যে কাটাবার জন্যেই তৈরী মনে হয়। কিন্তু আজ দেখছি যে সেখানে যখন ছিলাম তখন অলস অবসর যাদের পক্ষে একান্ত অনুকূল সেই লাজুক কাব্যস্তবকে আমার সাজি প্রতিদিন ভরে উঠেছে। আমি জানি আমার অনেক কষ্টে গড়ে তোলা নানা সংকার্যের কীর্তিস্তম্ভ ধ্বংস হয়ে ধূলি বিলীন হয়ে যাবার বহু পরেও এই কাব্যকুসুমগুলির অধিকাংশই অম্লান থাকবে।...

মনে হয় তাঁর চিঠির ওই দুটি উদ্ধৃতি থেকে কবির দুটি দিক পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এ তাঁর মনের বা বলা যায় তাঁর বিবেকী চেতনার দুটি বিবাদী রূপ।

একদিকে রয়েছে জীবন-দেবতার জন্যে কর্তব্যের খাতিরে আত্মদান। সেই জীবন-দেবতার নির্দেশে কবি এই সত্য উপলব্ধি করেছেন যে আঘাত বেদনা অবহেলা লাঞ্ছনা যাই আসুক না কেন সে সবও প্রেমের মতই তাঁকে গ্রহণ করতে হবে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্যে। আরেক দিকে এক এক সময়ে এই স্বেচ্ছানাস্ত কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি সন্দেহাকুল হন। তাঁর সমস্ত সুকীর্তি ধ্বংস হবার পরও যা বেঁচে থাকবে সেই কবিতাগুলি লেখার প্রেরণা নিষ্ফল আলস্যের মধ্যে যেখানে পেয়েছেন সে আশ্রয় ছেড়ে আসার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে।



তবে এই চিঠিগুলি সান ইসিদ্রোতে থাকবার পর কবি লিখেছিলেন। সুতরাং ঠাণ্ডা লেগে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে তিনি যখন আমাদের দেশে পদার্পণ করেন সেই নভেম্বর মাসে ফিরে যাওয়া যাক। এই ঠাণ্ডা লাগার দরুণ আর ডাক্তারের পরামর্শেই আশাতীতভাবে আমি তাঁর কাছে যাবার সুযোগ পেয়ে এমন কিছু তাঁর জন্যে করতে পারি যার ফলে উপকৃত হই প্রথমে আমি নিজেই। সত্যি কথা বলতে গেলে আমাকে ওইটুকু করতে দিয়ে তিনি আমাকেই বাধিত ও উপকৃত করেন।

এখন যা লিখছি তা আমার রোজনামচা থেকে নেওয়া। এসব রোজনামচা আমি কখনো প্রকাশিত করব কিনা জানি না।

রবীন্দ্রনাথ তখন গ্লাজা হোটেলে আছেন। আমি আর আমার এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়ে দেখা করব ঠিক করলাম। তাঁর সেক্রেটারী এল. কে. এল্মহার্স্ট তাঁর দুর্ভাবনার কথা আমাদের জানালেন। কবি সবে বিশ্রী রকম ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে সেরে উঠছেন। ডাক্তারেরা তাঁকে ভালো করে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে তাঁর হৃদয় যে রকম দুর্বল তাতে আণ্ডিজ পাহাড় পার হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। পেরু-র গভর্নমেণ্ট স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উৎসবের জন্যে তাঁকে যে নিমন্ত্রণ করেছে তা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে লিমা শহরে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করতে হবে। ভারতে ফিরে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথের বুয়েনেস এয়ার্স-এর বাইরে কোথাও বিশ্রাম করা দরকার। শুনে আমি তৎক্ষণাৎ এল্মহার্স্টকে জানালাম যে আমিই সমস্ত ব্যবস্থা করে শহরের কাছে একটি বাগান বাড়ি খুঁজে সেখানে রবীন্দ্রনাথকে পাঠাবার ভার নেব। সান ইসিদ্রোতে যে বাড়িটির কথা আমি ভাবছিলাম সেটি আমার মা-বাবার। তাঁরা সেটি ছেড়ে দিতে পারবেন কিনা তখনো জানতাম না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে থাকতে পারেন, নগর কোলাহলের বাইরে এমন একটি জায়গা অবিলম্বে যেমন করে হোক খুঁজে বার করব ঠিক করলাম। এ আমার কতবড় সৌভাগ্য যে ঠিক তাঁর এই প্রয়োজনের মুহূর্তেই আমি সেখানে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম।

এল্মহার্স্ট-এর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের পর আমরা রবীন্দ্রনাথের সুইট-এ গেলাম। তাঁর সেক্রেটারী আমাদের বসবার ঘরে রেখে বেরিয়ে গেলেন। এই সাক্ষাৎকারের ফল কি হবে সে বিষয়ে মনে মনে তখন আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। লজ্জা সংকোচের অস্বস্তি তখন আমার এত বেশী যে সেখান থেকে পালিয়ে আসবার কথাও আমার মনে উদয় হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের দেখা পেলাম।

স্তব্ধ স্নিগ্ধ অথচ সুদূর (অন্ততঃ আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল) আমাদের দেশের 'লামা'দের মত তাঁর মাথাটি হেলাবার ভঙ্গীতে অসীম অবজ্ঞা ও দর্পই প্রকাশ পেত যদি না গভীর করুণায় তা দ্রব ও শোধিত না হত। বয়স যদিও তাঁর তখন চৌষট্টি (আমার বাবার বয়স) তবু তাঁর হাল্কা বাদামী মুখে একটি বলিরেখাও পড়েনি। মসৃণ ললাটে একটি কুঞ্চন নেই। মাথায় শুভ্র ঢেউ-খেলানো কেশরাশি সুগঠিত স্কন্ধের ওপর নেমে গেছে। মুখের নিচের দিক শ্মশ্রুতে ঢাকা। তাতে ওপরের দিকটা প্রাধান্য পেয়েছে। খড়্গনাসা এবং চিবুক ও ভ্রূর দৃঢ় অথচ নমনীয় গড়ন মিলিত হয়ে একটি বিরল সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। তাঁর কোন কোন আলোকচিত্রে এই রূপটি ধরা পড়ে। নিখুঁত পল্লবে ঢাকা কালো চোখের দৃষ্টিতে যৌবনের দীপ্তি অক্ষুণ্ণ। সে দৃষ্টি যেন শ্মশ্রুর গাম্ভীর্য ও মাথার শুভ্র জ্যোতির্মণ্ডলের মত চুলের প্রতিবাদ। তিনি দীর্ঘকায় এবং দেহের গড়ন পাতলাই বলা

যায়। সুগঠিত হাতদুটির মন্থর ললিত নাড়াচাড়ার ভঙ্গীতে তাদেরও যেন একটি বিশেষ ভাষা আছে মনে হয়। (অনেক বছর পরে বিখ্যাত ভারতীয় নর্তক-নর্তকীদের দেখে তাঁর হাতের এবং ভঙ্গীর কথা আমার স্মরণ হয়েছিল)।

যাঁর সঙ্গে স্বপ্নেই আমি সুপরিচিত এবং যাঁকে শুধু কবিতাগুলির ভেতর দিয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে মনে হয়েছিল, চোখের সামনে সেই সুন্দর মানুষটিকে হঠাৎ উপস্থিত হতে দেখে যেন একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। যার সাক্ষাতের জন্যে সমস্ত মন ব্যাকুল তাকে হঠাৎ সামনে পেলে লাজুক মানুষদের এই অবস্থাই হয়। নিজে রুদ্ধবাক হয়ে আমি আমার বন্ধুকেই কথা বলতে দিলাম। বন্ধুর মন্তব্যগুলো আমার ভালো লাগল না, কারণ আমি নিজে যা বলতে পারতাম তার সঙ্গে সে মন্তব্যের কোন সম্পর্কই নেই। হঠাৎ আমি এই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারে ছেদ টেনে দিলাম। মনে মনে ঠিক করলাম যেভাবে হোক সুযোগ সৃষ্টি করে' এরপর আমি একলাই আসব।

আমি তারপর বাবা-মার কাছে ছুটে গেলাম। গিয়ে শুধু হতাশই হতে হ'ল। কারণ তাঁরা সান ইসিদ্রোতে বাগান বাড়িটি ছেড়ে দিতে পারবেন না বলে জানালেন। আমার এক ভ্রাতৃস্থানীয় আত্মীয়ের কথা তখন মনে পড়ল। কাছেই 'মিরালরিও' নামে তার একটি চমৎকার বাগান বাড়ি ছিল। সে বাড়িটি আমায় ভাড়া দিতে রাজী হল। মনে হল যেন সে আমায় প্রাণে বাঁচিয়েছে। আমি আবার ছুটলাম হোটেলে। এল্‌মহার্স্টকে জানালাম যে দুদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শুধু ঘরগুলো পরিষ্কার, আসবাবপত্রগুলো পালিশ আর 'মিরালরিও'-তে দরকারী জিনিসপত্রের সঙ্গে আমার চাকরদের পাঠাতে যেটুকু দেরী। সে সব দিনগুলো ব্যস্ততায় ভরা। বুয়েনেস এয়ার্স থেকে সান ইসিদ্রোতে যাচ্ছি আর আসছি।

বাগান বাড়িটি নতুন আর বেশ বড়। চুনকাম করা ধবধবে চেহারা, তার মধ্যে জানলার খড়খড়ি পাল্লা সবুজ। 'বাস্কদের বাড়ির ধরনে সেটা তৈরী। বাগানটিও বেশ প্রশস্ত। পাহাড়ের মাথা থেকে স্লেট নদীর দৃশ্য অপরূপ। সেটা ছিল সবচেয়ে সুগন্ধী ফুলের মরশুম—'এসপিনিল্লজ', হ্যানিসাক্‌ল্‌ গোলাপ। ফুলগুলি অন্ততঃ অতিথির মর্যাদা রাখবে।

রবীন্দ্রনাথের সান ইসিদ্রো যাবার তারিখ ১২ই নভেম্বর একদিন সত্যিই এসে গেল। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে আর দেখা করিনি। সেদিন তাঁর হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন করবার কথা। এইসব হোমরা-চোমরা-রা নতুন বিশিষ্ট কেউ এলে ঠিক তাদের পাকড়াও করেন, থিয়েটারের নটনটীর মত তাঁদের নিয়ে শুধু হুজুগ করবার উদ্দেশ্যেই অবশ্য। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কবিকে আবোল-তাবোল আজগুবি প্রশ্ন করে নিশ্চয়ই ব্যতিব্যস্ত করবেন ভেবে আমার অত্যন্ত বিরক্তি হচ্ছিল। আমি লজ্জিত বোধ করছিলাম। মেজাজটাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

গাড়ি করে প্রায় তিনটের সময়ে যখন তাঁকে আনতে গেলাম তখন শহরে প্রচণ্ড ঝড় বইছে। ধুলোর ঘূর্ণিতে আমরা ঢাকা পড়ে যাচ্ছি। প্লেন গাছের ছেঁড়া কচি পাতা আর কাগজের টুকরো এদিকে থেকে ওদিকে ফুট-পাথের ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। আকাশের খানিকটা হরিদ্রাভ আর খানিকটা সিসের মত কালচে। বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টি নামার দেরী নেই। নিয়ে আসতে যে আধঘণ্টা লাগল তার সারাক্ষণই এই এক অবস্থা, বাড়ির ভেতর প্রবেশ করাটা তাই তুলনায় অত মধুর লাগল। বাইরের গাছগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ, ঘরগুলির স্তব্ধতাকে যেন গভীর করে তুলেছে। সমস্ত ঘর আমি ফুলে ভরে দিয়েছিলাম।



সেই ফুলগুলি আর বাড়িটির নির্জনতা দরজা বন্ধ করার সঙ্গে যেন আমাদের অভ্যর্থনা জানালে।

সেই বিকেলেই আকাশ কোনো কোনো দিকে কালো আর কোনো দিকে সোনালী হয়ে উঠল। এ রকম জ্বলন্ত আর সেই সঙ্গে ভয়াল গাঢ় আকাশ আমি আগে কখনও দেখিনি। নদীতীর আর গাছগুলির সবুজ যেন সেই আকাশের পাণ্ডুরতা আর পীতাভায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নদী তার নিজের ভাষায় ঊর্ধ্বাকাশের দৃশ্য যেন ব্যাখ্যা করছে। রবীন্দ্রনাথের ঘরের বারান্দা থেকে আমরা ব্যাহত ঝটিকাক্ষুব্ধ অপরাহ্ণের দিনস্ত বিস্তৃত এই দৃশ্য দেখলাম।

কবিকে বারান্দায় নিয়ে যেতে যেতে বলেছিলাম,—আপনাকে নদীটা আমায় দেখাতেই হবে। সে দৃশ্য অপরূপ করে তোলার জন্যে সবকিছু যেন আমার সঙ্গে সেদিন একজোট হয়েছে মনে হ'ল। গাঢ় মেঘের প্রান্তে উজ্জ্বল আলোর পাড় কি বিস্ময়কর।

পরে এই বারান্দাটি তাঁর একান্ত আপনার হয়ে উঠেছিল। এইখান থেকেই তিনি আরেক বারান্দার আরেক কবি বোদলেয়ারের মত গোলাপী বাষ্পের ওড়নায় ঢাকা সন্ধ্যা দেখছেন। বোদলেয়ার অবশ্য শীর্ণ সিন নদীর পার থেকে দেখেছিলেন।

এ বারান্দার কথা স্মরণ করে পরে কবি শান্তিনিকেতন থেকে আমায় লিখেছেন—আমার দুর্বলতা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।...শরীরের এই অবস্থায় আমার মন অনেক সময়ে সান ইসিদ্রোর সেই বারান্দায় চলে যায়। তোমার বাগানের অজানা লাল নীল ফুলের রাশির ওপর সকালের সেই প্রথম আলো পড়ার ছবিটি আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে বড় নদীটির জলে অবিরাম রঙের খেলা। আমার নির্জন বারান্দা থেকে সে দৃশ্য দেখতে কখনো আমার ক্লান্তি আসেনি।

আমি নিজে থেকেই কবিকে মিরালরিওতে ঢোকার পরই ওই বারান্দায় নিয়ে গিয়েছিলাম। মনে মনে আমি নিশ্চিত যেন জানতাম যে এখান থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি কিছু যদি সঙ্গে নেন তাহলে এই স্মৃতিটুকু অন্ততঃ নিয়ে যাবেন—সকাল বিকেলের আলোয় প্রতিমুহূর্তে বদলানো এই নিসর্গদৃশ্যের স্মৃতি। এ নিসর্গদৃশ্য-ই তাঁকে দেবার যোগ্য উপহার।

এক সপ্তাহ মাত্র রবীন্দ্রনাথ সান ইসিদ্রোতে থাকতে চেয়েছিলেন, তার বদলে সেখানে তাঁকে এক মাস কুড়ি দিন থাকতে হল। কারণ ডাক্তারেরা সবাই দৃঢ়ভাবে জানালেন যে বিশ্রাম তাঁর তখনও একান্ত প্রয়োজন। তাঁকে ডাক্তারদের আদেশ যতখানি সম্ভব মানাতে আমি চেষ্টা করেছিলাম।

তখন ১৪ই নভেম্বর তারিখে লা নেসিয়ঁ'র জানিয়ে দিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অসুস্থ বলে লিমায় গিয়ে রাষ্ট্রপতি লেগুইয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবেন না। সমস্ত উদ্বেগ দুর্ভাবনা সত্ত্বেও যে ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যে এই ব্যাপার ঘটল তার প্রতি আমি মনে মনে কৃতজ্ঞ হইনি বললে মিথ্যা বলা হবে।

নিজে আমি মিরালরিওতে থাকতাম না। কাছেই বাবার বাড়িতে তখন আমি রাত্রি কাটাই। কিন্তু প্রতিদিন আমি মিরালরিওতে যেতাম আর প্রায়ই সেখানে খাওয়াদাওয়াও করতাম। কারণ বাড়িতে আমার কোন রাঁধুনি ছিল না। আমার সব চাকরবাকরকে রবীন্দ্রনাথের সেবাতেই লাগিয়ে ছিলাম। যে মানুষটি আমার অসীম ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র তিনি যেন যতদূর সম্ভব স্বচ্ছন্দ বোধ করেন এই ছিল আমার কামনা। সারাক্ষণ আমার উপস্থিতিতে

হয়ত তিনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন বলে আমার মনে হয়েছিল। তাঁকে খুশি করবার জন্যে আমি আমার হৃদপিণ্ডটাও বুঝি উপড়ে দিতে পারতাম। রাণী চন্দের "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ" থেকে সবেমাত্র আমি জেনেছি যে কবি আমার তখনকার মনোভাব ভুল বুঝেছিলেন। রাণী চন্দের বই-এ দেখছি যে আমি আর্জেনটিনার প্রাচীন এক ঔপনিবেশিক পরিবারের মেয়ে বলে রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, তাঁর সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসতেন তাঁদের সঙ্গে আমি মিশতে চাইতাম না। এ ধারণা আমার জীবনধারা আর আমার অন্তরের অনুভূতির এতখানি বিপরীত যে আমার সম্বন্ধে একথা ভাবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বিবেচনার সঙ্গে সাবধানী হয়েছি বলে নিজের মনে যখন গর্ব অনুভব করেছি তখন দেখছি বোকা স্কুলের মেয়ের মতই আমি ছেলেমানুষী করেছিলাম। আমার আত্ম-ত্যাগের—সত্যি-ই তা আত্মত্যাগ—ভুল অর্থ হয়েছে।

যাই হোক মিরালরিও থেকে দূরে যতক্ষণ থাকতাম সময়টা একেবারে বৃথাই নষ্ট হচ্ছে মনে হত। পরম সৌভাগ্যবতী হয়েও আমি সে সৌভাগ্য সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পারিনি।

লজ্জা আর লোভ, দ্বিধা আর আগ্রহের দ্বন্দ্ব চলছিল আমার মধ্যে। কবির সান্নিধ্যের একটি কণা থেকে বঞ্চিত হতে চাইনি বলে, অনেক সময়ে তাঁকে উত্যক্ত করবার সাহস না পেয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি রান্নাঘরে রাঁধুনি বা ভাঁড়ারে বাটলার যোশে ও তাঁর স্ত্রী ফিলোমেনার সঙ্গে সুদীর্ঘ আলাপ চালাতাম। তারা সত্যিই সুখী। মিরালরিওতে তারা সারাক্ষণ কবির সেবায় তাঁর সান্নিধ্যে থাকতে পায়। আমি তাদের ঈর্ষা করতাম।

বিকেলে সাধারণতঃ চায়ের সময়ে একবারের মত সাহস করে আমি তাঁর দরজায় ভীরু করাঘাত করতাম। যেন আমি বাইরের জগতের কেউ।

কে বিজয়া? সারাদিন খুব ব্যস্ত ছিলে!—তিনি বলতেন।

নিজের ভাষাহীনতাকে ঘৃণা করে মনে মনে বলতাম যে ব্যস্ত সত্যিই ছিলাম শুধু আপনাকে যথাসময়ে দেখতে আসার অপেক্ষায়।

এমনিভাবে একটু একটু করে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বিভিন্ন ভাবের ঘোরের মধ্যে আমি জানলাম। একটু একটু করে কখনো অশান্ত কখনো নিতান্ত অনুগত এমন একটি তরুণ প্রাণকে তিনি জয় করে' নিলেন, শুধু অশোভন বলেই পোষা কুকুরের মত যে তাঁর দরজার বাইরে শুয়ে থাকতে পারেনি।

## তিন

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপরতন আশা করি।

আর্জেনটাইনে যতদিন ছিলেন প্রায় তার সবটাই রবীন্দ্রনাথ সান ইসিদ্রোতে কাটান। শুধু হপ্তা খানেকের জন্যে ৪০০ কিলোমিটার দূরে মার দেল প্লাটার কাছে একটি জায়গায় গিয়েছিলেন। সেই নভেম্বর মাসের একটি খবরের কাগজে দেখছি Punta chica-র মুনি বলে তাঁর উল্লেখ করেছে। (Punta chica সান ইসিদ্রোর শেষ অন্তরীপ। বাগান বাড়িটি তার কাছেই ছিল।)

যদিও আমাদের দেশে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিকদের জানিয়ে



দিয়েছিলেন যে তিনি শিক্ষাগুরু ও কবি, রাজনীতিবিদ নন এবং সেই সঙ্গে এ কথাও স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে গত তিন বছর ধরে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর পথের ছাড়াছাড়ি হয়েছে, তবু আমি বুঝতে পারছিলাম ভারতের ও পৃথিবীর রাজনীতির আলোড়ন তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। সে সময়ে আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতাম না। (এখনো জানি না।) তাদের ছোট বড় সব ভুল, বড় বুকনির নামে আসলে ঠেলাঠেলির ঝগড়া, প্রতিবেশীর নিন্দা আর নিজেদের সাধুতা আর ন্যায়নিষ্ঠতার প্রশংসা, এ সবই আমার অজানা ছিল। সে সমস্ত গলাবাজি আমার কাছে নেহাৎ ফাঁপা ফাঁকিবাজি বলে মনে হ'ত। বিরক্তি ধরে যেত সে সব শুনে।

তবু ভারতবর্ষে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কিছুটা খবর আমি জানতাম এবং গান্ধীকে আবিষ্কার করে তাঁর ভক্ত হওয়ার দরুণ, পাছে আমার মূঢ়তায় রবীন্দ্রনাথ আঘাত পান এই ভয়ে একটি কথাও সে বিষয়ে বলতে সাহস করতাম না। আর কি-ই বা আমি বলতে পারতাম আমার চেয়ে হাজার গুণ ভালো করে যা তাঁর জানা ছিল না। তাঁর দেশ তখন যে সংগ্রামে নিযুক্ত তার দরুণ যদি তিনি দুঃখ পান তা হলে সে দুঃখ বাড়াবার জন্যে সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা আমার সাজে না। সাংবাদিকের মন আমি পাইনি। বড় লেখকদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বকে আমি ব্যবসার মূলধন করিনি কখনো কিংবা আমার অতিথি হবার দরুণ তাঁদের নিংড়ে বার করা রস আমার পাঠকদের জোলো লেখুর সরবৎ হিসেবে পরিবেশন করিনি।

আমি জানতাম ভারতের খবর পেলে তিনি অস্থির বিষণ্ণ হতেন। তাঁর মেজাজ বদলে যেত। তাঁর মধ্যে এসব লক্ষণ দেখলেই আমি বুঝতাম ভারতবর্ষের খবর এসেছে। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করবার সাহসটুকু পর্যন্ত না পেয়ে আমি তাঁর ঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম।

কোন কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একেবারে শিশু ছিলেন। এমন অসামান্য একজন মানুষ সম্বন্ধে এ কথা বলার জন্যে আমি মার্জনা চাইছি। কিন্তু যাঁরা মহৎ তাঁদের মহত্ত্বের এটিও একটি অঙ্গ যে সাধারণ মানুষ যে সামান্য মুক্তিকায় গড়া মহৎ হলেও তাঁরাও তাই। যদি তাঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে শুধু বীর বিজ্ঞ ও অভ্রান্ত হতেন তাহলে তাঁদের হয়তো শ্রদ্ধা করতাম অনেক বেশী কিন্তু ভালবাসতাম অনেক কম। ঠিক মনে নেই কোন ফরাসী লেখক যেন বলেছিলেন,—নিখুঁতে অরুচি!

গান্ধীর সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু প্যারিসে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। আধ্যাত্মিক শক্তিতে আমায় অভিভূত করলেও তাঁকে দেখে মন বিরূপ হয়নি। হয়ত তাঁরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিছু খুঁত ছিল। কিংবা হয়ত হৃদয়ের পবিত্রতায় যে চরম উৎকর্ষের কাছে তিনি পৌঁছেছেন চিন্তার ক্ষেত্রে সে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছোতে পারেননি।

পুরানো খবরের কাগজের তাড়া ঘেঁটে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি লেখা হয়েছিল খুঁজলাম। দেখলাম তিনি যেন নিজেকে ক্লান্ত না করেন, ডাক্তারদের সেই অনুজ্ঞার কথা সেখানে রয়েছে। সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত কবিকে বাধ্য হয়েই কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যে দায়ী ছিলাম আমি আর এল্মহার্স্ট। ডাক্তারদের কথা যাতে তিনি মানেন তাই দেখাই আমাদের কাজ। রোগীর বক্তব্য হল—'যারা আমাকে দেখতে চায় তাদের সঙ্গে আলাপ করা আমার কর্তব্য।' আমাদের তাতে উত্তর—আবার পাল্টা অসুখে না পড়েন তা দেখার দায়িত্ব আমাদের। তাঁর কথায় সায় দেওয়া আমাদের

পক্ষে অসম্ভব। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দর্শনপ্রার্থীদের আমরা ঢুকতে দিচ্ছি না, হয় তিনি এই অভিযোগ করবেন, নয় ভাগ্য ভালো হলে ভক্তদের সঙ্গে আর মন্দ হলে হুজুগবাজদের সঙ্গে কথা বলে দিন কাটিয়ে নিজেকে ক্ষয় করবেন। পাছে তিনি অপ্রসন্ন হন এই ছিল আমার বিষম ভয়, কিন্তু অন্য দিকে আবার ভাবনা হতো যে ভয় করে তেমন শক্ত হতে না পারার দরুণ তাঁর আরোগ্য লাভে আমি বিলম্ব ঘটাচ্ছি।

আমি যা করছি তার ভঙ্গীটা পাশ্চাত্ত্য কিনা শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রশ্নও করেছি। কিন্তু তারপর অধৈর্যের সঙ্গে ভেবেছি—'দূর হোক গে যাক্ এসব ভাবনা। কবি হোক বা না হোক জ্ঞানী কিংবা মূর্খ যাই হোক মানুষ প্রতীচ্যে যেমন প্রাচ্যেও তেমনি শরীরের যত্ন না নিলে মারা পড়ে।'

নিজের মধ্যে আমার পিতার বয়সী এই মানুষটির ওপর মাতৃত্বের একটি প্রবল দায়িত্ববোধ আমি আবিষ্কার করলাম। সময়ে সময়ে তাঁকে শিশুর মতো না দেখে সত্যিই পারিনি।

তবু সবচেয়ে ভয় ছিল তাঁর কাছে একটা উপদ্রব হয়ে ওঠবার। তাঁর কাছে একটা চিঠি পেয়ে তাই কি আশ্বস্তই না হয়েছিলাম! সে চিঠিতে এই কথাগুলি ছিল,—

যাকে সাধারণ ভাষায় অতিথিবৎসলতা বলা হয়, তার জন্যে কাল রাত্রে তোমায় যখন ধন্যবাদ দিয়েছিলাম তখন আশা করেছিলাম যে যা বলতে চেয়েছিলাম তার অনেকটাই যে অব্যক্ত থেকেছে তা তুমি বুঝবে।

কি নিঃসঙ্গতার ভার যে আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, বিশেষ করে আমার আকস্মিক ও অসামান্য খ্যাতিলাভের পর যে ভার আমার ওপর বিশেষভাবে চেপে বসেছে তা যে কি দুর্বহ, তোমার পক্ষে বোঝা কঠিন। আমি যেন হতভাগ্য সেই এক দেশ যেখানে এক অশুভক্ষণে এক কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। তার ফলে সে দেশের ফুলের আর আদর নেই, বনের গাছ সব কাটা পড়েছে আর ঐশ্বর্য সন্ধানীদের নির্মম দৃষ্টির সামনে অনাবৃত হয়ে সে পড়ে আছে। আমার বাজার দর বেড়েছে আর ব্যক্তিসত্তার মূল্য গেছে হারিয়ে। ব্যথিত বাসনায় অবিরাম পীড়িত হয়ে এই মূল্যই আমি খুঁজতে চাই।

আজ আমার মনে হচ্ছে এই মহার্ঘ দান আমি তোমার কাছে পেয়েছি। আমি আসলে যা তার জন্যেই তোমার কাছে আমার সমাদর, আমার বাইরের অন্য কিছুর জন্যে নয়।

মিরালরিও-তে রবীন্দ্রনাথ সকালবেলায় হয় লিখতেন নয় আমার সঙ্গে একটু-আধটু বাগানে বেড়াতেন। তাঁর ঘরের বারান্দা থেকে তিনি মনোযোগের সঙ্গে দূরবীন দিয়ে আমাদের দক্ষিণ আমেরিকার সব পাখি পর্যবেক্ষণ করতেন; হাডসন পড়তেন। বিকেল-বেলা আসত গাড়ি বোঝাই অনুরাগী ভক্তের দল। তিনি কখনো কখনো পাহাড়ের চূড়ার কিনারায় ঘাসের ওপরই তাদের নিয়ে বসে আলাপ করতেন। ব্যারট্স্ নামে এক ভদ্রলোক তাঁর কাছে প্রায়ই আসতেন। তিনিই মাঝে মাঝে যারা ইংরেজি জানে না তেমন দলের কাছে দোভাষীর কাজ করতেন। অন্য সময়ে এ কাজ আমায় করতে হত।

কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত সব মানুষ আসতেন। থিওজফিস্টরা আসতেন খুব বেশী। রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন ভেবে বোধ হয়। একদিন এক অচেনা মহিলা এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তখুনি দেখা করবার জন্যে জেদ ধরলেন। বৃথাই আমি কবিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলাম। তিনি আমার সব কথা ঠেলে জেদী মহিলার সঙ্গে দেখা করলেন। শেষে আমরা শুনলাম যে মহিলাটি কবির কাছে তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনতে এসেছিলেন।



মহিলাটি নাকি স্বপ্নে হাতি দেখেছেন। ভারতবর্ষে যখন হাতি আছে তখন রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই তাঁর স্বপ্নের মানে জানা উচিত!

সকলের কাছেই সহজলভ্য হওয়ার মানে যে কি তা রবীন্দ্রনাথকে বোঝাবার একটা বড় সুযোগ পাওয়া গেছল। তাঁকে গণকঠাকুর ভাবা সত্যিই চূড়ান্ত ব্যাপার!

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের দেশের সত্যিকার যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তাঁদেরই দেখা করাতে আমি চেয়েছিলাম। যেমন রিকার্ডো গুইরালডেজ। তখনও যে উপন্যাসে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন সেই "ডন সেগুনদো সোম্বা" প্রকাশিত হয়নি। এই উপন্যাসের নায়ক একজন 'গাউচো'। সে পাম্পাস অর্থাৎ আমাদের দেশের বিরাট প্রান্তরের মানুষ। বইটি রিকার্ডোর নিজের প্রদেশের 'গাউচো'দের নামে উৎসর্গ করা।

রিকার্ডো ছিলেন কবি ও ঔপন্যাসিক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সময় তিনি বিখ্যাত হননি। সে খ্যাতি তিনি পেয়েছিলেন তিন চার বছর বাদে তাঁর মৃত্যুর পূর্বাহ্নে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে অসুস্থ হওয়ার দরুণ ডাক্তারদের আদেশে আর্জেনটিনা ও সেখানকার মানুষদের ভালো করে জানবার সুযোগ রবীন্দ্রনাথের হয়নি।

একদিন কবি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ব্যবস্থা করে ক্যাস্ট্রো কোয়ার্টেটকে আমি সান ইসিদ্রোতে আনালাম। জুয়ান জোসে ক্যাস্ট্রো আজ আমাদের একজন অগ্রগণ্য সাঙ্গীতিক।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ থেকে সম্ভবতঃ উদ্বেগজনক সংবাদ পেয়ে একটু বিমর্ষ ছিলেন। দোতালার ঘর থেকে তিনি বার হননি। শুধু দরজাটা একটু খুলে রেখেছিলেন। বাজিয়েরা নিচের খালি হলঘরে বাজাতে বসলেন। আমি শুধু রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে ছিলেন সেইটে দেখিয়ে দিলাম।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় পড়া একটি ঘটনা স্মরণ করে আমি নিজের মনে না হেসে পারিনি। লন্ডনে যখন তিনি একজন তরুণ ছাত্র তখন একজন ইংরাজমহিলার অনুরোধে ইঙ্গভারতীয় এক রাজকর্মচারীর বিধবার বন্ধ দরজার বাইরে তাঁকে স্বরচিত একটি শোক-গাথা গাইতে যেতে হয়েছিল। সারারাত গ্রামের সরাই-এ শীতে কাঁপবার পর তাঁকে সেই বিধবা মহিলার ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে বলা হয়েছিল ভেতরের গৃহস্বামিনীর উদ্দেশ্যে গান গাইতে।

আমার বন্ধুদের অবশ্য বন্ধ দরজার সামনে গান গাইতে হয়নি। ডেবুসি, র‍্যাভেল আর বোরোদিন আধখোলা দরজা দিয়ে কবির কাছে যেতে পারতেন। তরুণ ভারতীয় ছাত্র এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছে বলে এই ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবার ইচ্ছে আমার অনেক সময় হয়েছে। কিন্তু সাহস পাইনি।

সেদিন ফরাসী দুজনের চেয়ে রুশ বোরাদিন তাঁর কাছে কম দুর্বোধ ঠেকেছিল। তিনি যা লিখেছিলেন তা আমার মনে আছে। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে আমাদের ও তাদের (তিনি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের কথা বলছিলেন) সঙ্গীতের বাস দুই ভিন্ন কক্ষে। এক দরজা দিয়ে তারা হৃদয়ে প্রবেশ করে না।'

আমাদের পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত তাঁর কাছে সেই রকমই এলোমেলো লাগত যেমন আমার প্রথম প্রথম একঘেয়ে লাগত তাঁর মুখে শোনা বাংলা গান। এইভাবেই আমি বুঝতে শিখি যে এতদিন যা ভেবেছি তা ভুল। সঙ্গীত সর্বজনীন ভাষা নয়।

অবশ্য র‍্যাভেল দেবুসি বোরোদিন, এমনকি ফাল্লা ও আর্জেনটাইন সাঙ্গীতিক নয়।

তাদের সঙ্গীত যথার্থই বিদেশের আমদানি। কিন্তু আর্জেনটিনার নিজস্ব সেই দরের জিনিস কিই-বা তাঁকে আমি শোনাতে পারতাম? কিছুই না। অবশ্য আর্জেনটিনার লোক-গীতি ও নৃত্যের সুর আছে শোনাবার। সেই জন্যেই রিকার্ডো জুইরালদেসকে তার গীটার সমেত ডাকা হয়েছিল। এটা একেবারে পুরোপুরি আর্জেনটাইনের জিনিস।

রবীন্দ্রনাথ গোড়ার দিকে এখানে থাকতে শীতে কষ্ট পেয়েছিলেন, এখন ডিসেম্বরে তাঁর গরমে কষ্ট হতে লাগল। আমার বন্ধু মার্টিনেজ দে হোজ-দের তাই কয়েকদিনের জন্যে তাঁদের চাপাদমালাল-এ আমায় যেতে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালাম। 'এসটানসিয়ায়' তাঁদের বাড়ি তাঁরা রবীন্দ্রনাথের জন্যে ছেড়ে দিলেন। আমরাও তৎক্ষণাৎ সেখানে রওনা হলাম। আটলান্টিক সমুদ্র থেকে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার দূরে জায়গাটি সত্যিই চমৎকার। মার্টিনেজ দে হোজ-রা বংশানুক্রমে সবাই ইংলন্ডে মানুষ। বিলাতী ধরনে তাঁদের বাড়ি সাজান। বাড়িটি একজন ইংরেজ স্থপতির তৈরী। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—এ বাড়ি অর্থহীন জিনিসে ভর্তি। তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন আমি বুঝি। একদিক দিয়ে তাঁর কথা যথার্থ, (আর্জেনটিনার এস্টানসিয়ায় নিজস্ব আর্জেনটাইন জিনিস দেখবার আশা করার দিক দিয়ে) আরেক দিকে ভুল। সেখানে প্রাচীন স্পেনের আসবাবপত্রও অমনি অর্থহীন হ'ত।

আর্জেনটিনার বিশেষত্ব যাতে ধরা পড়ে এমন কিছু খুঁজতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে সাধারণতঃ বিফল হয়েছেন তা বোঝা যায়। Far away and long ago (অনেক দূরে অনেক আগে) বইটি হাডসন যে আর্জেনটিনা দেখে লিখেছিলেন ১৯২৪ সালে তার অস্তিত্ব ছিল না। আর্জেনটিনায় ভূমিষ্ঠ ওই ইংরেজ লেখকের চোখ দিয়েই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশকে জেনেছিলেন। হাডসনের বর্ণিত অতীত আর্জেনটিনা তখন আর নেই। তা বিবর্তনশীল এমন কি বিপ্লবপন্থী এক তরুণ জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

দেশ দূরে থাক কোন একজন মানুষের অন্তর্প্রকৃতি বোঝা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি ধর্ম ও জীবনধারার অন্য কারো পক্ষে সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ জাহাজ থেকে আমায় লিখেছিলেন —'আমি জাত-পর্যটক নই। অচেনা কোন দেশকে জানবার এবং মনের একটি বিদেশী নীড় গড়বার উদ্দেশ্যে নতুন বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে উপকরণ সংগ্রহ করবার জন্যে যে শক্তি ও উৎসাহ দরকার তা আমার নেই।'

তবু আশ্চর্যের কথা এই যে সান ইসিদ্রোর প্রতি একটি আকর্ষণ তাঁর মন থেকে যায়নি। একদিক দিয়ে অবশ্য সান ইসিদ্রোই তাঁর কাছে ছিল আর্জেনটিনা। একথা তিনি অনেকবার আমায় বলেছেন। 'বিশাল নর্দীটির কাছে যে বাড়িটিতে আমায় রেখেছিলে অদ্ভুত তার পরিবেশ। ক্যাক্টাস ঝোপগুলির বিকট বিচিত্র ভঙ্গিমা তাকে যেন অস্বাভাবিক দূরত্ব দিয়ে ঘিরে রেখেছে। দুস্তর ব্যবধানের পার থেকে সেই বাড়িটির ছবি আমার মনকে এখনো টানে। কোন কোন অভিজ্ঞতা যেন রত্নদ্বীপের মত জীবনের প্রত্যক্ষ মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। মানচিত্রে তাদের অবস্থান-রেখা অস্পষ্টই থেকে যায়। আমার জীবনের আর্জেন-টিনার অধ্যায়ও তাই। তুমি হয়ত জানো, সেই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলি আর সেই মমতা-স্নিগ্ধ সেবার স্মৃতিকে ঘিরে আমার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হয়েছে। পলাতকরা ধরা পড়েছে আর তারা ধরা পড়েই থাকবে, বিদেশী ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে তুমি তাদের কাছে আসতে না পারলেও।'

এ চিঠির তারিখ ১৯৩৯ মার্চ। রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি



বাংলায় "পূরবী" নামে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা থেকে এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার কথা তিনি আমায় জানান। লেখেন—'আমি তোমায় একটি বাংলা কবিতার বই পাঠাচ্ছি। নিজে তোমার হাতে এটি দিতে পারলে আমি সুখী হতাম। বইটি তোমাকে আমি উৎসর্গ করেছি, যদিও এতে কি আছে তা তুমি কখনো জানতে পারবে না। এই বইয়ের বেশীর ভাগ কবিতাই সান ইসিদ্রোতে থাকার সময় লেখা। আশা করি কবির চেয়ে তার কবিতার বইটি তোমার বেশী দিনের সঙ্গী হবার সুযোগ পাবে।'

বুয়োনেস এয়ার্সে পি. ই. এন ক্লাবের সম্মেলনের সময় তাঁকে নিমন্ত্রণ করিনি বলে রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে অনুযোগ করেছিলেন। বলেছিলেন যে বয়সের ভার ও স্বাস্থ্যের অবস্থা অগ্রাহ্য করেই তিনি এখানে আসার জন্যে সমুদ্রে পাড়ি দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

১৯৩০ সালে রোমাঁ রোলাঁ লেখেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেশেই কিছুটা প্রবাসীর জীবন কাটান (তাই জায়গা বদল করে বেড়ানো তাঁর প্রয়োজন)। রোলাঁ লেখেন যে তরুণেরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সরে গিয়ে গান্ধীকে অনুসরণ করছে। "ঘরে-বাইরে"-এর মত উপন্যাসে ভারতবর্ষ নাকি নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছে না।

এই থেকে আর্জেনটিনার এক প্রকাশকের কথা আমার মনে পড়ল। ফর্সটার তাঁর মহৎ উপন্যাসে *A Passage to India* তাঁকে প্রকাশের জন্য দিতে চাওয়ায় তিনি বলে-ছিলেন—'এ বই অনুবাদ করে লাভ কি কারণ ফর্সটার যথাযথভাবে যার কথা লিখেছেন সে ভারতবর্ষ আর কুটিশের অধীন নয়।'

কোন উপন্যাসের সার্থকতা যদি এই সবের ওপর নির্ভর করত তাহলে অনেক আগেই লোক *War and Peace* পড়া বন্ধ করত, কারণ রাশিয়া আর জারদের অধীন নয়। তরুণেরা কিছুদিন কোন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টিকে ভুলে থাকতে পারে। তাদের পরে যারা আসছে তারাই হয়ত সে বই নতুন করে আবিষ্কার করবে। আগের দল তখন বুড়ো হয়ে গেছে।

রোমাঁ রোলাঁ সেই তারিখেই আবার লিখেছেন যে কবির শেষ জীবন দুখের। সময় কাটাতেই তিনি ছবি আঁকা ধরেছেন এবং এই একই কারণে প্যারিসে এমন সব তথাকথিত উঁচু সমাজের লোকের নিমন্ত্রণ চাইছেন ও রাখছেন যাঁরা তাঁর যোগ্য নয়। এ রকম খেলো হওয়ার নিন্দে করছে 'আমাদের ফরাসী বন্ধুরা' (এ-সব সুইস রোমাঁ রোলাঁর নীতিবাগীশ ফরাসী বন্ধুরা বোধ হয়)।

রোমাঁ রোলাঁ যে সময়ের কথা বলছেন আমি তখন প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই ছিলাম। ক্যাপ মার্টিন থেকে ফিরে মাত্র কয়েকদিন তিনি প্যারিসে কাটান। সান ইসিদ্রো-র মত প্যারিসেও আমি তাঁকে দেখাশোনা করি, আর আমার অত্যন্ত অনুগত যে 'ফণি'কে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করতেন সে তাঁর সবকিছু গোছগাছ করবার ভার নেয়। 'ফণি'র আসল নাম এস্তেফানিয়া আলভারেজ। আমার যখন কৈশোর তখন থেকে চল্লিশ বছরেরও বেশী সে আমরণ আমার সহচরী হয়ে সর্বত্র আমার সঙ্গে থেকেছে।

১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথ প্যারিসে কার সঙ্গে দেখা করছেন আর কার সঙ্গে করেননি সব আমার জানা। তাঁর লেখার অনুবাদক জিদ-এর সঙ্গে প্রথম সেবার তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আঁদ্রে জিদ একাই এসেছিলেন। পল ভ্যালেরি, জ্যা ক্যাসু আর মানব সম্পর্কিত মুজিয়ম-এর জর্জেস আঁরি রিভিয়ের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমার অনুরোধে রিভিয়ের কবির ছবিগুলির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। অ্যাবি ব্রেমঁদ অ্যাবি মুজিয়ের ও কাউন্টেস ম্যাথু দ্য নোয়াইয়ের সঙ্গে তিনি মধ্যাহ্ন

ভোজনের নিমন্ত্রণে মিলিত হয়েছিলেন। এই সাত জনের চারজন অন্ততঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে সুবিখ্যাত। তাঁদের অন্ততঃ স্থূল বৈষয়িক বুদ্ধির মানুষ বলা যায় না। ম্যাডাম দ্য নোয়াই-এর অবশ্য বড় বংশে জন্ম আর পল ভ্যালেরিও তথাকথিত উঁচু সমাজের অনেকের বন্ধু। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেলামেশা করবার অযোগ্য তাঁদের কেন ভাবা হবে আমি বুঝতে পারি নি।

রবীন্দ্রনাথ সান ইসিদ্রোতে থাকবার সময় যে খাতায় তাঁর "পূরবী-"র কবিতাগুলি বাংলায় লিখতেন সেটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কবিতার কাটাকুটি নিয়ে তিনি খেলা করতেন। কলম দিয়ে সেগুলো তিনি এক কবিতা থেকে আর এক কবিতায় টেনে নিয়ে যেতেন। তাতে এই খেলাচ্ছলে টানা রেখাগুলো হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠত। আদিম প্রাগৈতিহাসিক সব জন্তু, পাখি, মানুষের মুখ তার ভেতর থেকে উঁকি দিত। তাঁর কবিতার ভুলগুলি নতুন এক রূপলোক সৃষ্টি করে আমাদের দিকে রহস্য মধুর হাসি হাসত বা ভ্রূকুটি করত। এ রকম একটি পাতার ফটো তুলতে দেবার জন্যে তাঁকে আমি মিনতি করেছিলাম। আমার অনুরোধ তিনি রেখেছিলেন। এই খাতাটিতেই চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সূচনা বলে আমার মনে হয়। পেন্সিলে কি তুলিতে তাঁর স্বপ্নগুলি অনুবাদ করবার তাগিদ এইখানেই তিনি প্রথম অনুভব করেন। তাঁর এই রেখার হিজিবিজি আমার এত ভালো লাগে দেখেই তিনি তা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। ছ' বছর বাদে প্যারিসে যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন আর তিনি হিজিবিজি কাটছেন না, সত্যি আঁকছেন। আমার ফরাসী বন্ধুদের সাহায্যে তাঁর ছবির যে প্রদর্শনীর আমি আয়োজন করি তা বিশেষ সফল হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের যে সত্তর বছর বয়সে ছবি আঁকার অদম্য আগ্রহ জেগেছিল এবং বার্লিনে তাঁর ছবি বিক্রি হচ্ছে জেনে তিনি যে নতুন শিক্ষার্থীর মত খুশি হয়েছিলেন তাতে আমি দোষের কিছু দেখি না। ভারতের তখন দুঃসময় চলেছে একথা সত্য। নেতারা সব তখন কারারুদ্ধ। রোমেঁ রোলাঁ অভিযোগ করেছেন যে 'রবীন্দ্রনাথ অন্য জগতে সরে গেছেন।' একথা সত্য যে, যিনি একাধারে শিল্পী ও গুরু, নিজের বাইরে ও ভেতরে নিখুঁত শিল্পের পরাকাষ্ঠা সৃষ্টির আকৃতি যাঁর সমান তীব্র, সেই রবীন্দ্রনাথ তখন এমন এক সংকটাবর্তের মধ্যে পড়েছিলেন যেখানে শিল্পীই বড় হয়ে উঠেছিল। নিজে নিষ্পাপ না হলে কেউ যেন অন্যকে বিচারের দণ্ড হাতে না নেয়। নিজের স্বপ্নসাধকে রূপে বর্ণে অনুবাদ করার এই প্রচণ্ড আকুতির দোলায় যখন তিনি দুলছিলেন তখন সব সত্যকার শিল্পী যা ভাবে তাই তিনি ভেবেছিলেন নিশ্চয়। ভেবেছিলেন—'অনেক অধ্যবসায়ে গড়া আমার সব সৎকার্যের প্রাসাদ চূড়া যখন ধ্বংস হয়ে বিস্মৃতি বিলীন হয়ে যাবে তখনও বহুকাল ধরে আমার এই রেখা রঙের কবিতাগুলি বোধ হয় থাকবে অম্লান।'

### চার

'আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব'

আমাদের দেশে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথের ওপর এমন সব ভক্ত আর হুজুগে নিষ্কর্মার দল উপদ্রব করতে আসত যে স্বাস্থ্যের খাতিরেই তাঁকে রাখতে হত পাহারা দিয়ে।



আগেই এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। কিন্তু যাদের কথা ভাবা যায় না এমন লোকের কাছেও তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলের হুজুগ যে পৌঁচেছিল তা দেখবার জন্যে আমি এ যাবৎ অপ্রকাশিত একটি কাহিনী বলছি। তখন আমরা সান ইসিদ্রোতে থাকি। আমার সহচরী 'ফাঁ' দুটি কি তিনটির বেশী ইংরেজি কথা না জানলেও রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের জিনিসপত্র গোছাতে আর তাঁর পোশাক-আশাকের তদ্বির করতে ফাঁ রোজ তাঁর ওখানে যেত। একদিন তার কাছে শুনলাম যে রবীন্দ্রনাথের পোশাকগুলি জীর্ণ হয়ে এসেছে। শীতের জন্যে তাঁর আরো গরম কিছু পোশাক দরকার। এখন পোশাকের ব্যাপারে Dior-এর যেমন নাম ডাক তখনকার দিনে তেমনি ছিল ফরাসী আচ্ছাদনশিল্পী Paquin-এর। বুয়োনেস এয়ার্স-এ Paquin-এর কারবারের একটি শাখা ছিল। সবচেয়ে ভালো পোশাকের কাপড় সেখানে আমি পাব জানতাম। রবীন্দ্রনাথের একটি জোব্বা নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলাম। পাটল রঙের নরম একরকম পশম পছন্দ করে প্রধান পরিচালিকা অ্যালিসকে আমি রবীন্দ্রনাথের জোব্বাটির হুবহু একটি নকল তৈরী করতে বললাম। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পোশাকের ফরমাস যে তাদের দেওয়া হয়েছে এ কথা ঘুণাক্ষরে কাউকে না জানাতে বললাম। 'কানাকানি এখুনি শুরু হয়েছে টের পাচ্ছি।' বলে তাকে সাবধান করায় অ্যালিস সব রকম দিব্যি গেলে জানালে যে সে একেবারে বোবা হয়ে থাকবে। কোন রকম গুজব যাতে না উঠতে পারে সে জন্য পোশাকটা কোনো ফ্যান্সি ড্রেস বল-এর জন্যে তৈরী হচ্ছে বলে কারিগরদের সে বোঝাবে বলে আশ্বাস দিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—'পোশাকটা পরিয়ে দেখতে কখন যাব।'

পোশাক পরিয়ে দেখার কি দরকার—বলায় অ্যালিস কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর আমায় ধরে বসল দয়া করে তাকে পোশাকটা নিজে নিয়ে যাবার অনুমতি দিতে।

দোহাই আপনার!—সে মিনতি জানালে,—একটিবার শুধু তাঁকে দেখে তাঁর দাড়িটা স্পর্শ করতে চাই।

কি যা তা বলছ—আমি ধমক দিলাম—তাঁর শাদা দাড়ি ত অদ্ভুত কিছু নয়। শাদা দাড়ি আর সবার যেমন হয় তাঁরও তেমনি।

না, না ম্যাডাম—সে ব্যাকুলভাবে প্রতিবাদ জানালে—আমি ফটোতে দেখেছি, তাঁকে দেখতে ঠিক পিতা ঈশ্বরের মত।

এ কথার আর জবাব নেই। কোন প্রাণে আমি অ্যালিসকে জোব্বা পরাবার ছলে পিতা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তাঁর দাড়ি স্পর্শ করতে বাধা দিই। রোমের ভক্তেরা এমনি করেই ত সেণ্ট পিটারের চরণ স্পর্শ করত।

অ্যালিসকে তারপর একদিন সত্যিই দেখা গেল একমুখ আলপিন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর জোব্বার পাড় টেনে দিয়ে হাতার ঝুল ঠিক করছে। রবীন্দ্রনাথ-কে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম—একটু ধৈর্য ধরবেন। অ্যালিস বলে আপনি পিতা ঈশ্বরের মত দেখতে।

কবি ভেবেছিলেন অ্যালিস সামান্য মফস্বলী মেয়েদরজী মাত্র। পোশাক পরিয়ে পরীক্ষা করা শেষ হলে অ্যালিসের সঙ্গে আমি দরজা পর্যন্ত গেলাম। আমার যেন কোন অপরাধের চক্রান্তে জড়িত এমনভাবে তাকে সাবধান করে বললাম—'ভগবানের দোহাই! কাউকে যেন একথা ভুলেও বোলো না।'

ভোজনের নিমন্ত্রণে মিলিত হয়েছিলেন। এই সাত জনের চারজন অন্ততঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে সুবিখ্যাত। তাঁদের অন্ততঃ স্থূল বৈষয়িক বুদ্ধির মানুষ বলা যায় না। ম্যাডাম দ্য নোয়াই-এর অবশ্য বড় বংশে জন্ম আর পল ভ্যালেরিও তথাকথিত উঁচু সমাজের অনেকের বন্ধু। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেলামেশা করবার অযোগ্য তাঁদের কেন ভাবা হবে আমি বুঝতে পারি নি।

রবীন্দ্রনাথ সান ইসিদ্রোতে থাকবার সময় যে খাতায় তাঁর "পূরবী-"র কবিতাগুলি বাংলায় লিখতেন সেটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কবিতার কাটাকুটি নিয়ে তিনি খেলা করতেন। কলম দিয়ে সেগুলো তিনি এক কবিতা থেকে আর এক কবিতায় টেনে নিয়ে যেতেন। তাতে এই খেলাচ্ছলে টানা রেখাগুলো হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠত। আদিম প্রাগৈতিহাসিক সব জন্তু, পাখি, মানুষের মুখ তার ভেতর থেকে উঁকি দিত। তাঁর কবিতার ভুলগুলি নতুন এক রূপলোক সৃষ্টি করে আমাদের দিকে রহস্য মধুর হাসি হাসত বা ভ্রূকুটি করত। এ রকম একটি পাতার ফটো তুলতে দেবার জন্যে তাঁকে আমি মিনতি করেছিলাম। আমার অনুরোধ তিনি রেখেছিলেন। এই খাতাটিতেই চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের সূচনা বলে আমার মনে হয়। পেন্সিলে কি তুলিতে তাঁর স্বপ্নগুলি অনুবাদ করবার তাগিদ এইখানেই তিনি প্রথম অনুভব করেন। তাঁর এই রেখার হিজিবিজি আমার এত ভালো লাগে দেখেই তিনি তা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। ছ' বছর বাদে প্যারিসে যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন আর তিনি হিজিবিজি কাটছেন না, সত্যি আঁকছেন। আমার ফরাসী বন্ধুদের সাহায্যে তাঁর ছবির যে প্রদর্শনীর আমি আয়োজন করি তা বিশেষ সফল হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের যে সত্তর বছর বয়সে ছবি আঁকার অদম্য আগ্রহ জেগেছিল এবং বার্লিনে তাঁর ছবি বিক্রি হচ্ছে জেনে তিনি যে নতুন শিক্ষার্থী'র মত খুশি হয়েছিলেন তাতে আমি দোষের কিছু দেখি না। ভারতের তখন দুঃসময় চলেছে একথা সত্য। নেতারা সব তখন কারারুদ্ধ। রোমেঁ রোলাঁ অভিযোগ করেছেন যে 'রবীন্দ্রনাথ অন্য জগতে সরে গেছেন।' একথা সত্য যে, যিনি একাধারে শিল্পী ও গুরু, নিজের বাইরে ও ভেতরে নিখুঁত শিল্পের পরাকাষ্ঠা সৃষ্টির আকৃতি যাঁর সমান তীব্র, সেই রবীন্দ্রনাথ তখন এমন এক সংকটাবর্তের মধ্যে পড়েছিলেন যেখানে শিল্পীই বড় হয়ে উঠেছিল। নিজে নিষ্পাপ না হলে কেউ যেন অন্যকে বিচারের দণ্ড হাতে না নেয়। নিজের স্বপ্নসাধকে রূপে বর্ণে অনুবাদ করার এই প্রচণ্ড আকৃতির দোলায় যখন তিনি দুলছিলেন তখন সব সত্যকার শিল্পী যা ভাবে তাই তিনি ভেবেছিলেন নিশ্চয়। ভেবেছিলেন—'অনেক অধ্যবসায়ে গড়া আমার সব সংকার্যের প্রাসাদ চূড়া যখন ধ্বংস হয়ে বিস্মৃতি বিলীন হয়ে যাবে তখনও বহুকাল ধরে আমার এই রেখা রঙের কবিতাগুলি বোধ হয় থাকবে অম্লান।'

## চার

'আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব'

আমাদের দেশে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথের ওপর এমন সব ভক্ত আর হুজুগে নিষ্কর্মার দল উপদ্রব করতে আসত যে স্বাস্থ্যের খাতিরেই তাঁকে রাখতে হত পাহারা দিয়ে।



আগেই এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। কিন্তু যাদের কথা ভাবা যায় না এমন লোকের কাছেও তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহলের হুজুগ যে পৌঁচেছিল তা দেখাবার জন্যে আমি এ যাবৎ অপ্রকাশিত একটি কাহিনী বলছি। তখন আমরা সান ইসিদ্রোতে থাকি। আমার সহচরী 'ফাঁ' দুটি কি তিনটির বেশী ইংরেজি কথা না জানলেও রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের জিনিসপত্র গোছাতে আর তাঁর পোশাক-আশাকের তদ্বির করতে ফাঁ রোজ তাঁর ওখানে যেত। একদিন তার কাছে শুনলাম যে রবীন্দ্রনাথের পোশাকগুলি জীর্ণ হয়ে এসেছে। শীতের জন্যে তাঁর আরো গরম কিছু পোশাক দরকার। এখন পোশাকের ব্যাপারে Dior-এর যেমন নাম ডাক তখনকার দিনে তেমনি ছিল ফরাসী আচ্ছাদনশিল্পী Paquin-এর। বুয়েনেস এয়ার্স-এ Paquin-এর কারবারের একটি শাখা ছিল। সবচেয়ে ভালো পোশাকের কাপড় সেখানে আমি পাব জানতাম। রবীন্দ্রনাথের একটি জোব্বা নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলাম। পাটল রঙের নরম একরকম পশম পছন্দ করে প্রধান পরিচালিকা অ্যালিসকে আমি রবীন্দ্রনাথের জোব্বাটির হুবহু একটি নকল তৈরী করতে বললাম। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পোশাকের ফরমাস যে তাদের দেওয়া হয়েছে এ কথা ঘুণাক্ষরে কাউকে না জানাতে বললাম। 'কানাকানি এখুনি শুরু হয়েছে টের পাচ্ছি।' বলে তাকে সাবধান করায় অ্যালিস সব রকম দিব্যি গেলে জানালে যে সে একেবারে বোবা হয়ে থাকবে। কোন রকম গুজব যাতে না উঠতে পারে সে জন্য পোশাকটা কোনো ফ্যান্সি ড্রেস বল-এর জন্যে তৈরী হচ্ছে বলে কারিগরদের সে বোঝাবে বলে আশ্বাস দিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে—'পোশাকটা পরিয়ে দেখতে কখন যাব।'

পোশাক পরিয়ে দেখার কি দরকার—বলায় অ্যালিস কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর আমায় ধরে বসল দয়া করে তাকে পোশাকটা নিজে নিয়ে যাবার অনুমতি দিতে।

দোহাই আপনার!—সে মিনতি জানালে,—একটিবার শুধু তাঁকে দেখে তাঁর দাড়িটা স্পর্শ করতে চাই।

কি যা তা বলছ—আমি ধমক দিলাম—তাঁর শাদা দাড়ি ত অদ্ভুত কিছু নয়। শাদা দাড়ি আর সবার যেমন হয় তাঁরও তেমনি।

না, না ম্যাডাম—সে ব্যাকুলভাবে প্রতিবাদ জানালে—আমি ফটোতে দেখেছি, তাঁকে দেখতে ঠিক পিতা ঈশ্বরের মত।

এ কথার আর জবাব নেই। কোন প্রাণে আমি অ্যালিসকে জোব্বা পরাবার ছলে পিতা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তাঁর দাড়ি স্পর্শ করতে বাধা দিই। রোমের ভক্তেরা এমনি করেই ত সেণ্ট পিটারের চরণ স্পর্শ করত।

অ্যালিসকে তারপর একদিন সত্যিই দেখা গেল একমুখ আলপিন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর জোব্বার পাড় টেনে দিয়ে হাতার ঝুল ঠিক করছে। রবীন্দ্রনাথ-কে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম—একটু ধৈর্য ধরবেন। অ্যালিস বলে আপনি পিতা ঈশ্বরের মত দেখতে।

কবি ভেবেছিলেন অ্যালিস সামান্য মফস্বলী মেয়েদরজী মাত্র। পোশাক পরিয়ে পরীক্ষা করা শেষ হলে অ্যালিসের সঙ্গে আমি দরজা পর্যন্ত গেলাম। আমার যেন কোন অপরাধের চক্রান্তে জড়িত এমনভাবে তাকে সাবধান করে বললাম—'ভগবানের দোহাই! কাউকে যেন একথা ভুলেও বোলো না।'

রবীন্দ্রনাথের পোশাক তৈরী করে দিয়েছে Paquin, এ কথা জানলে যারা চোখ কপালে তুলবে সেই নীতিবাগীশদেরই ছিল আমার ভয়। কিন্তু তিনি যখন ওই পোশাক পরেন আর আমি তা তৈরীও করাচ্ছি, তখন যতদূর সম্ভব সেটা নিখুঁত করবার চেষ্টাই বা করব না কেন? এ তৃপ্তি আমার, শুধু আমার। নিজেকে এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার মত নিষ্ঠাবতী আমি নই। বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারের কিছুই জানতে পারেন নি। আমাদের সব কাজ খুঁটিয়ে দেখে বিচার করেন এমন কেউ যদি কোথাও থাকেন, তিনি আমার এ স্খলন ক্ষমা করবেন আমি জানি।

রবীন্দ্রনাথ ভালো মেজাজে থাকলে সাহস পেয়ে আমি অনেক সময় তাঁকে জ্বালাতন করবার জন্যে বলতাম—গুরুদেব, বিলেতে কিশোর বয়সে যখন আপনি পড়তে গেছলেন তখন নিশ্চয় আপনার সৌন্দর্য ছিল চমকে দেবার মত। সব ইংরেজ মেয়েরাই কি তখন আপনার প্রেমে হাবুডুবু?

গম্ভীরভাবে তিনি বলতেন,—নিশ্চয়ই! তারপর হেসে উঠতেন।

আমার যৌবনে যেমন রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর যৌবনে সেক্সপিয়রকে ভালবেসেছিলেন। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমের সেই উচ্ছ্বাস, অক্ষম লিয়ারের সেই আক্ষেপের প্রচণ্ডতা, ওথেলোর সন্দেহ-দীর্ণ চিত্তের সর্বগ্রাসী আগুন আমাদের মুগ্ধ বিস্ময় জাগাত। আমাদের সীমিত সামাজিক জীবন, আমাদের সংকীর্ণ কর্মক্ষেত্র চারিদিকে এমন একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীনতার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল যে উদ্দাম অনুভূতি সেখানে প্রবেশের পথ পেত না। তাই আমাদের হৃদয় ইংরাজী সাহিত্যের তীব্র আবেগের সঞ্জীবনী আঘাতের জন্যে আপনা থেকেই লালায়িত হয়ে থাকত। আমাদের ত সাহিত্যকলার রসমাধুর্য উপভোগ নয়, বদ্ধ জলার মত বন্যাতরঙ্গকে আনন্দোদ্বেল অভ্যর্থনা।

তাঁর প্রকৃতিবিলাসও ছিল আমার মত। 'আমাদের বাগানের প্রত্যেকটি নারকেল গাছের একটি বিশিষ্ট সত্তা ছিল আমার কাছে।'

স্বাধীনতা সম্বন্ধেও তাঁর মত আমার সঙ্গে মিলত।

'শাসন যাদের হাতে তারা স্বাধীনতা হরণ করে রাখবার কারণ হিসেবে এই যুক্তিই বারবার শোনায় যে স্বাধীনতার অপব্যবহার হতে পারে। কিন্তু সে সম্ভাবনা না থাকলে স্বাধীনতাই ত অর্থহীন। অপব্যবহারের ভেতর দিয়েই সব কিছুর ব্যবহার শেখা যায়। আমার নিজের বেলা বলতে পারি যে স্বাধীনতা পেয়ে যদি কিছু ভুল কোথাও করে থাকি তবে তাই থেকেই সে ভুল শোধরাবার পথ সব সময়েই খুঁজে পেয়েছি। শারীরিক বা মানসিক কর্ণমর্দন করে যা আমায় জোর করে গেলাবার চেষ্টা করা হয়েছে, তা আমি কখনো নিজের করে নিতে পারি নি। স্বাধীনভাবে যেখানে আমি নিজের খুশিমত ছাড়া পাই নি সেখানে দুঃখই পেয়েছি শুধু। আমার দাদা জ্যোতিরিন্দ্র আমায় নিজস্ব আত্মোপলব্ধির পথে যাবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাইতেই আমার অন্তর্প্রকৃতির কাঁটাও যেন গজিয়েছিল, তেমনি তার ফুলও। এই অভিজ্ঞতা থেকেই মন্দকে যত না আমি ভয় করতে শিখেছি ভালো করার জবরদস্তিকে তার চেয়ে বেশী। নৈতিক কি রাজনৈতিক যে কোন পিটুনি পুলিসেই আমার দারুণ আতঙ্ক।'

ধর্ম সম্বন্ধে একমাত্র তাঁর ধারণাই আমার সমীচীন মনে হয়েছে। 'বাহ্যিক শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম আমরা পাই তা কখনো আমাদের সত্যি আপন হয় না। তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু অভ্যাসের। অন্তরের ধর্ম লাভ করা মানুষের সারাজীবনের সাধনার অভিযান। চরম



দুঃখ না পেলে তার জন্ম হয় না। নিজের প্রাণের শোণিত পান করেই তার পুষ্টি। সুখ পাক বা না পাক এ পথ যে নিয়েছে পরম সার্থকতার আনন্দে তার যাত্রা সমাপ্ত হবে।'

না, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ আমার আমেরিকা থেকে সুদূর ছিল না। এই সমস্ত ভাবনা বা ঘোষণায় এমন কিছু ছিল না যাতে আমার মন সায় দেয় নি, বা যা আমারও নিজস্ব নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি শুনেছি। নিজের প্রকাশ করবার ক্ষমতা না থাকলেও, আরেক জনের মুখে এসব কথা শুনে আমার চোখে জল এসেছে। নিজেকে যা ভারাক্রান্ত করে রেখেছে কোন বইয়ে তা খুঁজে পাওয়াও এক-রকম মুক্তি।

অন্তর আমার এইসব বিষয়ের চিন্তায় পরিপূর্ণ হলেও এই নিয়ে আলোচনা আমরা করতাম না বললেই হয়। তাঁর কাছে থাকলে লজ্জায় আমার মুখে কথা ফুটত না। রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন আমি ইংরাজি শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না বোধ হয়। কিন্তু ভাষার দৈন্য নয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই আমায় মূক করে রাখতেন। কিংবা তাঁর সম্বন্ধে আমার যে গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কথা তিনি নিজে জানতেন না তাই আমায় বাধা দিত। আমার সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা আমি দূর করবার চেষ্টা করি নি। কি করে তিনি জানবেন যে সমাগত বসন্তের দিনে তারই বাতাসের মত লঘু স্বচ্ছন্দ সাজ যে তরুণী মেয়েটির ছিল, তাঁকে উত্যক্ত করতে ভয় পেয়েও যে রোগী হিসেবে তাঁর পরিচর্যা করবার দায়িত্ব নিতে দ্বিধা করে নি, নিত্য নীরবে যে তরুণী তাঁর পাশে এসে বসে থাকত, সেই মেয়েটি তাঁর সমস্ত লেখা মুখস্ত করে রেখেছে।

আর্জেন্টিনা ছেড়ে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ আমায় জাহাজ থেকে লেখেন,—'একসপ্তে যখন ছিলাম, তখন কথা নিয়েই আমরা খেলা করেছি বেশী। পরস্পরকে স্পষ্ট করে জানার শ্রেষ্ঠ সুযোগগুলি চেষ্টা করেছি হেসেই উড়িয়ে দিতে। এ ধরনের কৌতুকহাস্য মনের আবহ অস্থির করে তোলে, তলার ধুলো উড়িয়ে শুধু আমাদের দৃষ্টি করে আচ্ছন্ন।' কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁর ও তাঁর সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিকোণের তফাৎ ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে কে এবং কি তা আমি জানতাম। তাঁর লেখাতে তাঁর যে পরিচয় আগে পেয়েছি প্রত্যক্ষ দেখায় তা সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু অচেতন মনের আলোকপাতে ছাড়া আমার মত একটি নির্বাক মেয়ের কিছুই তাঁর জানবার কথা নয়। 'তোমায় চিনি গো চিনি ওগো বিদেশিনী! তুমি থাক সিন্ধু-পারে...' আমার নীরবতায় আমার মনের কথা কি তিনি সত্যি শুনতে পেয়েছিলেন? বোধ হয় পান নি বলেই মনে হয়। পরস্পরকে জানা আমাদের একান্ত একতরফা। দুঃখ যদি আমার কিছু থাকে তা এই যে 'সেই এক বিদেশিনী' তাঁর কত কাছে ছিল তা তিনি কখনো জানলেন না। জানলেন না, আকাশ সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও দুটি দেশ আপাতঃ অসম্ভব কি মিলনসূত্রে বাঁধা ছিল। তিনি কখনো জানতে পারেন নি সাগরপারের সেই গানগুলি শুনতে শুনতে আমি যেন মহৎ পাশ্চাত্ত্য কবি সেণ্ট জন পার্স-এর কথাগুলি আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম। 'এই আমার স্বদেশে আমি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলাম। আত্মার ছাড়া আর কিছুর ইতিহাস নেই।' পশ্চিমের লোকেদের প্রাচ্যের চিন্তা বোঝবার ক্ষমতা আছে কিনা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথেরও সন্দেহ হত। মনে আছে এসটানসিয়া চাপাদমালাল-এ আমরা যখন ছিলাম তখন একদিন বিকেলে তিনি একটি কবিতা লেখেন। তিনি কবিতাটি যখন শেষ করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে আমি তাঁর ঘরে ঢুকেছিলাম। ঘরটি বেশ বিশাল, লাল ড্যামাস্কের পর্দায় সাজান। টানা সার্সির জানলাগুলি থেকে প্রথম নিদাঘের কচি সবুজ

বনভূমি দেখা যায়। ঝকঝকে পালিশ করা বিলাতী আসবাবপত্র থেকে মোসের একটা মৃদু গন্ধ। আমাদের চারিদিকে দিগন্তব্যাপী স্তব্ধতা—Teros আর benteveous-এর ধ্বনিগাম্ভীর্যে আর পালিত নধর পশুদের সুদূর শান্তিময় ডাকে প্রগাঢ় আর্জেনটিনার সেই অসীম নৈঃশব্দ। বৃষ্টি পড়ছিল আগে থেকেই। আমাদের আটলাণ্টিক উপকূলের তীক্ষ্ণ নেশা ধরানো বাতাস যেন বুকের মধ্যে স্পন্দন জাগায়!

'চায়ের সময় হয়ে এল।'—আমি বলেছিলাম—'কিন্তু নীচে নামবার আগে কবিতাটি অনুবাদ করে আমায় শোনাতে অনুরোধ করছি।'

তাঁর সামনে ছড়ানো পাতাগুলোর ওপর ঝুঁকে বালির ওপর পাখিদের পদচিহ্নের মত সূক্ষ্ম রহস্যময় অজানা বাংলা অক্ষরগুলি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ পাতাটি তুলে নিয়ে অনুবাদ করে শোনাতে শুরু করলেন। অনুবাদটা আক্ষরিক তিনি আমায় বলেছিলেন। মাঝে মাঝে একটু থেমে তিনি যা শোনালেন তাতে আমার মন আশ্চর্যভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দস্তানা পরে' যেমন জিনিস ছোঁয়া অনুবাদের সাহায্যে কিছু পড়া অনেকটা তাই। আমার মনে হল সেরকম দস্তানা পরে, নয়, যেন ভাগ্যগুণে বা অলৌকিক কোন উপায়ে আমি রবীন্দ্রনাথের রচনাবস্তুর প্রত্যক্ষ নিবিড় স্পর্শ এতদিনে পেয়েছি। অনুবাদের দস্তানা আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়কে অসাড় করে দিয়ে শব্দের সত্যকার অনুভব পেতে দেয় না। শব্দের মূল্যই কিন্তু সবচেয়ে বেশী, কারণ শুধু কবিরাই তাই দিয়ে গোচর ও অগোচরের মধ্যে, প্রতিদিনের স্থূল প্রত্যক্ষ অবাস্তবতা আর কবিতার অপ্রত্যক্ষ সত্যকার বাস্তবতার মধ্যে ভঙ্গুর সেতু নির্মাণ করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথকে আমি ইংরাজি রূপান্তরটিকে পরে লিখে রাখতে বলি। পরের দিন তিনি সেটি আমায় তাঁর সুন্দর ইংরাজি হস্তাক্ষরে লিখে দেন। তাঁর সামনে কবিতাটি পড়ে আমার আশাভঙ্গ আমি গোপন করতে পারি নি। ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলাম—কাল যা যা পড়ে শুনিয়েছিলেন তা সব ত এখানে নেই। কেন সেগুলি বাদ দিয়েছেন? সেইগুলিই ছিল কবিতাটির মূল, তার প্রাণ।

তিনি উত্তরে বললেন যে সে সব কথা পাশ্চাত্ত্য পাঠকদের ভালো লাগবে না তিনি ভেবেছিলেন। কেউ যেন আমায় চড় মেরেছে মনে হল। রাঙা হয়ে উঠল আমার মুখ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য যা সত্য বলে বুঝেছিলেন তাই আমায় জানিয়েছিলেন। আমি যে আহত হতে পারি তা কল্পনাও করেন নি। আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলাম, এই একটিবার অন্ততঃ তিনি দারুণ ভুল করেছেন। এভাবে জোর দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা আমি খুব কমই বলি, যদিও আকস্মিক আবেগ আমার স্বভাবগত।

আরেকবার এই চাপাদমালাল-এই বোদলেয়ারের কয়েকটি কবিতা আমি তাঁকে অনুবাদ করে শোনাতে চেষ্টা করি। ভালো করেই জানতাম যে আমি অসাধ্যসাধন করবার চেষ্টা করছি। তবু বোদলেয়ার-এর কয়েকটি ভাব তাঁর কিরকম লাগে আমি জানতে উৎসুক ছিলাম। Invitation au voyage কবিতাটি আমি পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে এই ছত্রে যখন এলাম—

Des meubles luisants
Polis par les ans
De'coreraient notre chambrae
Les plus rares fleurs



Me'lant leur odeurs
Aus vagues senteurs de I'ambre
Les riches plafonds
Le muriors profunds
La splendour orientale. . . .

তখন রবীন্দ্রনাথ আমায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—বিজয়া, তোমার আসবাবপত্রের কবিকে আমার ভালো লাগছে না।

কথাগুলো ও তা বলার সুর এমন কৌতুকের যে আমি না হেসে উঠে পারলাম না। আমার অনুবাদের দৌলতে এক ফরাসী কবিপ্রতিভা আসবাবপত্রের কবি হয়ে উঠেছেন। অনুবাদ অনেক সময় প্রাণঘাতী হতে পারে।

১৯৩০-এ ক্যাপ মার্টিন-এ আর প্যারিসে আবার যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হল তখন তিনি চাইলেন যে আমি তাঁর সঙ্গে লণ্ডনে যাই। তিনি অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন। এর চেয়ে আনন্দ আমি আর কিছুতে পেতাম না, কিন্তু তখন আমি নিউ ইয়র্কে ওয়াল্ডো ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে দেখা করবার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। যে রিভিউটি আমি বার করতে যাচ্ছিলাম এবং সেই বছরের শেষেই যেটি প্রকাশিত হবার কথা তারই বিষয়ে আলোচনার জন্যে এই সাক্ষাতের আয়োজন।

আমার নিউ ইয়র্কে রওনা হবার কারণ জানিয়ে আমি রবীন্দ্রনাথকে লিখি—আমরা দক্ষিণে যে দুঃখে পীড়িত ওয়াল্ডো ফ্র্যাঙ্ক উত্তরেও তাই সয়েছেন। যখন বুঝলাম যে এই অনাথ-দশা আমরা দুজনেই অনুভব করছি তখন এ কথাও আমাদের মনে হল যে, কোন দিন সমস্ত মহাদেশে এর প্রতিকার হতে পারে...কারণ বহুজনই এ ব্যাপারে আমাদের সাথী। ইওরোপের অভাব আমরা দুজনেই গভীরভাবে অনুভব করি, কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন বাস করি তখন দুজনেই বুঝি যে প্রাণের যে সুধা আমাদের প্রয়োজন ইওরোপ তা দিতে পারে না। এককথায় এই সত্যই আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা আমেরিকারই আপন—সেই স্থূল সংস্কৃতিহীন বিশৃঙ্খল অপরিণত আমেরিকা। সে আমেরিকা আমাদের দুঃখই দেয় কিন্তু তার জন্যে অনিচ্ছাতেও সব দুঃখ বরণ করতে আমরা প্রস্তুত। আমরা দোভাষী পত্রিকা বার করবার কথা ভেবেছি। তাতে আমেরিকার সমস্যার কথা থাকবে আর আমাদের সাধ্যমত সংগৃহীত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রচনা। এ অভিজ্ঞতা সার্থক হতে পারে।

রিভিউটির তখনও নামকরণ হয় নি। পরে সেটিই *SUR* নামে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে দু'ভাষায় প্রকাশের কল্পনা আমরা বাতিল করেছিলাম।

১৯৩০-এর জুন নর্দ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শেষবার আমি রবীন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করি। তাঁর বন্ধু সি. এস. অ্যান্ডরুজ ও সেক্রেটারী আর্যম তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্র ছাড়া আর আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আমি তাঁকে একটি আরাম-কেদারা দিয়েছিলাম। সেটি বরাবর তাঁর কাছে ছিল ও এখন শান্তিনিকেতনে আছে বলে আমি জানি। চিঠিতে কখনো কখনো এটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।

'তোমার সেই আরাম-কেদারায় দিনে রাত্রে বহুক্ষণ আমি ডুবে থাকি। এতদিনে তোমার সঙ্গে বোদলেয়ার-এর যে কবিতা পড়েছিলাম তার কাব্যময় অর্থ আমার কাছে ধরা পড়েছে।'

কথায় বার্তায় যেমন চিঠিপত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ কৌতুকরসবোধ ফুটে উঠত।

'কোনো কোনো প্রাণী মৃত্যুর বিপদ এড়াতে মরার ভাণ করে। ডাক্তাররা আমায় তাদের অনুকরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি যেন না নড়িচড়ি, কথা না বলি, কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ না করি—অর্থাৎ মরে গেছি এমনিভাবে যেন থাকি। সুতরাং তোমার দেওয়া যে কেদারাটি আমার সঙ্গে সমুদ্র পারাপার করেছে তার কাছে সম্পূর্ণভাবে আমায় আত্মসমর্পণ করতে হবে।'

মেয়েদের সম্বন্ধে Ortega y Gasset-এর একটি উক্তি আমি রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদ করে পাঠাই। তিনি তার উত্তরে একটি দীর্ঘ মজার চিঠি আমায় লেখেন। সে চিঠির শেষটা এই রকম—মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করা আমার বারণ, কিন্তু এ চিঠির কয়েকটি মন্তব্য লঘু চাপল্যের ধার ঘেঁষে গেছে। প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ না হলেও যাকে তাই বলে ধরা হয় ভুল বোঝার ভয় সত্ত্বেও তাকে যে মাঝে মাঝে হাসির ধমকটা বার করে ফেলতে হয়, একথা বুঝলে তুমি আমায় ক্ষমা করবে।

তিনি জানতেন যে আমি হাসতে ভালবাসি। অবস্থাগতিকেও মহাপুরুষদের হাসতে মানা কিনা আমি জানি না। আমার ত বিশ্বাস যে মেকী মহাপুরুষরাই সব সময়ে গম্ভীর। জ্ঞানে ও করুণায় বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধা এমন কি ভক্তি অর্জন করেছেন এমন একজনের সম্বন্ধে কেউ একদা বলেছিল—'ও'র ঋষিত্ব লাভের একমাত্র অন্তরায় হল খুশির অভাব।' এ মন্তব্যের যাথার্থ্য আমাকে চমৎকৃত করেছিল।

আর্জেনটিনায় থাকবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোটা একটি দিক এবং তাঁর মনের দ্বন্দ্ব বোঝবার জন্যে আমি তৈরী ছিলাম না। সেগুলি স্পষ্ট করে দেখে তার সম্পূর্ণ মানে আমি বুঝেছিলাম অনেক পরে, যখন শুধু বইপড়া বিদ্যা নয় জীবনই আমাকে অনুরূপ দ্বন্দ্বের সামনে ফেলেছিল। তাঁকে কতবার না তখন স্মরণ করেছি।

দু'বছর আগে বিলাতের মনোরম ডার্টিংটন হলে যখন কয়েকদিনের জন্যে ছিলাম তখন এল. কে. এল্মহার্স্ট তাঁর কাছে গুরুদেবের লেখা কয়েকটি পত্রাংশ দেখান। সেগুলি টুকে নিয়ে তার দুটি প্রকাশ করার অনুমতি আমি চেয়ে নিই। ১৯২৪-এ যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাহাড়ের মাথায় 'পারাইসোস' বা 'টিপার' তলায় বসতাম বা বারান্দা থেকে দুজনে নীচের নদীর শোভা দেখতাম তখন চিঠির এইসব কথাগুলি আমাকে এভাবে নাড়া দিত না। আমার কাছে সেগুলি শুধু সুন্দরই মনে হত। ১৯৫৬-এ সেগুলি পড়বার সময় যা হয়েছে সেই তীব্র সাড়া অনুভব করতাম না। পত্রাংশগুলি এই—'অত্যাচারে নিপীড়িত হওয়াও সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রতারিত হয়ে মিথ্যা বিগ্রহের পূজায় মত্ত হওয়ার দুর্ভাগ্যে সমস্ত যুগেরই চরম অপমান।'

'মানুষের সঙ্গে ইতিহাস কখনো কখনো প্রতারণা করছে। নানা দুর্ঘটনার সমাবেশে আসলে যারা ক্ষুদ্র তাদের ফাঁপিয়ে মহত্ত্বের ব্যঙ্গরূপ দিয়েছে। সত্যের এই বিকৃতি কখনো কখনো প্রতিষ্ঠার সুযোগ যে পায় তার কারণ এই নয় যে এই সমস্ত ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে আশ্চর্য কোন শক্তি থাকে। কারণ এই যে যাদের তারা চালিত করে তাদেরই পরম কোন দুর্বলতা এই নেতাদের মধ্যে মূর্ত।'

এ কথার গভীরতা বুঝতে আর তা আমারও নিজস্ব বলে উপলব্ধি করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ছোট হলদে ফুলে সমুজ্জ্বল 'টিপাস'-এর ছায়ায় আর তখন আমি বসে নেই। প্রহরীর মত বিলাতী 'লন' ঘিরে থাকা পুরানো ইউ গাছের সারির দিকে জানলা থেকে তখন আমি চেয়ে আছি। সেগুলি এত গাঢ় সবুজ যে প্রায় কালো মনে হয়। গুরুদেব



আমি ও এল্মহার্স্ট যে মাসে সান ইসিদ্রোতে মিলিত হয়েছিলাম, এও সেই নভেম্বর মাস। কিন্তু এখন বত্রিশ বছর বাদে কবির দুটি বন্ধুই শুধু ডেভনশায়ারে এসে মিলেছেন। আমাদের দেশের রৌদ্রোজ্জ্বল নভেম্বর ইংলণ্ডে আসন্ন শীতের বার্তা নিয়ে আর্দ্র ও কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন।

বিষাদের ঋতু এটি। কিন্তু এই কুয়াশাচ্ছন্ন ভিজে ঋতুর আমার কাছে একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং আমি নিজে বিষণ্ণ বোধ করি নি। এইমাত্র যে সব যন্ত্রণার কথা পড়েছি আর শুধু লেখার ভেতর দিয়ে নয় নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যা এখন নিদারুণ সত্য বলে জেনেছি—তাতেও আমি বিষণ্ণ নই। একদিন দুঃসহ বিষাদ আমাকে কাতর করেছিল, যখন যৌবনের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আমি সেই ঐশ্বর্যের মাঝেই বন্দিনী ছিলাম। সেই সময়টিতে "গীতাঞ্জলি" পরম মুক্তির কান্না আমায় কাঁদিয়েছিল। তবু তখনকার মত এখনও সম্পূর্ণ এ কথার অর্থ বুঝেছি বলব না—'আমার জীবনের আনন্দময় দিশারী সমস্ত দ্বন্দ্ব বাধা জটিলতার মধ্য দিয়ে যে পরমাশ্চর্য কৌশলে তার গভীর মর্ম সার্থক করবার পথে আমায় নিয়ে চলেছেন।'

এইটুকু শুধু আমি জানি যে আর সকলের মত আমার বেলাতেও জীবন যে রহস্যময় নক্সা এঁকেছে তার পাঠোদ্ধার করতে না পারলেও কোনো হতাশা না নিয়ে এমন কি তেমন বিষণ্ণ না হয়েও আমি তার কথা ভাবতে পারি। এই যে প্রজ্ঞা, যা আমার বেলায় ঠিক প্রজ্ঞা নয় বরং কতকটা অনুভূতি ও সহজাত বোধ, এর জন্যে বেশীর ভাগ এমন দুটি মানুষের কাছে আমি ঋণী, যাঁরা দূর এক দেশে অন্য এক সভ্যতা ও জাতির প্রতিনিধি। (সে আপাতঃভিন্ন সভ্যতা ও জাতির মূল না হোক শাখা পৃথক) এঁরা দুজনে হলেন গান্ধী ও গুরুদেব। প্রথম জনকে আমি একবার মাত্র দেখেছি ১৯৩১-এ। তাঁর কথাও শুনেছি সেই একবার। আমার চিরকালের আনন্দ এই যে দ্বিতীয় জনের সঙ্গে আমার পথ মিলে মিশে গিয়েছে।

দুজনের সম্বন্ধেই কথা বলবার অধিকারী আমি নিজেকে মনে করি না। আমি যা বলি তা শুধু 'সোচ্চার অনুভূতি' বলতেন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ। একবিন্দু অশ্রু কি একটি হাসি-কে কাব্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা যদি আমার থাকত তাহলে আমার কথাগুলি একটি কবিতা হতে পারত। সে ক্ষমতা আমার নেই। চোখের জল আমার চোখেই রইল মুখের হাসি মুখেই।

সমুদ্র কি আমাদের দেশের পাম্পা বা প্লেট নদীর মত আপাতঃ অসীম অকূল কিছুর সামনে দাঁড়ালে মনে হয় এমন কোন বিশ্বের প্রান্তে আছি যার কোন সীমান্ত নেই। আমাদের শারীরিক ক্ষমতার পরিমাণই সে জগৎ আমাদের কাছে সীমিত করে রাখে।

ভালোবাসা হৃদয়ে এই অসীমতার অনুভূতিই জাগায়। কিন্তু দৃষ্টির চেয়ে হৃদয়ের শক্তি অনেক বেশী। সে আরো বহু দূরে পৌঁছোয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর জীবনে এমন মুহূর্ত এসেছে যখন সীমার আপাতঃতুচ্ছতা আর অসীমের আপাতঃশূন্যতা দূর হয়ে গেছে দুইয়ের মিলনে। সীমার মধ্য দিয়ে অসীমকে পাওয়ার সেই আনন্দ শুধু প্রেমেই সম্ভব।

উইলিয়ম ব্লেক এই কথাই অন্যভাবে বলেছেন, '...পৃথিবীর সব কিছুই ঈশ্বরের বাণী।' রবীন্দ্রনাথের অনুবাদক ইয়েটস ব্লেকের রচনা সংগ্রহের ভূমিকায় ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে বিশ্বসৃষ্টির যা কিছু স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর তার মধ্যেই শয়তানের স্পর্শ যার আর এক নাম

হল অস্বচ্ছতা। আর শুধু অধ্যাত্ম-ইন্দ্রিয় দিয়ে যার নাগাল পাওয়া যায় তাই একমাত্র বাস্তবতা।

যখনই বুঝতে পারি যে 'সীমার আপাতঃতুচ্ছতা' 'অসীমের আপাতঃশূন্যতার' মতই মিথ্যা তখনই সেই স্থির বিশ্বাস আমাদের মধ্যে জাগতে শুরু করে যে 'পৃথিবীর সব কিছুই ঈশ্বরের বাণী'।

সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা অজানা শক্তির প্রেরিত রূপক-বার্তা বলে ব্লেক বিশ্বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথেরও সেই রকম প্রত্যয় বোধ হয়েছিল। তবে এই 'প্রাকৃতিক ঘটনা'র পাঠোদ্ধার করা সব সময়ে সহজ নয়।

পাশ্চাত্ত্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ হয়ে গান্ধীজী ও গুরুদেবের কাছে আমার যা ঋণ তা যেন না-জেনে-পাওয়া কোন সম্পদের উত্তরাধিকার প্রত্যর্পণ।

এমন এক দরজা তা আমার ও আরো বহুজনের জন্যে মুক্ত করে দিয়েছে যা রুদ্ধ থাকলে সত্যের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে। সত্য বলতে আমি এই বুঝি—সীমার তুচ্ছতা আর অসীমের শূন্যতা দৃষ্টিভ্রম ছাড়া কিছু নয়। এই দৃষ্টিভ্রম (দান্তের 'ফলসো ইমাজিনেয়ার') আমাদের সব বিচার বিকৃত করে পৃথিবীকে নরক করে তুলতে পারে। তাঁরা ধন্য যাঁরা এই নরক থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধারে না হোক, ত্রাণ যেখানে দিয়ে পাওয়া সম্ভব সেই দরজা অন্ততঃ খুলতে আমাদের সাহায্য করেন। উপলব্ধি ছাড়া মুক্তির পথ নেই। সে পথ যদি পরিষ্কৃত হয়—ব্লেক বলেছেন তাহলে সব কিছু মানুষের কাছে অনন্ত বলে প্রতীয়মান হবে।

সান ইসিদ্রো-তে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথ আমায় কয়েকটি বাংলা কথা শিখিয়েছিলেন। আমি শুধু একটা কথাই মনে রেখেছি আর ভারতবর্ষকে সেই কথাই বলব—ভালোবাসা।

আত্মার ছাড়া আর কিছুর ইতিহাস নেই। ইতিহাস মানে শুধু আত্মারই ইতিহাস।

অনুবাদ: **প্রেমেন্দ্র মিত্র**

# বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ

## সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে শান্তিনিকেতনে যে বিশেষ সমাবর্তনের অনুষ্ঠান হয়, তাতে স্যার মরিস গয়ার এবং আমি উভয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হই, রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর অব্ লিটারেচার' উপাধিতে ভূষিত করবার জন্য। সেই মানপত্রে একটি উক্তি ছিল : 'সকল কলাদেবীর প্রিয়তম তুমি...'

রবীন্দ্রনাথ এমন ঘরে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে সৃষ্টিকর্মের ধারা অব্যাহতভাবে চলেছে। তাঁর নিজেরই ভাষায় বলতে গেলে, 'আমরা লিখেছি, গান গেয়েছি, অভিনয় করেছি—সকল দিকেই নিজেদের যেন ঢেলে দিয়েছি।' কি সঙ্গীতে, কি নৃত্যে, চিত্রকলায় আর সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে, কবির অতি-সূক্ষ্ম শিল্পচেতনা আর প্রতিভা আপনাকে উন্মুক্ত, বিকশিত করেছে। বর্তমান কালের মধ্যে এসিয়ায় যত কবির আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের মধ্যে নিঃসংশয়ে সবচেয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও কীর্তিমান্ হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচনাবলী একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়ে বহু দেশের সুধী ও সুলেখক, শিল্প ও সাহিত্যের রসগ্রাহী ভাবুক ও প্রেমিকের মনে প্রেরণা জুগিয়েছে।

কারয়িত্রী-প্রতিভার অধিকারী হয়ে কাব্য সঙ্গীত ও চিত্রকর্মে তিনি প্রাক্তন সংস্কার কাটিয়ে নতুন পথ দেখিয়েছেন। ঐতিহ্য ও সংস্কার শুধু অতীতের সঙ্গে সামঞ্জস্য নয়, প্রাক্তন থেকে মুক্তিও বটে। এ যাবৎ অলক্ষিত সংযোগ-সম্পর্কগুলিকে তিনি নতুন করে দেখলেন, আর বিশ্বমানবের সামনে এক অখণ্ড একাত্ম পৃথিবীর স্বপ্নচিত্র তুলে ধরলেন। নিখিল মানুষের ঐক্যসাধনার দৃঢ় প্রত্যয়ে, অপরিচিতের সঙ্গে আত্মীয়-বন্ধনের চরম বিশ্বাসে, তাঁর মহান্ কল্পনা ও শিল্পকর্মের সমগ্র শক্তি তিনি নিয়োজিত করে গেছেন।

২

কবির ব্যক্তি-সত্ত্বা ছিল প্রাণশক্তির দীপ্যমান আধার। দীর্ঘায়ত সুঠাম দেহ, রাজকীয় মহিমায় ভাস্বর। কুঞ্চিতকেশ শোভন-শ্মশ্রু এই শান্ত সমাহিত মূর্তি যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা সকলেই অভিভূত হয়েছেন। "Everyman remembers" নামক স্মৃতি-চিত্রগ্রন্থে আর্নেস্ট রিস্ লিখেছেন, 'একদিন সন্ধ্যায় দরজায় মৃদু করাঘাত হল। পরিচারিকা দরজা খুলেছে, আমিও হল্-এ ঢুকে এগিয়ে এসেছি। দেখি, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আগন্তুক। সে এক আশ্চর্য আবির্ভাব! দীর্ঘ পুরুষদেহ, ধূসর শ্মশ্রু; পরনে এক আঁট-সাঁট ধূসর রঙের জোব্বা, পা পর্যন্ত ঝুল নেমে এসেছে। ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, বাক্যস্ফূর্তি হল না। মনে হল যেন ধর্মগুরু স্বয়ং ইসেয়া আমার দুয়ারে অবতীর্ণ!'

৩

আমরা সমকালীন ব্যক্তিদের যে দৃষ্টি দিয়ে বিচার করি, তার কিছুটা বিকৃত হয়ে

থাকে, এ রকম একটা ধারণা চলিত আছে। কেন না, প্রথমতঃ রয়েছে বন্ধুত্বের দায়—নিরপেক্ষ মত পোষণের প্রধান অন্তরায়। দ্বিতীয়তঃ, যে পরিপ্রেক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন, তার অভাব প্রায়ই ঘটে থাকে। যাঁদের কর্ম ও জীবন আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ, তাঁদের কৃতিত্বকে আমরা নিজেদের খেয়াল ও রুচি অনুযায়ী কখনও নামিয়ে দেখি, কখনও বা অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে বসি। আজকের দিনে যাঁদের সার্থক বলে ভাবি, কিছুদিন পরে তাঁদের গুরুত্ব যায় কমে। আবার বর্তমানে যাঁরা তেমন আমল পান না, পরবর্তী কালে হয়তো তাঁদের অর্থগৌরব বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ভারত তথা বিশ্বসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ভবিষ্য কল্পনা, তা হয়তো সত্যদর্শীর ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতোই একদিন সফল হয়ে উঠবে।

ভারতবাসী আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের বাণী কতটা সারগর্ভ, তার জাজ্বল্য প্রমাণ হল ভারতের ঐতিহ্য। ইতিহাসের গুরুভারে আনত এই দেশ আক্রমণে ও লুণ্ঠনে কতবার বিধ্বস্ত হয়েছে, চরম উন্নতি আর অধোগতির মাঝখানে বার বার দোলায়িত হয়েছে। তবু যুগ যুগ ধরে সে সব সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার সাধনায় আত্মিক শক্তির বলেই আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পেরেছে। নিজেকে ফিরে পাওয়ার এই নিরন্তর উদ্যম ও সাফল্য ভারতীয় ইতিহাসের পৌনঃপুনিক ঘটনা। যুগসন্ধির বিপর্যয়-কালেই ঘটে মহাপ্রাজ্ঞজনের আবির্ভাব, যাঁরা আমাদের বিচ্যুতি ও পতন সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা, বুদ্ধ ও মহাবীর, অশোক ও আকবর, কবীর এবং নানকের মতো বিজ্ঞপুরুষেরা নিজ নিজ সময়সীমায় তৎকালীন সমাজচেতনাকে জাগ্রত করেছেন। অধ্যাত্ম-সম্পদের মূল সত্যগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ঋতাপসরণ আর স্বাধিকার-প্রমাদের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন। আমরা ভাগ্যবান্ যে আমাদের জীবদ্দশায় এমন কয়েকজন পুরুষ ও নারীর দর্শন পেয়েছি যাঁরা বিবেকে সাহসে অনন্য ও বলীয়ান্, যাঁরা মানুষের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে তার জীবন-দৃষ্টিকে ভিন্ন পথে নিয়ন্ত্রিত করেছেন।

ভারতের মর্মবাণী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—'ভারতবর্ষকে আমি ভালোবাসি, এর অর্থ নয় আমি তার প্রকৃতি-পরিবেশকে প্রতিমার আসনে বসাতে চাই। ভারতের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছি, সেই দৈব সুযোগের জন্যও নয়। ভারত যে তার মহান সন্ততিদের উদ্বুদ্ধ চেতনার অমৃতক্ষরণকে বহু কোলাহল বিপর্যয়ের মধ্যেও সযত্নে রক্ষা করে চলেছে, এইটিই আমার মমত্বের প্রকৃত কারণ।' জীবনে আমাদের একাধিক স্খলন থাকতে পারে, কিন্তু লেখায় কোনও অন্যায় কথা প্রকাশ করতে আমাদের স্বাভাবিক বিরূপতা আছে। গভীর বিনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন,—'জীবনে যা কিছু করেছি, তার সবগুলি যে খাঁটি সত্য, এমন কথা বলি না। কিন্তু আমার কবিতায় যা বলেছি বা বলতে চেয়েছি, তার কোনোটাই মেকি নয়। ঐখানেই আমার দেবতার স্থান যেখানে জীবনের গভীরতম সত্যগুলি উদ্‌ঘাটিত হতে পেরেছে।' চিরদিনই তিনি উচ্চে, আরও উচ্চে, তাঁর লক্ষ্য নিবদ্ধ করেছেন,—

'হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয় নি সে গান গাওয়া
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া।'

(গীতাঞ্জলি)



৪

রবীন্দ্রনাথ কোনও বাণী বহনের দায়িত্ব নিয়ে আসেন নি। তাঁর মাহাত্ম্য, দিব্য সত্যের উদ্বোধনে। সাধারণ জীবনের তুচ্ছতা ও গ্লানিকর আবহ থেকে মানুষকে তুলে ধরা, এমন এক লোকে তার উত্তরণ সম্ভব করে দেওয়া—যেখানে শাশ্বত গভীর সত্যগুলি আত্মপরতায়, নিঃসার কূটতর্কজালে মলিন ও আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি, যেখানে মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্ব এক শক্তিমান্ পরম কাম্য জীবনে রূপায়িত হতে পারে—এইটেই আরও কঠিন কাজ, দুর্লভ কৃতিত্ব।

মানুষের মধ্যেই আছে ঈশ্বর-বিকাশ। আর সেই তার সত্তার দূরপনেয় ভিত্তি। এই মর্ম-প্রস্তরকে লঙ্ঘন করার সাধ্য তার নেই। পার্থিব সামগ্রীর আকর্ষণ ছেদন করার ঊর্ধ্বমুখী প্রয়াস, ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে স্বার্থক্লিন্ন স্থূল বস্তুভার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা, বাহিরের অন্ধকার ভেদ করে অন্তরালোক-তীর্থে আপনাকে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা—এইটাই হল মানবের স্বধর্ম। মানব-প্রকৃতিতে রয়েছে সত্যের অন্বেষা, যা মিথ্যা ও বিভ্রমের মধ্যে মনকে বরাবর নিমজ্জিত রাখতে দেয় না, রয়েছে সত্যের তৃষ্ণা, যা কখনোই দীর্ঘকাল মনের অসত্য-লগ্ন হয়ে থাকাটা বরদাস্ত করে না।

রবীন্দ্রনাথ কোনও দিন দাবি করেন নি যে তিনি এক মৌলিক দর্শন উদ্‌ভাবন করেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার নিয়ে দার্শনিক আলোচনা কিংবা তত্ত্ব-বিশ্লেষণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। যা করতে চেয়েছেন ও করেছেন, তা হল সরস অলংকারে ঘরোয়া রূপকের সাহায্যে, নিজস্ব বাক্‌প্রতিমায় ঐতিহ্যের স্বরূপকে জীবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তোলা এবং আধুনিক কালের জীবনের সঙ্গে তার সঙ্গতি কোথায় দেখিয়ে দেওয়া। আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শকে নতুন করে বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা ভারতীয় জীবন-ইতিহাসের একটা বড় বৈশিষ্ট্য আর সেইটাই এক ধরনের স্বতন্ত্র সৃষ্টির কাজ। ভাবুক ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথ নিপুণ ব্যাখ্যাকার, তিনি সেই কাজই করে গেছেন। টাইম্‌স লিটারারি স্যাপ্লিমেণ্ট-পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে যথার্থ মন্তব্য করা হয়েছিল : 'ভারতের এই মহান কবির চেয়ে বোধ হয় আর কোনও বর্তমান কবি এতটা ধর্মস্থ নন এবং কোনও ধার্মিক ব্যক্তিরই তাঁর মতো কবি-প্রবণতা নেই।'

যে যুগে বহু বুদ্ধিবাদী মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিশ্বব্যাপী নৈরাশ্য, নিরাসক্তি আত্মস্থতা, এবং মৃদু, কখনও বা উগ্র, নাস্তিক্যবুদ্ধি নিয়েই তৃপ্ত, সে সময়ে রবীন্দ্রনাথই ভারতের সুপ্রাচীন শাস্ত্রবিধৃত অধ্যাত্ম-আদর্শের মূল্য এবং যাথার্থ্য সম্পর্কে প্রত্যয়শীল হতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'উপনিষদের শ্লোক আর বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি আমার নিকট গভীর অন্তরলোকের বস্তু এবং সেই কারণেই তারা অনন্ত জীবনের বিস্তার-সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। আমার নিজের জীবনে তাদের বারবার ব্যবহার করেছি, শিক্ষাদানেও তাদের প্রয়োগ করে দেখেছি যে শুধু আমার কাছেই নয়, অপর জনের কাছেও তারা যথেষ্ট অর্থময়। আমার এই বিশেষ সাক্ষ্য ও সমর্থনের একটা মূল্য আছে, কারণ তার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।' তিনি জানতেন যে এই সব প্রাচীন উক্তি-উপদেশের মাধ্যমে যে প্রকৃত ধর্ম উন্মোচিত হয়েছে, তার ভিতর এমন একটি পরমত-সহিষ্ণু নিরভিমান সমাহিত শান্ত শ্রী আছে, যার আবেদন ভারতের বাইরে জনসমাজের চিত্তকেও স্পর্শ করেছে। তাই বলেছেন : ভারতবর্ষকে জানতে হলে সেই যুগে যেতে হবে যখন এ দেশ তার ভূগোল-সীমার ঊর্ধ্বে

উঠে আপন আত্মাকে উপলব্ধি করেছে, পূব দিগন্ত ঝলমল-করা উদার আলোয় অবিনশ্বর সত্তাকে ব্যক্ত করেছে।

প্রেমালোকের এই অনির্বাণ বর্তিকা ভারতবর্ষই প্রাচীর গগনে জ্বালিয়ে রেখেছে। আর রবীন্দ্রনাথই জাতীয় স্মৃতিসম্পদকে পুনরুজ্জীবিত করে দেশবাসীকে গৌরবের অধিকার দিয়েছেন।

মানব-প্রকৃতির অন্তর্বিরোধ থেকে জন্মায় ধর্ম-সন্দিৎসা, সত্যজিজ্ঞাসা। যেখানে কেউ অ-মৃত নয়, কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সেই ভঙ্গুর জগতে আমরা কি করে নিশ্চিন্ততা ও স্থায়িত্ব পেতে পারি? নিশ্চিতির এই সন্ধান থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা প্রকৃতির চেয়ে বড়। জড়জগৎ আর মানসলোক—এ দুয়ের মাঝখানে সেতু বন্ধন করছে মানুষ নিজে। 'আমার সত্তার এক কোটিতে আমি মাটি ও পাথরের সঙ্গে একাত্ম, কিন্তু অপর প্রান্তে তাদের সব কিছু থেকে আমি পৃথক্, ভিন্ন।' এই বিকর্ষণ বা দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করা আয়াসসাধ্য ও কষ্টকর—

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই—
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
... ...
... ...
তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া,
মরণ আনে রাশি রাশি—
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি,
তবুও তাই ভালোবাসি।

(গীতাঞ্জলি)

এই পৃথিবীর অন্তরালে অসীমের পরম সত্য যে বর্তমান, উদ্ধৃত বাক্যগুলি তারই সমর্থন।

শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্—অর্থাৎ পূর্ণতা, শান্তি ও অদ্বৈত-ভাব, এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর বর্ণনা করেছেন। তিনি ব্যক্তিক, আবার অতি-ব্যক্তিক। তিনি ভিতরে ও বাহিরে; সকলের মধ্যে আবার সকলের ঊর্ধ্বে। কবি বলেছেন: এ বিষয়ে কথা বলার অধিকার আমার নেই, কিন্তু ধর্ম আমার কাছে প্রত্যক্ষ, বাস্তব সত্য। যদি কখনও কোনও ভাবে আমি ঈশ্বর কি, উপলব্ধি করতে পেরে থাকি কিংবা স্বপ্নদৃশ্যপটের মতো ঈশ্বরাভাস যদি সৌভাগ্যক্রমে আমার গোচরে এসে থাকে, তা হলে সে দৃষ্টি আমি পেয়েছি এই ধূলি-ধরণীতেই। বনস্পতি আর পশুপক্ষী, মানব ও বিশ্বের মাঝখান দিয়েই আমার এ বিশেষ দেখা সম্ভব হয়েছে।

উপনিষদের বাণীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পরমাত্মা মানুষের মধ্যেই বসতি করেন। ভাবের জন্ম ও রূপ-পরিগ্রহ ঘটে শিল্পীর হৃদয়লোকে, গোপন রহস্যের মতো। তাই তিনি লিখে গেছেন:

'যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ—ভিতরকার একটা চঞ্চল শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না, মনে হয় সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে। যে-সমস্ত



তর্কযুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহির্ভূত আর-একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিসটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ।' (ছিন্নপত্রাবলী: শিলাইদহ। ১৩ই অগস্ট ১৮৯৪)

আরও বলেছেন: বললে হয়তো অহমিকার মত শোনাবে। কিন্তু যে শক্তির কথা বলছি, সেটা 'আমিত্বে'র চেয়েও বড় আমার গভীর ব্যক্তি-সত্তার নিজস্ব বস্তু। তার কাছে আমাকে খাঁটি থাকতে হবে। লোকে যাকে সুখ বলে, তা যদি যায়—লোকে যদি আমায় ভুল বোঝে, ত্যাগ করে, ঘৃণাও করে—তবু সেই জীবনদাত্রী শক্তির প্রতি নিষ্ঠা আমার অটুট রাখতেই হবে।

জীবনে দেবতার প্রতিষ্ঠা আছে বলেই আমরা শুচিতা কামনা করি, সত্যকে পেতে ব্যগ্র হই। অস্তিত্বের গভীরে অন্তর-লোকে, আমাদের সত্যকারের শক্তি ও ঐশ্বর্য খুঁজতে হবে। সেই আত্মশক্তি-চর্চার ফলে আসে বিপদ ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখে আত্মস্থতা, লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ ছেড়ে স্বার্থত্যাগের প্রেরণা, মৃত্যুকে পরোয়া না করা আর সমষ্টির অঙ্গীভূত হয়ে মানব-সমাজের প্রতি আমাদের অগণিত কর্তব্যের দায়িত্ব গ্রহণ। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু-না-কিছু অবকাশ থাকা দরকার, যেখানে সে নিজের সঙ্গে একটু একাকিত্ব পেতে পারে, যখন আপনার মধ্যে যা কিছু গোপন ও গভীরতম, তাকে মুখোমুখি চিনতে ও বুঝতে পারে। এল্‌মহার্স্ট সাহেবকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: আমার আত্মিক অস্তিত্বের চারপাশে নিঃসঙ্গতার একটা অসীম অবকাশ আছে। সেই নির্জনতার আবেষ্টন ভেদ করে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কণ্ঠস্বর হয়তো প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবের নিকটে পৌঁছায় না। তার জন্য, তাঁদের চেয়ে আমার বেদনাই বেশি। আর যে কোনও মানুষের মতোই আমারও প্রাণে ব্যাকুলতা জাগে এই ব্যক্তিগত জগৎকে কাছে পাওয়ার জন্য,—হয়তো বেশি করেই বাজে.....

এই নির্জন ধ্যান ও তন্ময়তার শুচিকর মাহাত্ম্যে কবির আস্থা ছিল গভীর। সুদীর্ঘ জীবনের একটি দিনেও অনন্ত সত্যের সঙ্গে তাঁর সঙ্কেত-মিলন কিংবা অভিসার-লগ্ন ব্যর্থ বা ভ্রষ্ট হয় নি। তাই তাঁর নিবেদন ছিল বিরামহীন, 'আলো—আরও আলো'র জন্য প্রার্থনার অন্ত ছিল না।

দুঃখের বিষয়, আমাদের মতো অধিকাংশ মানুষ ঐ সব চিরন্তন সত্য, শাশ্বত মূল্যের প্রতি উদাসীন, বুঝি বা অন্ধ। তাই রবীন্দ্রনাথের মতো কবিরাই ঘোষণা করে থাকেন, অসীমের আলোক অলীক নয়। গানের সুরে নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠান—যেন উন্মুখচিত্তে সেই আলোকের সংঘাতে স্পর্শে ও প্রভাবে আমরা নিজেকে খুলে দিই, স্নিগ্ধ স্নাত অভিষিক্ত হই। তাঁরই কবিতার অংশ উদ্ধৃত করে বলা যায়—

আলোকের পথে প্রভু, দাও দ্বার খুলে—
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,
প্রদোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা,
সমুখে আসিছে ঘিরে নিরাশার নিশা।
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা,
আঁধারের আবরণে খোঁজে ধ্রুবতারা,
তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে
আলোকের পথে।

৫

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্ণতার অনুরাগী—জীবনের বহু দিকের বৈচিত্র্যের বিকাশই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মোক্ষ সংসার-বিরাগ নয়, কায়মনোবাক্যের সুসমঞ্জস মিলন। দেহ মন আত্মার সম-বিকাশ। উপনিষদ্ বলেছেন : প্রাণারামং মন শান্তি সমৃদ্ধং অমৃতং।

আত্ম-সমাহিত মন কর্মহীন হয়ে থাকে না। 'আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে।' জগতে যতদিন দুঃখ-দহন রইবে, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরও কাজ থাকবে ততদিন এই পৃথিবীতে।

তপস্বিতা হল মনের একটা বিশেষ গঠন, একটি বিবিক্ত ভাব। 'নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং'। অনাসক্ত মানুষের কাছে গৃহই তপোবন। সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন আবিশ্যিক নয়—

"আমি হব না তাপস, হব না, যেমনি বলুন যিনি।
... ... ...
আমি ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই ভুবন-ভুলানো হাসি।
যদি না উড়ে নীলোৎপল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল
যদি না বাজে কাঁকন-মল রিনিক্‌ঝিনি,
আমি হব না তাপস, হব না, যদি না পাই গো তপস্বিনী।
আমি হব না তাপস, তোমার শপথ, যদি সে তপের বলে
কোনো নূতন ভুবন না পারি গড়িতে নূতন হৃদয়তলে।"

কবি আরও বলেছেন—

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়॥
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।
... ...
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে॥

(নৈবেদ্য)

কবি অন্যত্রও বলেছেন : লক্ষ লক্ষ প্রাণী নিয়ে বিচিত্র এই বিশ্বের মেলা। আর ছেলেখেলা ভেবে, তোমরা তাকে অবহেলায় ফেলে যাও!

বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মবোধই ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ। "গীতাঞ্জলি"তে আছে

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,



ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার 'পরে॥

(গীতাঞ্জলি)

৬

অধ্যাত্ম-দৃষ্টি, পূত হৃদয় এবং বিশ্বমৈত্রী—সরল ধর্মবোধের এই ধারাগুলি শতাব্দ-কালক্রমে ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, দেশের অবনতি ঘটিয়েছে। চারি দিকের এই পুঞ্জীভূত গোঁড়ামি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন ভারতের অধোগতির মূল কারণ এই জাতিভেদ ও ধর্মবিরোধ, বঞ্চিত ও রিক্তদের প্রতি চরম উদাসীনতা। যাঁরা সত্যকারের ধার্মিক, তাঁরা চিরদিনই ঐ সব পিষ্ট ও নির্যাতিত, খাপছাড়া আর অবিশ্বাসী, গৃহহারা ও পরিত্যক্তদের উপর স্নেহ-মমতা ঢেলে দিয়েছেন। আজকের দিনে একেবারে অচল অসঙ্গত সংস্কারগুলের প্রামাণ্যের উপর শিথিল নির্ভরতায় যত সব সামাজিক বিধি-নিষেধ মাথা পেতে মেনে নিয়েছি বলেই আমাদের এত দুর্দশা। জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু বিদেশী অরি নয়, অন্তরের বৈরিদল। নিজেদের কবল থেকে আমাদের নিজেদেরই বাঁচাতে হবে—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

(গীতাঞ্জলি)

ঈশ্বরের মহান্ সৃষ্টি এই বিশ্বসমাজে অস্পৃশ্য বলে কিছু নেই। নগ্ন ক্ষুধার্ত আতুর অপরিচিত, সকলের কাছে আমাদের প্রেম পৌঁছে দিতে হবে—

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে (গীতাঞ্জলি)

কবি আরও বলেছেন—তোমায় যখন আঘাত হেনে বিদ্ধ করে, সে বেদনা যে আমারও।

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীদের আহ্বান জানিয়েছেন—সেই মূল মানবধর্মে আবার প্রতিষ্ঠিত হতে। যন্ত্রবৎ জীবন পরিচালনা থেকে আত্মরক্ষা করা যেমন দরকার, জীবনকে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ গতিশীল রূপ দেওয়া তেমনি এক মানবিক দায়িত্ব : 'ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধপ্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানো। (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম)

৭

শান্তির নীড় শান্তিনিকেতনে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-আরাধনার জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই আশ্রমকে কেন্দ্র করে স্থাপনা করলেন একটি বিদ্যাপীঠ। এই বিদ্যালয়ের কথা ভাবলেই মনে পড়ে আমাদের প্রাচীন তপোবনগুলি, যেখানে গুরু-শিষ্যদল ভূয়োদর্শী ধ্যান-ধারণা, সাযুজীবন আর গভীর ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে মুক্তির পথ সন্ধান করেছিলেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে এই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে কোনও প্রাণিহত্যা, কোনও প্রতিমা-পূজা যেমন নিষিদ্ধ, অপর ধর্মের দেবতা বা উপাসনা-সম্পর্কে কোনও অশ্রদ্ধেয় মন্তব্য তেমনি গর্হিত। যদিও এই বিদ্যালয়ের যা-কিছু কর্ম অনুষ্ঠান হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারেই চালিত হয়, তবু বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ নানক প্রভৃতি মহা-পুরুষদের জন্মদিনের স্মারক উৎসব শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালিত হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছিলেন তার আদর্শ-নিষ্ঠার জন্য। তিনি বলেছেন: ভারতবর্ষ আমার প্রিয় ভূমি, যে হেতু এ দেশ আমার কাছে একটা ভৌগোলিক আকারমাত্র নয়, ধারণার বস্তু। অতএব প্রচলিত অর্থে আমাকে দেশপ্রেমিক বলা চলে না। নিখিল মানবসমাজ থেকেই আমার সঙ্গী সাথী খুঁজতে হবে।

কবির মূল প্রেরণা যদি চ ভারতবর্ষই জুগিয়েছে, তাঁর সৃষ্টির আবেদন বিশ্বজনীন। যুগ যুগান্ত ধরে এ দেশ আত্মস্থিতি, বীর্য, ধর্মবোধ, পরমতসহিষ্ণুতা আর আতিথ্যনিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে এসেছে। মাঝে মাঝে আদর্শচ্যুতি ঘটেছে, এ কথাও সত্য। তবে পুরনো কাঠামোকে একেবারে বর্জন না করে তাকে দৃঢ় করে তোলা আর বাহিরের প্রভাব ও সংস্পর্শকে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে প্রয়োজন-অনুসারে নিজের করে নেওয়া—এই মনোভঙ্গী আমাদের অর্জন করা যে দরকার, রবীন্দ্রনাথ সে কথা একাধিক বার বলেছেন। 'সমাজের প্রাচীন মহৎ স্মৃতি, বৃহৎ ভাব ও কীর্তিকে' রক্ষা করা অথচ 'বর্তমানের সহিত সন্ধি' করে 'নূতন সংঘর্ষকে' স্বীকার করা অর্থাৎ 'ভাবসূত্রটিকে রক্ষা' করে 'সচেতন ভাবে এক কালের সহিত আর-এক কালকে' মিলিয়ে নেওয়া—এই হল রবীন্দ্রনাথের ঈপ্সিত 'কর্মযোগ'। তাঁর মতে, নিজস্ব সম্পদ ত্যাগ করে বিদেশীর 'প্রসাদভিক্ষা'র চেয়ে চরম কাঙালপনা আর নেই। আবার ঠিক তেমনি, যা-কিছু বিদেশী সব বর্জনীয়, এই ভেবে নিজেদের খাটো করার মতো পরম লজ্জাকর গ্লানি আর কিছু থাকতে পারে না। পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ মোহে ভারতের অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। বলেছেন, অপরের আবর্জনাকুণ্ড থেকে ভারতবাসী যেন 'পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্র' আহরণ করে চলেছে।

'নকলের নাকাল' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন : অনুকরণ জিনিসটা হচ্ছে,—অপরের চর্ম দিয়ে নিজের কঙ্কাল আচ্ছাদন। ফলে যা দাঁড়ায়, তা প্রতি মুহূর্তে ত্বক্ আর অস্থির মধ্যে লোমহর্ষণ অনন্ত ঘর্ষণ! ভারতবর্ষ অপরের কাছে এই ব্যর্থ দাসত্ব পরিত্যাগ করুক। জগতের বিভিন্ন মানুষ-জাতিকে একত্র বন্ধনের মহৎ ব্রতে আপনাকে নিযুক্ত করুক। ঐক্যই পরম সত্য, বিভেদ অকল্যাণ। কবি বলেছেন : 'বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।' ভারত কি ভাবে চিরকাল মিলনের এই সূত্রটিকে বজায় রেখেছে, সে কথা স্মরণ করিয়েছেন। বলেছেন, নানা বিপর্যয় ও বিরোধের সম্মুখীন হয়েও পরকে শত্রুকল্পনায় ত্যাগ না করে একটি বৃহৎ সমন্বয়-ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই স্থান দিতে চেয়েছে। প্রত্যেক নূতন সংঘাতে আপনাকে বিস্তার



করতে পেরেছে বলেই ভারত আজও টিঁকে আছে। সেই ভারতবর্ষের উপর কবির ছিল অটল বিশ্বাস। এখনও পর্যন্ত এ দেশ ধীরে ধীরে পুরাতনের সঙ্গে নবীনের এক আশ্চর্য আপস সাধন করে চলেছে। প্রত্যেকেই এই 'চেতনার কার্যে' যোগদান করুক। নিষ্প্রাণতায় কিংবা প্রতিরোধ-স্পৃহায় ভুল পথে চালিত হয়ে এই 'বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য-চেষ্টা' যেন ব্যর্থ না হয়, এই ছিল তাঁর গভীর প্রত্যাশা।

৮

একটি মহৎ আদর্শকে কার্যে পরিণত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ আজীবন সাধনা করেছেন। সেই আদর্শ হল, সহানুভূতি ও অন্তর-মিলন, সত্য ও প্রেমের ভিত্তিতে মানব-সমাজের বিভিন্ন অংশের ঐক্য-বন্ধন। তাঁর 'বিশ্বভারতী' এমনই এক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে নিখিল মানব যুক্ত হয়েছে একটি সুপরিকল্পিত নীড়ে—'যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ং'। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি বিশ্ববোধের এক মানসভূমি রচনা করতে চেয়েছিলেন যাতে শিক্ষার্থীরা প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সভ্যতার মধ্যে গভীর মিলগুলি বুঝতে পারে, পরস্পর-যুক্ত মানবসমাজের স্বরূপ-চেতনায় দীক্ষিত হয়। টমাস হার্ডি একবার বলেছিলেন : 'জগতের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়—বিভিন্ন দেশ ও জাতির ভাব-বিনিময়।' আমাদের প্রাচীন ঋষিরা জাতি ও ধর্মগত সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয়ে তাঁদের উদার মানব-দৃষ্টিকে খণ্ডিত বিকৃত করেননি। মানুষের মধ্যেই আমরা ভূমাকে প্রত্যক্ষ করি। সকল মানুষের নির্বিরোধ সখ্যেই বিকশিত হতে পারে মানব-সত্ত্বার চিরন্তন রূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় প্রত্যক্ষ করলেন এ পৃথিবীর তপ্ত রুধির-স্নান। দেখে গেলেন, মানুষেরই মোহান্ধ নির্বুদ্ধিতায় মৃত্যুর চেয়ে তিক্ত নির্মম বেদনার অশ্রুসমুদ্র। সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষু অবস্থায় দেখা দেয় অবক্ষয়ের চরম লক্ষণ—মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অসীম উদাসীনতা। গৃধ্নুতায়, স্থূলবস্তু-প্রীতিবশে ঘটে আত্মার বিনাশ, সংস্কৃতির অধোগতি।

১৯৪১ সালে, মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে, অশীতিতম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন—

'জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ—অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম—ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট-সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ।'

তবু মানুষের ভবিষ্যতে তাঁর আস্থা একটুও ম্লান হয়নি। তাই আবার বলেছেন—'কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে.....'

শত সহস্র বৎসরের ভারে আনমিত এই পৃথ্বী বাত্যাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়েও জীবনের জয়যাত্রার জন্য নিত্য প্রস্তুত হয়। মানব-প্রকৃতির মধ্যে একটি কঠোর সহনশীলতা আছে। অপরাজেয় এই মানবধর্ম হয়তো পারমাণবিক শক্তিসংঘর্ষের পরও টিঁকে থাকবে। নিদারুণ

কষ্ট আর অপমানের ভয়াবহ মূল্য দিয়েও 'অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।' এই বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব হবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েও রবীন্দ্রনাথ পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করতে চাননি। বলেছিলেন, আমাদের চিন্তার আচরণের সর্ববিধ ভঙ্গীতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। অদৃষ্টের হাতে আমরা তো অসহায় ক্রীড়নক নই—

আর সকলেরে তুমি দাও
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।

(বলাকা)

আকস্মিক নয়, দৈবও নয়; আমাদের অপূর্ণতা অক্ষমতাই আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি রচনা করেছে। ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমাদেরই হাতে। অশিক্ষা বিদ্বেষ এবং স্বার্থপরতার উৎস থেকে যা জন্মায়, সেই কৃতকর্মের বিলোপ ঘটিয়ে আমাদের আর-এক নূতন যুক্তিভিত্তিক সভ্য সমাজ-শৃঙ্খলা গড়তে হবে।

১৯৩৭ সালে তাঁর জন্মদিবসের কিছু পূর্বে লিখিত এক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানব-প্রীতিই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বেদনার্ত নিপীড়িত অপমানিত মানবাত্মার প্রতি অসীম মমত্বই এক মুমূর্ষু সভ্যতার ধ্বংস ও বিনষ্টির ঊর্ধ্বে তাঁকে স্থান দিয়েছে—

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥

(নববর্ষ ১৩৪৮)

সে সময়ে ভারতে ও বাহিরে বিশ্বে যে ঝড় বইছিল, তাতেও কবির সুচির প্রত্যয় এবং আত্মসমাহিতি অটল ছিল। বলেছিলেন, যে সব কারণে মনে অবসাদ ও নৈরাশ্য জাগে, সেগুলি কুজ্ঝটিকা। আর সেই কুয়াসার আস্তরণ ভেদ করে যখন সৌন্দর্যের ক্ষণিক রশ্মি আত্মপ্রকাশ করে, তখন বুঝতে পারি শান্তিই সত্য, দ্বন্দ্ব মিথ্যা। প্রেম সত্য, হিংসা অসত্য। আর বিচ্ছিন্ন বিভিন্নতায় নয়, ঐক্যেই পরম সত্য।

১৯১৯ সালে ১২ই এপ্রিল তারিখে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে যে চিঠি লেখেন, তার শেষ করেছিলেন এই আবাহন জানিয়ে—

Give me the supreme courage of love, this is my prayer,
the courage to speak, to do, to suffer at thy will,



to leave all things or be left alone. . .
Give me the supreme faith of love, this is my prayer,
the faith of life in death, of the victory in defeat,
of the power hidden in the frailness of beauty, of the
dignity of pain that accepts hurt, but disdains to
return it.

জগতের আজ বড় প্রয়োজন এই উদারদৃষ্টি বিশ্বপ্রেমের।

হাঙ্গেরিতে ব্যালাটন হ্রদের কাছে কবি তখন বাস করছিলেন, অসুখের পর আরোগ্য কামনায়। সেখানে ১৯২৬ সালে ৮ই নভেম্বর তারিখে, তিনি এক বৃক্ষরোপণ করেন। অতিথিদের খাতায় নিম্নলিখিত চরণগুলি লিখে দেন—

হে তরু এ ধরাতলে
রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব
পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি
পথিকেরে কবে
ভালোবেসেছিল কবি
বেঁচে ছিল যবে।

৯

বহুবিচিত্র গভীর ব্যঞ্জনাময় তাঁর সকল রচনাতেই এই মানবাত্মার কথা তিনি লিখে গেছেন, যে আত্মা অবিনশ্বর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে এমন সব জিনিস আছে যা হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়, মনকে পূর্ণ করে তোলে, যার আবেদন সময়ের সীমা অতিক্রম করে শাশ্বত হয়ে থাকবে। মানুষের কর্ম সম্বন্ধে টলস্টয় একবার বলেছিলেন, 'কিছুই থাকবে না—না অর্থ, না প্রতিপত্তি। বিরাট সম্পদ, এমন কি বিশাল রাজ্য—সকলেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমাদের সৃষ্টিতে যদি সত্যকারের শিল্পের একটি স্পর্শকণাও লেগে থাকে, তবেই তা সার্থক, মৃত্যুঞ্জয়।'

জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রসসিদ্ধাঃ কবীশ্বরাঃ
নাস্তি যেষাম্ যশঃকায়ে জরামরণজম্ ভয়ম্।

অনুবাদ: বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

# রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ

**আইজায়া বার্লিন**

ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে, এমনকি তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলি সম্পর্কেও আমি অজ্ঞ। স্বপক্ষে শুধু এইটুকুই বলতে পারি, যে দুটি সংস্কৃতির মধ্যে ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ব্যবধান যেখানে অগাধ, সেখানে সেতুরচনার কাজ সত্যই দুরূহ। আর তা ছাড়া কোনও সংস্কৃতির সার্থকতম যে দান, যেখানে তার বাণী সবচেয়ে সত্য এবং স্পষ্ট, সে হ'ল শিল্পকলা। সেই শিল্পকলাকে বিদেশী মাধ্যমে রূপান্তরিত করা কঠিন। আমার মতো যাঁরা ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেছেন, তাঁরা জানেন গ্রীস্‌-রোমের সাহিত্য সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার তারা উৎসস্থল। পুরুষানুক্রমে আবহমান কাল থেকে তারা আমাদের কাছে পরিবেশিত হ'চ্ছে। কিন্তু তবুও হোমার বা ইস্‌কিলস্‌ বা ভার্জিলের ইংরেজি অনুবাদে যতই সৌষ্ঠব থাক না কেন, মূল রচনার সে দীপ্তি পাওয়া যায় না। আর একটু স্পষ্ট করে বলতে পারি, যে কোনও কবিতার অনুবাদেই কেউ কখনও প্রতিভার স্পর্শ পায়নি। গদ্য বর্ণনায়, যেখানে হৃদয়মনের বিশেষ কোনও অবস্থা, অথবা কোনও তত্ত্ব, অথবা মানবসাধারণের সুপরিচিত কোনও পরিস্থিতির কথা বলা হ'চ্ছে, সেখানে অনুবাদেও অনেকখানি আভাস দেওয়া যায়। টল্‌স্টয়ের প্রতিভাকে চিনতে হ'লে রুষভাষা না পড়লেও চলে, বাইব্‌ল্‌-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'তে হ'লে হিব্রু এবং গ্রীক্‌ জানতে হয় না। নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও এ কথা কিছুটা সত্য, কারণ চিরন্তন মানবসাধারণের পরিচিত চরিত্র এবং কীর্তিকলাপই তার সামগ্রী। এবং এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে শেক্সপিয়রের বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ ফরাসী, জার্মান, রুষ জাতির ওপরে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে; মলিয়ের, শিলার, ইব্‌সেন—এঁরা কবি হ'লেও বিদেশী পটে এঁদের রচনা রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও, যাঁদের নাটকের কাব্যরস প্রধানতঃ শব্দগুলিকে আশ্রয় করেছে—যেমন রাসীন্‌, কর্নেই, বোধহয় কল্‌ডেরনও এবং আধুনিক নাট্যকাব্যের প্রতিনিধি য়েট্‌স্‌, হফ্‌মান্‌শ্‌ঠাল, এলিয়ট, লর্‌কা, ক্লোদেল—এঁদের নাটক অনুবাদে তেমন সাড়া দেয় না। যদি মূল রচনাগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকে, তাহলে হয়তো আমরা অনুবাদের প্রশংসা ক'রে থাকি, অনুবাদকের কৌশল ও বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হই। কিন্তু আমি মনে করি অনুবাদটি স্বয়ং একটি স্বাধীন কাব্যসৃষ্টি না হ'লে অল্প লোকেই তার দ্বারা বাস্তবিকই অভিভূত হয়। এবং সে ক্ষেত্রে এই রূপান্তরিত রচনাটি অনুবাদকের কল্পনা ও প্রতিভার কাছেও ঋণী, কাজেই সে ভিন্ন ব্যাপার। এরকম রূপান্তর প্রশংসনীয়, কখনও কখনও চমৎকারও বটে, কিন্তু সে তো এক নতুন সৃষ্টি, সে তো সেতু নয়, নয় সেই বিশ্বস্ত আত্মবিলোপ—মূল শিল্পের প্রকৃতির কাছে যা অভিনেতাদের মতো তন্ময়চিত্ত অনুবাদকেরা ক'রে থাকেন। বিশুদ্ধ কবিতার বেলা একথা সবচেয়ে সত্য। গদ্য বা নাট্যসাহিত্যের ধরনে অনুবাদ এখানে প্রায় অসাধ্য। কবিতা থাকে শব্দের মধ্যে, একটি বিশেষ ধরনের ভাব ও প্রাণের ভঙ্গী থেকে তারা জন্ম নেয় এবং শুধু সেই ভাষায় যারা ভাবতে এবং অনুভব করতে পারে, সে ভাষা তাদের মাতৃভাষা হোক আর নাই হোক, শুধু তাদের কাছেই তার বাণী সঞ্চারিত হ'তে পারে। 'অনুবাদে যা হারিয়ে যায় তাই হ'ল কবিতা'। আমেরিকার কবি রবার্ট্‌ ফ্রস্টের নামে প্রচলিত এই উক্তিটির



মধ্যে যথার্থ সত্য আছে ব'লে আমি মনে করি।

একথা বলার প্রথম উদ্দেশ্য ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমার অজ্ঞতার দোষ লাঘব করা। আমি সামান্য যেটুকু জানি, তাও অনুবাদের ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে। এবং তা থেকে মনে হয় ভারতীয় সাহিত্যের প্রকৃতি কি গদ্যে, কি মহাকাব্যে, কি দর্শনে—প্রধানতঃ কাব্যিক, এমনকি গীতিধর্মী। অবশ্য এ আলোচনা আমার বিষয়ের কেন্দ্রস্থলেও নিয়ে এল, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ—'রবীন্দ্রনাথ এবং জাতীয়তাবোধ'। জাতি জিনিসটার যদিও নানা উপাদান, নানা দিক, নানা চিহ্ন আছে, তবু তার মধ্যে একটা শক্তিশালী, বোধহয় সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হ'ল ভাষা। ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং ভৌগোলিক প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানের সমন্বয় তাকে খর্ব করতে পারে, কিন্তু তার শক্তিকে তাই ব'লে অস্বীকার করা যায় না। মানুষ যত পরিণত ও আত্মসচেতন হয়, তত বেশি সে ইন্দ্রিয়রূপকল্পের বদলে ভাষার সাহায্যে চিন্তা ও অনুভব করে। প্রসিধ অর্থনীতিবিদ্‌ লর্ড কেন্‌স্‌কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কিসের সাহায্যে ভাবেন—শব্দের সাহায্যে, না রূপকল্পের সাহায্যে। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভাবের সাহায্যে ভাবি।' মজার উত্তর, কিন্তু সত্যি নয়, বোধহয় কোন গুরুত্ব দেবার জন্যেও নয়ঃ প্রায় অর্থহীন বললেই চলে। আমরা হয় শব্দ দিয়ে, নয়তো রূপকল্প দিয়ে চিন্তা করি; শোনা যায় যে শিশুরা, আদিম মানুষেরা, শিল্পীরা এবং সম্ভবতঃ মেয়েরাও, শব্দের চেয়ে রূপকল্পের সাহায্যেই বেশি ভাবেন। কিন্তু যেই আমরা সুসম্বন্ধভাবে ভাব ব্যক্ত করতে থাকি, অমনি আমাদের প্রচলিত প্রতীকের সাহায্য নিতে হয়—এবং প্রধানতঃ তা ভাষা। ভাষার ওপর রবীন্দ্রনাথের ছিল অসাধারণ দখল, এবং আমার মনে হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ভাষার যোগ সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলেছেন—আজকের দিনে তার প্রগাঢ় মূল্য আছে।

জাতীয়তাবাদকে আমি প্রশংসা বা নিন্দা করতে চাই না। জাতীয়তাবাদের নামে বহু মহান্‌ কীর্তি এবং নিদারুণ পাপ সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানে ভাঙনের একমাত্র কারণ এ-ই নয়, আরও বহু রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক মতবাদ আছে, শক্তিমত্ততার লালসা আছে, এবং জাতীয়তাবাদী নয় এমন স্বার্থ আছে যা ঠিক একই রকম বৈপ্লবিক, বর্বরোচিত এবং দুর্দান্ত। তা হ'লেও আজকের জগতে জাতীয়তাবাদই প্রবলতম শক্তি ব'লে আমার মনে হয়। য়ুরোপেই প্রথম এর প্রচণ্ড উৎক্ষেপ—ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম পরিণামস্বরূপ—সেখানে আরও কতকগুলো শক্তির সঙ্গে মিলেই এ কাজ ক'রে এসেছে—যেমন গণতন্ত্র, স্বাতন্ত্র্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু যেখানেই এদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ ঘটেছে, সেখানেই জাতীয়তাবাদ অবশ্যম্ভাবীরূপে জয়ী হয়েছে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত ক'রে নিশ্তেজ ক'রে ফেলেছে। জর্মান রোমাণ্টিকবাদ, ফরাসী সমাজবাদ, ইংরেজী স্বাতন্ত্র্যবাদ, য়ুরোপীয় গণতন্ত্রবাদ, সব জাতীয়তাবাদ দ্বারা খর্ব এবং বিকৃত হয়েছে। জাতীয়তাবাদের দম্ভ এবং লোভের যে স্রোত ১৯১৪-র সংঘাতে পর্যবসিত হয়েছিল, তার কাছে এরা সবাই পরাস্ত হয়েছিল। যারা জাতীয়তাবাদের শক্তিকে ছোট ভেবেছিল, যেমন নর্মান্‌ এঞ্জেল বা লেনিন বা কৌলিক সাম্রাজ্যবাদীরা বা বিশ্বপুঁজিবাদীরা—এবং সর্বোপরি যারাই ভেবেছিল যে এর শক্তিকে তারা নিজেদের প্রয়োজনমতো কাজে লাগাতে পারবে, তারা সবাই ঘটনার ধারা বুঝতে ভুল করেছিল এবং সাজা পেয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আজকের দিনে সাম্যবাদ নিশ্চয় একটি বিপুল শক্তি, কিন্তু জাতীয়তাবোধ ছাড়া সে ঠিক এগোতে পারে না। চীনে অথবা এসিয়ার যে সব অঞ্চল একদা ফরাসী বা ওলন্দাজশাসিত ছিল সেইসব দেশে,

আফ্রিকায়, কিউবায় আজ তাই ঘটছে ব'লে মনে হয়। মার্ক্সবাদ এবং জাতীয়তাবোধের মধ্যে যখন বিরোধ বাধে—আধুনিক ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত সবারই মনে পড়বে—তখন মার্ক্সবাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আন্দোলনের অনেকখানি হানি হয়, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তার যতই বৈষয়িক শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হোক না কেন।

জাতীয়তাবাদকে সরাসরি একটি অযৌক্তিক এবং সংকীর্ণ শক্তি ব'লে নিন্দা করা যায়, যেমন মার্ক্সবাদী এবং ক্যাথলিকরা, নব্য আন্তর্জাতীয়তাবাদীরা এবং অপরাধভীত প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদীরা, এবং স্বভাবতঃই তাদের দ্বারা উৎপীড়িত সকল শ্রেণীর, সকল জাতির এবং সকল ধর্মের লোকেরা করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও প্রয়োজনীয় হ'চ্ছে ওর মূল প্রকৃতিকে বুঝতে পারা। জাতীয়তাবাদ প্রায়ই জন্ম নেয় আহত মানবমর্যাদাবোধ থেকে, পরিচিতি-লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে। এই আকাঙ্ক্ষা মানবেতিহাসের একটি প্রবলতম শক্তি। এ অনেক সময় বিকট রূপ নেয়, কিন্তু আসলে এ অস্বাভাবিক বা মারাত্মক কিছু নয়।

আমার মনে হয় আজকের যুগে এই পরিচিতিলাভের আকাঙ্ক্ষাই দুনিয়ায় সবচেয়ে উদগ্র শক্তি। এর বিচিত্রমুখী সত্তা অনেক সময় সুসন্নিহিত এবং পরস্পর প্রতিক্রিয়া-শীল রূপ নেয়—কখনও ব্যক্তিগত কখনও সমষ্টিগত; নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক; তা হলেও নানারূপের মধ্যেও এর স্বকীয়তা ঠিকই বজায় থাকে। ছোট ছোট রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র সত্তা ব'লে পরিগণিত হ'তে চায়, এবং বড় বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে সমান হ'য়ে বেঁচে থাকবার, বড় হবার, স্বাধীন হবার, নিজের কথা বলার দাবী করে। দরিদ্র চায় ধনীর সমকক্ষ ব'লে পরিচিত হ'তে, ইহুদিরা খ্রীস্টানের, কালোরা শ্বেতদের, মেয়েরা পুরুষের, দুর্বলেরা সবলের। আধুনিক যুগে কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রের মধ্যেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরা শক্তি এবং মর্যাদার জন্য লড়াই করে : সচ্ছল সমাজগুলিতে এটা সবচেয়ে ভালো ক'রে বোঝা যায়। সেখানে এই পরিচয়ের দাবী সবচেয়ে প্রভাবশালী যে রূপ নেয় সে হ'চ্ছে শ্রেণী-সচেতনতা। আমার নিজের দেশে যেমন এইটেই হ'চ্ছে সামাজিক অশান্তির গভীরতম মূল। ব্রিটেন এবং য়ুরোপের বহু অংশে যে অর্থনৈতিক বিপ্লব নিঃশব্দে ঘটে গেছে, তা বহু অর্থনৈতিক রোগের নিরাময় করেছে, প্রাণধারণের মান উন্নত করেছে, আর্থিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অভূতপূর্ব প্রসার ঘটিয়েছে। আমাদের যুগের অপেক্ষাকৃত ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বা রাষ্ট্রনৈতিক অসামর্থ্যের ভার পাশ্চাত্ত্য দেশের অধিকাংশ তরুণদের মন পীড়িত ক'রে রাখে না, যা রাখে তা হ'চ্ছে তাদের সামাজিক পদমর্যাদার অনিশ্চয়তা—কোথায় তাদের স্থান, কোথায় তারা থাকতে চায় বা চাইতে পারে তাই নিয়ে সংশয়। অর্থাৎ যথেষ্ট স্বীকৃতিলাভের অভাবের জন্য তাদের ক্ষোভ। অবস্থা তাদের স্বচ্ছল হ'তে পারে, কাজে উৎসাহ থাকতে পারে, কল্যাণরাষ্ট্র তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে, তবুও তারা যেন যথেষ্ট স্বীকৃত নয়। কাদের দ্বারা স্বীকৃত? 'ওপর মহলের লোকেদের' দ্বারা, শাসক-শ্রেণীর দ্বারা। বহুনায়কতান্ত্রিক সমাজে—যেমন বংশানুক্রমিক অভিজাতশ্রেণীশাসিত সমাজে (আজ অবশ্য য়ুরোপে তেমন কিছু নেই) এই প্রচেষ্টা এক শ্রেণীর সঙ্গে আরেক শ্রেণীর শক্তির লড়াইরূপে দেখা দেয়। ইংলণ্ড, এবং পশ্চিমের অনেক দেশে অবস্থা আরও জটিল : যেখানে অপরিচিত এবং স্বল্পপরিচিতেরা তাদের সমাজে এমন এক একটি দলের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা না নিলেও যারা—সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা চিন্তার জগতের মূল সুরটি ধরিয়ে দেয়। এরা বিরোধী রাষ্ট্রনৈতিক দলভুক্ত হ'তে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে মিল এই, যে তাদের সবার আত্মবিশ্বাস সমান, ব্যক্তি ও সমাজ-



জীবনের রুচির নিয়ন্তারূপে নিজেদের গণ্য করতে তারা অভ্যস্ত। যদি তারা কখনও কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করে, তবু সেটা খাঁটি আদবকায়দা অনুযায়ী করতে ভোলে না, কারণ তারা হ'চ্ছে বিদগ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। এ গোষ্ঠীর বাইরের লোকেরা অবশ্যই এদের অধিকারবোধকে অতিরঞ্জিত ক'রে দেখে, কিন্তু তাহলেও বিষম সমাজে মানুষ সাধারণতঃ জানে কারা তার উন্নতির পথে বাধা দিচ্ছে। বিদগ্ধদল অবশ্যই আছে। তবে ইংলণ্ডে তারা এখনও অনেকটা পুরুষানুক্রমিক, এবং পাব্লিক স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মানববিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যারা তার অন্তর্ভুক্ত হ'তে চায় তাদের কাছে এখনও এদের সংহতি ঈর্ষা ও সম্ভ্রমের বস্তু। সাধারণতঃ এ সব ক্ষেত্রে যা হ'য়ে থাকে, এদের তারা অবজ্ঞা দেখানোর ভান করতে পারে এবং প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষয়িষ্ণু প্রভৃতি বলতে পারে, কিন্তু মনে মনে তারই সঙ্গে ঈর্ষা করে এবং এদের সমর্থনের জন্য লুব্ধ হয়। যারা এর বহির্ভূত তারা দরিদ্র কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন নাও হ'তে পারে। স্যর চার্ল্স্ স্নো-র 'দুই সংস্কৃতি'র ধারণা আমার কাছে মোটের ওপর ভুল মনে হয়। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় না, কারণ অ্যাংলোস্যাক্সন দেশে এমন বহু বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁরা মনে করেন ঈর্ষাজনক এক ক্ষুদ্র জগতে তাঁদের প্রবেশাধিকার নেই। যদিও চতুর্দিকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে তাঁরা বৈজ্ঞানিকেরাই আজ সবচেয়ে প্রভাবশালী, ভবিষ্যৎ সমাজগঠনে মানবতাবাদী বিদগ্ধসমাজ অথবা তারই আওতায় বর্ধিত অমাত্যসমাজের চেয়ে তাঁদেরই দায়িত্ব বেশি, তবু তাঁদের সান্ত্বনা নেই। তাঁরা জানেন প্রকৃত দলপতি কারা। যখনই সমাজগঠনের কোনও একটা প্রণালী সমান জরুরী অন্যান্য কতকগুলি প্রণালীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারে, তখনই এই পরিস্থিতি দেখা দেয়। এ যুগের ইতিহাসে অবিচার, অত্যাচার, বেদনাকে বিদ্রোহের যথেষ্ট কারণ ব'লে মনে হয় না। যে সমাজের গঠন একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর হাতে বহুদিনসঞ্চিত ক্ষমতা থাকার ফলে বেশ সংহতি পেয়েছে, সেখানে মানুষ বহু শতাব্দী ধ'রে কষ্ট পেয়ে আসতে পারে। টনক নড়ে তখনই যখন এই সংহতি কোনও কারণে ভেঙে পড়ে। মার্ক্সবাদীরা যন্ত্রশিল্পের উদ্ভাবনকে এই রকম একটি কারণ ব'লে মনে করেন সেটা স্মরণ রাখবার মতো। যখন অনুরূপ কোনও কারণে ভারসাম্য নষ্ট হ'য়ে যায়, তখন শক্তির পুনর্বণ্টনের একটা সুযোগ ঘটে, যারা ওলটপালট ঘটাতে চায়, তাদের সেটা সুবর্ণসুযোগ। আমাদের দুনিয়ায় আজ দুর্দিন দেখা দিচ্ছে তার কারণ ব্যক্তিগত প্রতিভা ও কৃতিত্ব, অর্থনৈতিক শক্তি ও সামর্থ্য কোন কিছু এই সর্বপ্রধান বস্তু সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। এই মর্যাদার অভাব, বাপমায়ের অসম্মান, সন্তানের লাঞ্ছনা—এইসব থেকেই মানুষ রাজনৈতিক চরমপন্থা অবলম্বন করে। অবশ্য এটা রাজনৈতিক রূপ না নিয়ে সামাজিক বা শিল্পগত রূপও নিতে পারে। 'রাগী ছোকরার দল', 'বীট্নিক', মার্কিন হিপ্স্তরের তারই দৃষ্টান্ত এবং মিঃ অ্যান্টনি ক্রস্ল্যাণ্ড যাকে 'অল্ডারম্যাস্টন্ আন্দোলন' ব'লে অভিহিত করেছেন, অনেকাংশে সেটাও, যদিও তার পিছনে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শবাদও কাজ করছে। পশ্চিমী দুনিয়ায় এ কোনও নতুন ঘটনা নয়। এ কথা সর্ববিদিত যে ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হ'চ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী মধ্যবিত্তদের অর্থ-নৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক স্বীকৃতির মধ্যে বিপুল অসামঞ্জস্য। উনিশ ও বিশ শতকের বিপ্লবীরা অনেক সময়েই ছিলেন সমাজে অস্বীকৃত কিন্তু ক্ষমতাবান্ এবং নিজের চেষ্টায় মানুষ, এমনি ব্যক্তিদের সন্তান। রাশিয়ার বেলা এ কথা বিশেষভাবে সত্য। রুষ বিপ্লবের

উৎস ছিল এক অত্যাচারী শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষোভ, আর রাষ্ট্র যাঁদের যোগ্য মর্যাদা দেয়নি, সেইসব মানুষদের স্বীকৃতিসন্ধান। রুষ সাম্রাজ্যের দ্রুত-প্রসারী শিল্প-বাণিজ্যপুষ্ট ধনিক সম্প্রদায় সেদিন অভিজাতসভায় আসন পাচ্ছিলেন না। অহঙ্কার এবং নৈতিক মর্যাদাবোধ অনেক সময় বাস্তব স্বার্থবোধকে ছাড়িয়ে যায়। তাই তাঁদের উত্তরপুরুষেরা পশ্চিম থেকে আমদানি মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এমন বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন, যা শুধু রাজনৈতিক অবস্থারই বিরোধী হল না, তাঁদের পিতৃপুরুষের অর্থনৈতিক ভিত্তিরও বিরোধী হল। মধ্য য়ুরোপ এবং বল্‌কানে তাই ঘটেছিল—বিত্তবান্ পিতার সন্তানেরা বিদেশী শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে এবং পিতৃ-পুরুষের সামাজিক মর্যাদার অভাবে ক্ষুব্ধ হ'য়ে চরমপন্থী হ'য়ে ওঠেন। আমার মনে হয় তুরস্ক, মিশর, সিরিয়া এবং ইরাকেও পাশাদের অবজ্ঞাত উচ্চমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেদের বেলায়ও এই জিনিসই ঘটেছিল।

এই অসন্তোষ সাধারণতঃ কোনও একটি ক্ষমতাসম্পন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই ব্যক্ত হয়—পাশাদের বিরুদ্ধে যেমন হয়েছিল; অথবা অনেকসময় আন্দোলনের মন্ত্রদাতাদের বিরুদ্ধেই উদ্গিরিত হয়—ফ্রাঙ্কলিন্ রুজেভেল্ট্, স্ট্যাফোর্ড্ ক্রিপ্‌স্, বার্ট্রাণ্ড রাসেল্‌দের বিরুদ্ধে, বিপ্লবী জির'দীদল আর ফ্রান্স-রাশিয়া-আমেরিকার অভিজাত চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে। —মানুষের সঙ্গিহীনতায়, সুপিনন্ধ সমাজের মধ্যে ভাঙন ধরার ফলে এর মূল আরও গভীরে। রাস্কিন্ এবং মরিস্, এবং তাঁদেরও আগে ফুরিয়েরু এবং মার্ক্স্ এবং প্রুধন্ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে অতিমাত্রায় যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে কী ক'রে সমাজের মধ্যে আস্তে আস্তে ফাটল ধরে, এবং মানুষের প্রগাঢ়তম মূল্যগুলির অবনতি ঘটে—স্নেহ প্রেম বিশ্বস্ততা ভ্রাতৃত্ববোধ, একটি সাধারণ লক্ষ্যের প্রেরণা, এবং শৃঙ্খলা, সুষ্ঠুতা, কর্মনিষ্ঠা লুপ্ত হয়। এর পরিণাম আমাদের সুপরিচিত—মানুষ ক্রমশঃ মনুষ্যত্ব হারায় এবং রূপ নেয় সর্বহারা—জনগণ—কামানের খোরাক। কালে কালে এর প্রতিষেধক আবার এর থেকেই উদ্ভূত হয়: সবচেয়ে আত্মসচেতন এবং সুবেদী মানসে বিপ্লবী মনোভাবের সঞ্চার এবং সেই সঙ্গে খণ্ডিত সমাজকে আবার পূর্ণতা দেবার আকাঙ্ক্ষা, এবং মানুষে মানুষে সেই প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা—সমস্ত সত্য মানবিক সম্পর্কের যা ভিত্তিস্থল।

আমাদের যুগের সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মূলে মানুষ ব'লে, সমকক্ষ ব'লে পরিগণিত হবার এই দাবী। স্বীকৃতিলাভের জন্য হাহাকারের এটা হ'ল আধুনিক রূপ—উগ্র, বিপজ্জনক, কিন্তু ন্যায়সঙ্গত এবং মূল্যবান্। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী, জাতি, রাষ্ট্র এবং বিরাট একদল মানুষ স্বীকৃতিলাভের জন্য ক্ষোভ জানায় তাদের বিরুদ্ধে, যারা তাদের মানবমর্যাদার ন্যূনতম মান থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে, পদদলিত করে রেখেছে তাদের দাবীকে। গত দুশো বছরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই অনুভূতিতে ভরা। এক জাতি, এক শ্রেণী, অথবা এক দৃষ্টিভঙ্গীর লোকেদের ঐক্যবোধ আহত হ'লে তার থেকে সঞ্চারিত হয় জাতীয়তাবাদ। সাধারণতঃ তা দুয়ের একটি রূপ নেয়: হয় আপন অক্ষমতার, অথবা পিছিয়ে থাকার সচেতনতা বা উন্নততর জাতির অনুকরণ ক'রে তাদের সমান হবার প্রচেষ্টা; নতুন রাষ্ট্রের এবং নতুন নেতাদের এই আকাঙ্ক্ষা—রাজনৈতিক ঐক্য, শিল্পবাণিজ্যের শক্তি, যন্ত্রশিল্প ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান—সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া—যাতে 'ওরা' আর 'আমাদের' নীচু নজরে না দেখতে পারে। অপর পক্ষে দেখি সখেদে নিজেকে পৃথক্ ক'রে সরিয়ে রাখার ইচ্ছা, অসমান প্রতিযোগিতা পরিহার করে আপন সুকৃতির উপরে মনঃসংযোগ,



এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্চঘোষিত গুণাবলীর চেয়ে আপন কীর্তির শ্রেষ্ঠত্ববোধ। আহত আত্ম-সম্মানের এটা একটা স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী, ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, রাষ্ট্রের পক্ষেও তেমনি। একে আশ্রয় ক'রে যে মতবাদ খাড়া হ'য়ে ওঠে, তাও সুপরিচিত। বিদেশীর সস্তা মালের চেয়ে আমাদের অতীত, আমাদের ঐতিহ্য অনেক বেশি ঐশ্বর্যবান্—বিদেশীর পিছনে ছোটা যে কোন অবস্থাতেই অসম্মানজনক এবং আপন অতীতের প্রতি কৃতঘ্নতা; আমাদের আধ্যাত্মিক এবং ঐহিক অবস্থা সেই প্রাচীন উৎসের কাছ থেকেই ফিরিয়ে আনতে পারি, যা একদিন, হয়তো কুয়াশাচ্ছন্ন এক অতীতে, আমাদের শক্তিমান করেছিল, সমাদর ও ঈর্ষার পাত্র ক'রে তুলেছিল। রুষ ইতিহাসের ছাত্রদের নিশ্চয় মনে পড়বে উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্ত্যবাদী ও স্লাভ্‌প্রেমিকদের মধ্যে স্মরণীয় সেই বিতর্কের কথা। একদল দোহাই দিচ্ছেন বিজ্ঞানের, সংস্কারমুক্তির, যুক্তিবাদের, স্বাধীনতার, সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ দান পশ্চিমে কুসুমিত হ'য়ে উঠেছে সেই সবের; অপর দল পশ্চিমকে ধিক্কার দিচ্ছেন তার কঠিন অমানুষিকতার জন্য, তার সংকীর্ণ, শুষ্ক, আইনমাফিক নীরসতার জন্য, তার অন্ধ অনুশাসন আর অরাজকতার মধ্যে দোলার জন্য, তার সামাজিক অন্যায় আর প্রেমহীন মানবসম্পর্কের জন্য। তাঁরা চান রাশিয়ার সেই নির্মল অতীতের সেই 'জৈব', 'মৌল' সমাজব্যবস্থায় ফিরে যেতে, যেখানে অমাত্যতন্ত্র ছিল না, পীটার দি গ্রেটের তৈরী শ্রেণীবৈষম্য ছিল না। তাঁরা সেই ভ্রাতৃত্ববোধের দোহাই দিয়েছিলেন, যা স্লাভ্‌জাতিগুলিকে একসূত্রে বেঁধেছিল। মানুষ তখন পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী ছিল, কেবল অধিকারের দাবী নিয়ে চিৎকার করত না। অধিকার মানেই সীমারেখা সৃষ্টি, মানুষের মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি, স্বাভাবিক ভালোবাসা থাকলে যার দরকার হয় না, যেমন এক পরিবারের মানুষদের মধ্যে হয় না। অর্থাৎ যে বিষয়টির ওপর আমি জোর দিতে চাই তা হ'ল এই, উভয় দলই এক স্বীকৃতিলাভের ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত। ১৯১৭-তেই সে ইচ্ছার মৃত্যু হয়নি।

এই একই চিন্তা ও অনুভূতির আদল পাওয়া যায় জার্মান রোম্যাণ্টিক্‌বাদীদের মধ্যে, সেই লেখক এবং চিন্তানায়কদের মধ্যে, যাঁরা দেশবাসীদের মুগ্ধ ক'রে ভাবতে শেখালেন যে একটি জাতি হ'চ্ছে একটি বিরাট সম্মিলিত সত্তা আর তার কাজ হ'চ্ছে 'গণ-আত্মা'কে প্রকাশ করা। এইভাবে তাঁরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, কার্তেসিয় জাতীয়তাবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ, 'গাণিতিক গণতন্ত্র', ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিমের নির্জীব যান্ত্রিকতা—অর্থাৎ সংক্ষেপে, ফরাসী প্রভাবের (যে প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে তাদের দাবিয়ে রেখেছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক অবমাননার ভারগ্রস্ত করেছিল) পরিবর্তে আনলেন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টি এবং কাব্যিক চেতনা। এমন কি স্বাধীন, দৃপ্ত, সমৃদ্ধ ইংলণ্ডেও এই মনোভাব ঘনিয়ে উঠল ঐতিহ্যের আদর্শীকরণে, বার্ক্ এবং কোল্‌রিজের যুক্তিবাদ-বিরোধিতায়, এবং নব্যমধ্যযুগবাদীদের প্রাক্-শ্রমশিল্পযুগের ইংলণ্ডে এবং পুরাতন ধর্মমতে ফিরে যাবার চেষ্টায়। য়ুরোপের সর্বত্র এই জিনিস দেখা দিয়েছিল। এ-ও এক ধরনের স্বীকৃতিসন্ধান—আমরা কী আছি এবং কী হ'তে পারি, ইতিহাসে আমাদের দান এবং মূল্য—অন্য জাতির কাছে না হ'লেও অন্ততঃ আপনজনদের কাছে এটুকুর স্বীকৃতি। এই যে আত্মশক্তি লাভের জন্য নিজের মধ্যে অপসরণ—এর মধ্যে একটা 'আঙুরফল টক'-গোছের ভাব আছে: 'ওরা' যদি 'আমাদের' দাম না দেয়, 'আমরাও' তা'হলে 'ওদের' চাই না। না, আরও বেশি, আমরা ওদের ঘৃণা করি, ওদের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে বলে মনে করি, ওরা হ'ল 'পচন্ত পশ্চিম'। ওরা আমাদের যা দোষ ব'লে মনে করে—যেমন আমাদের আদিম সরলতা, আর

ওরা যে সব গুণের আদর করে—অতিবৈদগ্ধ্য, রাজনৈতিক চেতনা, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী—আমাদের মধ্যে সেগুলির অভাব কোনও ত্রুটি নয়, আসলে এগুলি হ'ল আমাদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিরই লক্ষণ, অন্ধ ওরা তা বুঝতে পারে না।

আমার মনে হয় আজকের দিনে যে সব নতুন জাতি বিদেশী শাসনের জোয়াল ঝেড়ে ফেলে উঠে ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের অকারণ প্রভুত্বমদে মেতে উঠেছে, তাদের পিছনেও এই ধরনের বিদ্বেষের ভাবই কাজ করছে। উদারপন্থীরা যথার্থই এই মনোভাবের নিন্দা করেন। কিন্তু তবু একে বোঝা দরকার। বুঝলেই যে ক্ষমা করতে হবে এমন নয়। কিন্তু তাই ব'লে পুরানো উপনিবেশবাসীরা যে বিদেশীদের সদয় শাসনের চেয়ে স্বদেশীদের নির্দয় শাসনও সহ্য করতে রাজি, সেদিকে অবজ্ঞাভরে আঙুল দেখালেই চলবে না। এটা কোনও অদ্ভুত বা নিন্দনীয় মনোভাব নয়। সমস্ত অত্যাচারই ঘৃণার যোগ্য, কিন্তু আপন লোকের খবরদারি বিদেশীর হুকুমের চেয়ে কম অবমাননাকর—সে হুকুম যতই সুবিবেচনাপূর্ণ এবং নিঃস্বার্থ হোক না কেন—এ মনোভাব নিশ্চয় বুঝতে কষ্ট হয় না।

তবু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই সবসময় স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা, স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না। এমনও হ'তে পারে যে বিদেশী সংস্কৃতির ছাপ আমার নিজের সংস্কৃতির ওপর খুব গভীর হ'য়ে পড়েছে, এবং আমার সভ্যতাকে কিছুটা বিকৃত ক'রে ফেলেছে, কিন্তু তবুও তাকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা। হয়তো অবাঞ্ছিত উৎস থেকে এলেও তার সত্য, মহৎ বা আনন্দদায়ক কতকগুলি দিক আছে যাকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না। এবং স্বাধীনতার গর্বে যদি প্রাচীন বর্মচর্মের ভার কাঁধে তুলে আমি তার সব দান ভুলে যেতে চাই, তাতে হয়তো নিজেকে সংকীর্ণ করে ফেলব; প্রাদেশিকতার, অসহিষ্ণুতার গোঁড়ামি হয়তো আমাকে পেয়ে বসবে; কাল যা সত্য ব'লে জানতাম আজ হয়তো জোর ক'রে তা অস্বীকার করব। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছে এবং পুরানো মনিবের শিক্ষা ভুলতে পারছে না, তাদের সবারই এই সমস্যা। হয়তো মনিবের শিক্ষা সম্পূর্ণ পরোপকারপ্রবৃত্তিপ্রসূত হয়নি, হয়তো নিজের স্বার্থেই হয়েছে। অন্ততঃ ভারত ও ইংলণ্ড সম্পর্কে কার্ল্ মার্ক্স্ এ কথা ঠিকই বলেছেন। তবু এ কথা মানতে হবে যে ইংরেজরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবং যথেষ্ট সুফলের সঙ্গে তাদের ভারতীয় প্রজাদের অনিবার্য বস্তুগত ও বুদ্ধিগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। হয়তো মাঝে মাঝে তাদের আচরণ বর্বরোচিত হয়েছে, কিন্তু ভারতীয়েরা নিজেরা এত দ্রুত এই পরিবর্তন সাধন করতে পারত না।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার আলোচনা সুরু, কিন্তু সেখান থেকে আমি অনেক দূরে স'রে গেছি। এবার আবার সেইখানে ফিরে যেতে চাই; কারণ আমার এই চিন্তাগুলি তাঁরই প্রবন্ধ ও ভাষণমালা প'ড়ে আমার মনে জেগেছে। তাঁর কতকগুলো লেখা বছর দুই আগে আমার বন্ধু হুমায়ুন কবির আমাকে পাঠিয়েছিলেন। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্ক বিষয়ে আমার জ্ঞান সামান্য। আমি যা বলব তা অনেকের কাছে অসত্য বা অবান্তর বা অজ্ঞতা ব'লে মনে হ'তে পারে। যদি তাই হয়, তবে আমি সংশোধনের অপেক্ষায় থাকব। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে যে তাঁর সামনে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, বিশেষ ক'রে শিক্ষাপ্রকরণ এবং ভারতীয় ঐকাসম্বন্ধে সমস্যাগুলি, তা উনিশ শতকের রাশিয়া কিংবা জার্মানির আর বিশ শতকের আমেরিকার চিন্তানায়ক এবং সংস্কারকদের সমস্যা থেকে খুব ভিন্নধরণের নয়। কারণ এই সব দেশের সংস্কৃতি দীর্ঘকাল বিদেশীয় শাসনের ফলে এক



দ্বিধাবিভক্ত অবস্থায় উপনীত হয়। একদিকে বিদেশী আদর্শ অনুকরণ ক'রে কিছু তোতাপাখি ও মর্কট সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে এবং দেশীয় গুণগুলি লুপ্ত পায়; অন্ততঃ বিদেশী দেবতাদের ভজনা ক'রে সে গুণগুলির স্বাভাবিক বিকাশের পথ বিকৃত হ'য়ে যায়। অন্য পক্ষে বিদেশী বিষটা ততদিনে অনেক গভীরে প্রবেশ ক'রে ফেলে। জার্মানদের কাছ থেকে আশা করা যায় না, যে তারা গ্রীক্ লাটিন্ সাহিত্য, রোমান্ আইন, ফরাসী 'মহাযুগের' লেখকদের ভুলে যাবে—এগুলো তাদের শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। রুষ অভিজ্ঞতা আরও শিক্ষাপ্রদ। পীটার দি গ্রেট্ তাঁর প্রজাদের মনে এক তীব্র চমক লাগিয়েছিলেন। তিনি প্রাচীর ভেঙে ফেলে, দরজা জানলা খুলে দিয়ে এমন একটি শিক্ষিত সমাজের সূচনা ক'রে দিলেন, যাদের অভ্যাস এবং দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই রুষজাতিসুলভ ছিল না। একটি বিদেশী ভাষা—ফরাসী-চর্চার মধ্য দিয়ে তারা মধ্যযুগীয় দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, গ্রাম্যতায় নিমগ্ন জনসাধারণের থেকে নিজেদের আলাদা ক'রে ফেলল। এর ক্ষত বহুগভীরপ্রসারী হ'ল। একে সারাবার জন্য দুশো বছর ধ'রে রাশিয়ার প্রতিটি সমাজকল্যাণসাধক, প্রতিটি শিক্ষিত লোক মাথা ঘামিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অধিকতর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা বুঝেছিলেন, যে ফরাসী বা জার্মানির সাংস্কৃতিক আক্রমণকে অগ্রাহ্য ক'রে তাকে রোখা যাবে না, আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দিলেও কোন ফল হবে না, শুধু সময়কেই পিছিয়ে দেওয়া হবে, কারণ রাশিয়া পৃথিবীরই অংশ, আর দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে বাইরের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাবকে ঠেকানো যায় না। কোন কোন সাহসী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি ঠিক এই মতবাদই প্রচার করেছিলেন। যদি ধর্মসংস্কারমুক্ত শিক্ষা বন্ধ করা যায়, প্রগতিকে রোখা যায়, রাশিয়াকে আজকালকার মতো যোগাযোগরহিত এবং আলাদা ক'রে দেওয়া যায়, তবে এই মারাত্মক পাশ্চাত্ত্য বীজাণু ধ্বংস হ'তেও পারে, অন্ততঃ কম ক্ষতিকর হ'তে পারে। কিন্তু এই কঠোর পন্থা আজ অবধি কৃতকার্য হ'তে পারেনি। প্রাচীন সংস্কৃতি দিয়ে আধুনিক মানুষের প্রয়োজন মেটেনা। প্রাচীনের ওপর নবীনের প্রলেপ দরকার; তা নইলে হয় পাথর বনে যেতে হবে, নয় বিদেশীর অক্ষম অনুকরণ করতে হবে। একটি জাতি কোন দুর্লভ গাছ নয়; সাধারণ বিশ্বের খোলা হাওয়ার মধ্যেই তার বিকাশ সম্ভব। মৃত সভ্যতার রসে কৃত্রিম আলোয় তার পূর্ণতা লাভ হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথের রচনা আমি যা পড়েছি, তা থেকে মনে হয়েছে গত শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষকে ঠিক এমনি এক সমস্যারই সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। তিনি যথার্থ জ্ঞানীপুরুষের মতো অতি প্রাচীন ও অতি নবীনের মাঝখান দিয়ে একটি সমন্বয়ের কঠিন পথ অবলম্বন করেছিলেন। আমি জানি কেউ কেউ মনে করেন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের কাছে বড়ো বেশি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ইংরেজিতে তাঁর যে সব লেখা পড়া যায়, তা থেকে এ ধারণা আমার হয়নি। আমার মনে হয়েছে তিনি ঠিক মাঝের পথটি নিতে পেরেছিলেন। এই সংকটমুহূর্তে দেশবাসীর ও জগতের চোখ ধাঁধানোর ও অক্ষয় খ্যাতি পাবার লোভ সংবরণ ক'রে উভয়পক্ষের নিন্দা কুড়িয়েও এই যে সত্যান্বেষণ—একেই বলে পরম বীর্য।

একদিকে ইংলণ্ড, অন্যদিকে ভারতের সুমহান্ অতীত। রবীন্দ্রনাথ ভালোকরেই বুঝেছিলেন যে ইংরেজি সাহিত্য বরও বটে শাপও বটে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে যারা ভারতবর্ষকে ভুলে স্কুলেপড়া ইংরেজির গর্বে স্ফীত হ'য়ে ওঠে তাদের তিনি বলেছিলেন 'অসভ্য রাজারা যেমন বিলাতী সাজগোজ করে কতকগুলা সস্তা বিলাতী কাচখণ্ড প্রভৃতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে।' যেখানে শিক্ষার সঙ্গে ছাত্র-

জীবনের কোনও যোগ নেই, আছে সুদূর কোনও জীবনধারার সঙ্গে, সেখানেই এটা ঘটে। টলস্টয় তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধে এ কথা খুব পরিষ্কার ক'রে বলেছেন। এ দ্বন্দ্বের ফলে যে স্নায়ুবৈকল্য দেখা দেয় তা কেবল ভারতবর্ষেই ঘটেনি, আমেরিকানদের জীবনের কোন কোন ব্যাপারে মনে হয়—অবশ্য এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই—যে অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশের বাইরের থেকে যারা এসে ওখানে বসবাস করেছিল, তাদেরও কেবল শেক্সপিয়র আর ডিকেন্স্ আর থ্যাকারে অথবা হর্থন্ বা মার্ক টোয়েন্ বা মেল্‌ভিল্ পড়তে হয়েছিল ব'লেই এ ব্যাপার ঘটেছে। এ সব বইয়ে যে জীবনের কথা পাওয়া যায় তা অ্যাংলো-স্যাক্সনদের অথবা ডাচ্ বা জার্মান বা স্ক্যান্ডিনেভিয়দের পূর্বপুরুষদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিল, কিন্তু রুষ বা বোহিমিয় বা গ্রীক্ বা ইহুদি অথবা সিসিলি বা সিরিয়া বা আফ্রিকার অধিবাসীদের পক্ষে কেমন ক'রে তা সম্ভব হবে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এ অবস্থা যখন ঘটে, তখন জীবন ও শিক্ষাতে যাত্রাদলের সঙেদের মতো ঠোকাঠুকি বেধে যায়। তাই তিনি বাংলাভাষার পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন—সে অন্ততঃ একটা স্বাভাবিক প্রকাশের পথ হবে, ধারকরা পোষাক হবে না। আবার সেই সঙ্গেই তিনি এ-ও বুঝেছিলেন যে ইংরেজির দ্বার রুদ্ধ ক'রে রাখলেও চলবে না, যন্ত্রতন্ত্রহীন পশ্চিমীপাদমূল্ডে সেই সনাতন এক যুগে ফিরে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ যদিও এই যান্ত্রিকতার ফলে স্বাভাবিক মানবমূল্যগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে থাকবে। তিনি বুঝেছিলেন, যে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্কে শত উপকার থাকলেও আসলে সেটা অসুস্থ সম্পর্ক। ইংরেজরা এদেশে বণিকের বেশে এসে রাজা হ'য়ে বসেছিল, এবং দু'চারজন নিঃস্বার্থ ভারতসেবী ছাড়া (তাঁদের তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন) রাজা-প্রজার সম্পর্ক উভয়ের দৃষ্টিকেই বিকৃত ক'রে রেখেছিল। উভয়েই পরস্পরকে সমশ্রেণীর মানুষ, আত্মীয় ব'লে দেখতে ভুলেছিল। হেগেল্-এর 'ফেনোমেনলজি'তে এই মনোভাবের চমৎকার বর্ণনা আছে; এবং একশো বছর পরে ই. এম. ফর্স্টার অন্যভাবে এই একই তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইংরেজচরিত্র এবং ইংরেজের কীর্তি বুঝেছিলেন এবং তার প্রশংসাও করেছেন। ধীর ভাবে তার বিচার তিনি করেছেন এবং আমার মতে সুবিচারই করেছেন। ইংরেজের দান তিনি ফেলে দিতে বলেন নি। কিন্তু বিজাতীয় ভাষায় স্বাধীন সৃষ্টি সম্ভব নয়। বিদেশীর ভাষা স্বাধীন চিন্তাকল্পনার ওপর আঁটজামার মতো চেপে থাকে, তাকে অস্বাভাবিক ক'রে তোলে, হয়তো কখনো চমৎকার চাতুর্য (কন্‌রাড বা আপলিনেয়ার যেমন) দেখায়, আর কখনো অস্বস্তিকরভাবে পীড়াদায়ক হ'য়ে ওঠে। তাই প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে কথা বলতে পারার ক্ষমতা। পরের স্বরে বিজ্ঞতা ফলানোর চেয়ে নিজের স্বরে যা-তা বলার অধিকারও শ্রেয়ঃ। 'ব্রিটিশ ব্যবস্থা যতবড়োই হউক তাহা আমাদের নহে।...নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনোই ঠিকমতো হইতে পারে না'—এ কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮-এ প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন। ভারতের পক্ষে ইংরেজি হ'চ্ছে বিশ্ব-জগতের একটি বাতায়নস্বরূপ। তাকে বন্ধ করা অপরাধ হবে এই রকম তাঁর ধারণা ছিল ব'লে আমার মনে হয়। কিন্তু বাতায়ন তো দুয়ার নয়, তার ভিতর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা বড়ো অদ্ভুত হবে। 'ইংরেজরাও, যতদূর সম্ভব, এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। ...ইংরেজের খাতায় হিসাবের অঙ্কে আমরা কতবড়ো একটা শূন্য।' স্বয়ং মর্লি এই অপরাধে অপরাধী। এ অবস্থায় কী ক'রে ভারতীয়েরা অন্যের মূল্যায়নের ওপর ভরসা না রেখে নিজেদের চালিত করবে? শক্তি অর্জনের দ্বারা। আবার রবীন্দ্রনাথের কথায়



বলি : 'আর কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।' মৌলিয়ান্ কথোপকথনে থুকিডিডিস্-এর মতো, মাকিয়াভেল্লির মতো, সমস্ত মহৎ বস্তুনিষ্ঠ চিন্তানায়কদের মতো তিনি বুঝেছিলেন যে অজ্ঞতা, অবাস্তব আদর্শবাদ, সত্যকে এড়িয়ে কেবল আবেগমন্থনের চেষ্টা সময় সময় অবিশ্বাস এবং বর্বরতার মতনই সর্বনাশ হ'তে পারে। তারই দৃষ্টান্ত-রূপে তিনি ব্রহ্মা ও ছাগশিশুর গল্প ফেঁদেছেন। দুর্বল ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়ে কেঁদে বলেছিল, 'ভগবান্, পৃথিবীতে সবাই আমাকে খেতে চায় কেন?' ব্রহ্মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'বাপু, অন্যকে দোষ দেব কী, তোমার চেহারা দেখলে আমারই খেতে ইচ্ছে করে।' এই নিদারুণ গল্পটি থেকে রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাই গ্রহণ করছেন যে মানুষকে বীর্যবান্ হ'তে হবে—শক্তি না থাকলে সমতা থাকবে না, সুবিচার থাকবে না। সমস্ত রাষ্ট্রের সাম্য চাই এ কেবল ফাঁকা ধর্মের বুলি। মানুষের যা স্বভাব তাতে দুর্বলের প্রতি ন্যায়বিচার দুর্লভ এবং কঠিন। আর মানবপ্রকৃতিকে আমূল বদলানো—সে স্বপ্ন বললেই চলে। হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই দিয়েই মানুষের উন্নতিসাধন করতে হবে, সাধুসন্তদের যোগ্য দুর্লভ পুণ্যের অধিকারী হ'য়ে নয়। মানুষ স্বীকৃতি চায়। ঠিক কথা। শক্তিমান্ না হ'লে সে তা পাবে না। সহযোগিতা এবং সংগঠনের সাহায্যে তাকে সেই শক্তি অর্জন করতে হবে, তার জন্য কৃতজ্ঞতার আশা করলেও চলবে না। শক্তির অন্যান্য রাস্তা আছে : কিন্তু রবীন্দ্র-নাথ তাদের বর্জন করেছেন। নীটশের অনৈতিকতা, হিংসার পথ আত্মঘাতী কারণ তাতে প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ টল্‌স্টয় ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একমত। কিন্তু তিনি টল্‌স্টয়ের ক্রুদ্ধ সরলীকরণ, তাঁর আত্মনির্বাসন বা অরাজক মনোভাব চান নি; অথবা মহাত্মাজীর (আমার ভুল হ'লে সংশোধন আশা করবো) অরাজনৈতিক বা ধর্মনিরপেক্ষ-তার অতীত লক্ষ্যগুলিও তিনি চান নি। যখন তিনি একান্তভাবে সংস্কৃতির কথাই ভেবেছেন তখনও রবীন্দ্রনাথের কাছে সংগঠনের অর্থ ছিল পাশ্চাত্য পদ্ধতিগুলির স্বাঙ্গী-করণ। তাছাড়া চাই জনসাধারণের সঙ্গে শিক্ষিতদের সেতুবন্ধন, কারণ তা না হ'লে বিদগ্ধতন্ত্র বহুনায়কতন্ত্র, অবিচারের সূত্রপাত হবে, জনসাধারণ স্বীকৃতির জন্য চীৎকার ক'রে উঠবে, ফলে সমাজের কাঠামো ভেঙে পড়বে, আসবে বিপ্লব। না, শক্তি নিশ্চয় অর্জন করতে হবে, কিন্তু শান্তির মধ্য দিয়ে। 'ইংরেজ আমাদের আত্মাভিমানে আঘাত করে। তার কারণ আমরা নিঃস্ব। আমরা যখন শক্ত হইব তখন তাহারা আমাদের ভাই বলিয়া সম্বোধন করিবে। ততদিন তাহারা আমাদের ঘৃণাই করিবে, ভাই বলিবেনা।' যার আছে তাকেই দেওয়া হবে। ভিক্ষার দ্বারা কিছুই মিলবে না শুধু আত্মাবমাননা আরও অতলে নামবে। ভারতবর্ষ যত-দিন দুর্বল থাকবে ততদিন তার অসম্মানের বোঝা বাড়বে। এই হ'ল মূল সুর—বর্তমান শতাব্দীতে আমরা এ সুর আরও অনেক শুনেছি : নানা রাষ্ট্রের, শ্রেণীর মহাদেশের সদ্য-জাগ্রত সামাজিক আত্মচেতনা এই সুরে ঘোষিত হয়েছে। যারা নিজেদের সম্মান করতে জানে তারাই অন্যের কাছে সম্মান পায়। অতএব আমাদের মুক্ত হ'তে হবে, আর কেউ আমাদের সাহায্য করবে না; বরঞ্চ যতই অন্যের সাহায্য পাব ততই আমাদের বন্ধনদশা র'য়ে যাবে। ইংরেজ বলে সে আমাদের ন্যায়নিষ্ঠা দিয়েছে। হ'তে পারে কিন্তু আমরা যা সবচেয়ে বেশি চাই, সব মানুষ যা চায়, সে হ'ল মনুষ্যত্ব। সেখানে 'ন্যায়' মিললে 'ক্ষুধার্তকে রুটির বদলে পাথর দেওয়ারই সামিল হয়। সে পাথর দামী হ'তে পারে, দুর্লভ হ'তে পারে কিন্তু ক্ষুধা মেটায়না।' সে ক্ষুধা মিটবেও না যতক্ষণ না আমরা জেগে উঠে নিজেদের ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলব। আন্তর্জাতিকতা খুবই মহৎ আদর্শ, কিন্তু সে আদর্শ সফল হয় শুধু

তখনই, যখন প্রত্যেকটি গ্রন্থি—অর্থাৎ প্রত্যেকটি জাতি—পরস্পরের টান রাখবার মতো শক্তি ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির মধ্যে একটি হ'ল, যে তিনি এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন। এতে তাঁর অনাবিল দৃষ্টি এবং জগৎ সম্বন্ধে সচেতনতারই প্রমাণ পাওয়া যায়, যা কবিদের মধ্যে দুর্লভ। এ কথা তিনি বুঝেছিলেন যখন হালকা আন্তর্জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হচ্ছিল। বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের প্রতিনিয়ত শুনতে হচ্ছিল যে তাদের সীমারেখা উচ্ছেদ করতে হবে, সংঘাত থেকে বিরত হতে হবে, নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে লুপ্ত ক'রে এক বিশ্বসমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। চরম আদর্শ হিসেবে এ কথা খুব ভালো, যে পৃথিবীতে সব জাতির একই মর্যাদা এবং শক্তি হবে। কিন্তু যতদিন অসাম্য থাকবে ততদিন এ কেবল দুর্বলের কাছে হিতোপদেশ। দুর্বলেরা যখন স্বীকৃতি চাইছে, হয়তো বেঁচে থাকবার প্রাথমিক অধিকারই চাইছে, তখন এ উপদেশ ছাগলের কাছে বাঘের সদুপদেশ দানেরই সামিল। ঐক্য কেবল সমানদের মধ্যেই হ'তে পারে, অন্ততঃ খুব বেশি অসমানদের মধ্যে হ'তে পারে না। নইলে মাৎস্যন্যায়। যারা বিশৃঙ্খল, দুর্বল, লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাদের আগে শক্তি দিতে হবে, শৃঙ্খলা দিতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, নিজেদের মধ্যে যে সামর্থ্য আছে তাকে বৃদ্ধি ও বিকাশের সুযোগ দিতে হবে, নিজের ভাষায়, নিজের মাটিতে। অন্যের স্মৃতির সাহায্য নিয়ে নয়, অন্যের কাছে ঋণ ক'রে নয়। জাতীয়তাবাদের এই কথাটিই চিরন্তন সত্য—আত্মশক্তি নির্ধারণের চেষ্টাই সবচেয়ে বড় চেষ্টা। জাতীয়তাকে শক্ত করলেই আন্তর্জাতিকতা সম্ভব। এর দুদিকে দুটি বড় বড় সংকট: একদিকে আন্তর্জাতিকতার মুখোশ পরা ক্ষুধিত নেকড়ের দল, মুখে তাদের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধতার কথা; অন্যদিকে ছাগশিশুর মত ভুক্ত হবার অসুস্থ ইচ্ছা, দ্বন্দ্ব সংঘাত ত্যাগ ক'রে বৃহত্তর ঐক্যের অংশ হবার ইচ্ছা, নিজেদের অস্তিত্ব, অতীত এবং মানবীয় দাবী ভুলে যাবার ইচ্ছা, দায়িত্বের বোঝা, স্বাধীনতার বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে দেবার ইচ্ছা। রবীন্দ্রনাথ এই দুয়ের মধ্যে সংকীর্ণ পথটি বেছে নিয়েছিলেন, কঠিন সত্যের পথ থেকে কখনো স্খলিত হন নি। অতীতের প্রতি মুগ্ধ আকর্ষণকে তিনি সমর্থন করেননি—তাকে তিনি 'অতীতের যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ ছাগশিশুর' সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং যারা এর সমর্থন করেছেন তাদের তিনি নিন্দা করেছেন—প্রতিক্রিয়াশীল বলে, প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপ তাঁরা জানেন না বলে। তিনি দেখিয়েছেন, যে এঁদের স্বাধীনতার জ্ঞানও বিলিতী এবং বিলেত থেকে ধার করা। বিশ্বনাগরিকতার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ইংরেজরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, ভারতবাসীদেরও তাই করতে হবে। ১৯১৭ সালে আবার তিনি 'প্রভুর পায়ে সব কিছু ত্যাগ করার' বিরুদ্ধে বলেছেন,—সে প্রভু ব্রাহ্মণই হোন আর সাহেবই হোন। অর্থাৎ তাঁর মতে ভারতবর্ষকে ইংরেজ-মুক্ত হ'তে হবে, কিন্তু ইংরেজের মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল, তাকে ছেড়ে দিলে চলবে না। তাতে হয়তো স্বদেশীরাই ভারতবর্ষের পিছনে ছুরি মারবে—তারা বোমার দলই হোক আর আপোষকামীরাই হোক। তিনি জানতেন যে এতে ফল হবে না। ভারতীয়েরা সংখ্যায় অনেক, ভারতবর্ষ বিপুল দেশ, কাজেই শান্তির পথেই লক্ষ্যে পৌঁছোনো যাবে। সবাই মিলে এগিয়ে যাওয়াই হ'চ্ছে আসল। এবং তাই হয়েছে।

আমি আগেই বলেছি যে এ ক্ষেত্রে অত্যুক্তির আশঙ্কা, চরমপথ অবলম্বন করার আশঙ্কা খুবই ছিল। হয়তো যাঁরা চরমপন্থী হন, ইতিহাসে তাঁদেরই নাম লেখা থাকে। প্লেটো এবং আরিস্টট্‌ল, খ্রীস্টকাহিনীর লেখকেরা, মাকিয়াভেল্লি, হব্‌স্, রুসো, কাণ্ট্, হেগেল্, মার্ক্স্ সবাই অত্যুক্তির পথ নিয়েছিলেন। একটা দেশকে বিপ্লবমন্ত্র দেওয়া সহজ, একটিমাত্র ব্যক্তি



বা একটিমাত্র দলের কাছে আর সব কিছুকে অধীন ক'রে তোলা সহজ। অতীতে ফিরে যাও, বিদেশী শয়তানের দিকে পিছন ফেরাও, শুধু নিজের শক্তিকে বিকশিত ক'রে তোলো—এ সব কথা বলা সহজ। ভারতবর্ষ এ সব কথা শুনেছেও। রবীন্দ্রনাথ এ সব কথা বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তাকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন, এবং তাকে মার্জিত ক'রে নিয়েছেন। আমার মনে হয় তাঁর সুদীর্ঘ এবং অসামান্য ফলপ্রসূ জীবনে তিনি সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজের চেয়ে আরও সৃষ্টিশীল সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল যা কিছু সুন্দর তাই সৃষ্টি করা, আর যা কিছু সত্য তাকে ব্যক্ত করা। এতে অনেক সংযম, অনেক ধৈর্য, অনেক তিতিক্ষার প্রয়োজন। সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি যা সত্য তাই বলেছেন, তাকে অতিমাত্রায় সরল ক'রে তোলেন নি। সেইজন্যই বোধ হয় সকলের কানে তাঁর কথা পৌঁছোয়নি। মার্কিন দার্শনিক সি,আই, লুইসের একটি কথা আমার কাছে অমূল্য ব'লে মনে হয়। তিনি বলেছেন, 'এ কথা আগে থাকতে মনে করবার কোনই কারণ নেই যে সত্যকে আবিষ্কার করলেই তা মনোরম হবে।' তা যদি নাও হয় তবু মনোরম কথা বলার চেয়ে সত্য বলা অনেক ভালো। আমি ধারণা করতে পারি, যে দেশের অতীত এত সমৃদ্ধ এবং যার ভবিষ্যৎ বোধহয় সমৃদ্ধতর, সে দেশ প্রকৃতির দুর্লভতম দান এক প্রতিভাধর কবির জন্য কেন এত গৌরব অনুভব করে। সে কবি সংকটের দিনে দেশবাসীকে তাঁর বাণী দিয়ে গেছেন। তারা হয়তো শুধু যুক্তিই চায়নি, অলৌকিক কিছুও চেয়েছিল। কিন্তু কবি অবিচলিত থেকে নিজে যা সত্য ব'লে বুঝেছেন শুধু তাই তাদের শুনিয়ে গেছেন।

অনুবাদ: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

# রবীন্দ্রনাথ

## লর্ড হেলসাম

আজ আমরা যে মহামানবের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি তিনি নিঃসন্দেহে মহৎ কবি। কিন্তু কেবল কবি বললে তাঁর পরিপূর্ণ পরিচয় হয় না, সব কবিই মানুষ হিসেবে মহৎ নয়, কিন্তু মহৎ মানুষ মাত্রই কবি। কারণ বস্তুজগতে, শব্দসম্ভারে বা মানবসম্পর্কে যেখানেই নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব, কবির কাব্য রচনার সঙ্গে তা সমধর্মী। বস্তুতঃ রচনা বা সৃষ্টির এই ক্ষমতাই প্রতিভার প্রকৃত এবং অভ্রান্ত লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রতিভাধর মহা-মানব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত অর্থেও তিনি কবি, শব্দ ব্যবহার করে তিনি কবিতা লিখেছেন, গান বেঁধেছেন এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত তাঁর স্বদেশবাসী সকলেরই কণ্ঠে সে কবিতা ও গান ধ্বনিত। মাতৃভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং যুগের আত্মাকে সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

এ কথা অবশ্য সত্য যে গীতাঞ্জলির ইংরিজি অনুবাদের জন্যেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু তবু আমার মনে হয় না যে কেবলমাত্র তাঁর কাব্য প্রতিভার ভিত্তিতেই লণ্ডনে তাঁর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন হয়েছে। কবিতার যথার্থ অনুবাদ সম্ভব নয় এবং আমার বিশ্বাস যে সকলেই স্বীকার করেন যে অনুবাদে তাঁর কাব্যরসের বিপুল হানি হয়েছে। অথচ তাঁর মাতৃভাষা বাঙলা। যে ভাষায় তিনি কাব্যরচনা করেছিলেন, এদেশে বিশেষ কেউ জানে না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চিন্তানায়ক। যে ভাষায় চিন্তাকে তিনি রূপদান করেছেন তার সৌন্দর্যের চেয়ে চিন্তার উৎকর্ষের জন্যই তিনি বৃটেনে বেশী সমাদৃত হবেন।

ব্যাপক এবং বিশিষ্ট দুই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। প্রেম, প্রকৃতি, দেশজদৃশ্য নিয়ে কবিতা তিনি প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু তাঁর কবিতার মূল সুর ধর্মাত্মক, এমন কি মিস্‌টিকও। গীতাঞ্জলি প্রধানতঃ হয়তো সম্পূর্ণভাবেই ভক্ত এবং ভগবানের প্রেমলীলার কাব্য। রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকালে তাঁর ধর্মবোধের কথা মনে রাখতেই হবে, তার প্রকৃতি নির্ণয়ও একান্ত প্রয়োজনীয়। যে ধর্মপ্রাণতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করত ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপে যে পরিমাণে তার দৈন্য দেখা দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর বোধ হয় সেই পরিমাণেই তাঁর খ্যাতির লাঘব হয়েছে।

ধর্মনিষ্ঠ হয়েও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবতাবাদী—সাধারণ ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে এইখানেই তাঁর তফাৎ। মানবতাবাদে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের মধ্যে অনেকেই জাতীয়তাবাদে বিরাগী। কিন্তু মানবতাবাদে বিশ্বাসী হয়েও তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। তাঁর কাছে স্বদেশপ্রীতি এবং মানবতাবাদ পরস্পর বিরোধিতা তো নয়ই, বরং একই দর্শনের, একই ধ্যানের অঙ্গীভূত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সভ্য মানবসমাজের সংস্কৃতি এবং দর্শন এক। এবং সত্যিকারের জাতীয় সংস্কৃতি ব'লে যদি কিছু থাকে তবে বিশ্বসংস্কৃতিরই অঙ্গ এবং প্রকাশ হিসাবেই তার সার্থকতা। বর্তমান যুগে এ বিশ্বাসের প্রয়োজন যত বেশি, আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আজ সে বিশ্বাস তত বেশি দুর্বল।

রবীন্দ্রসাহিত্যের নিগূঢ় অন্তর্লোকে রয়েছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘাতের



চেতনা। তাঁর যুগে এ সংঘাত সব চেয়ে বেশি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি বৃটেনকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতীক বলে ধরে নিয়েছিলেন, এবং প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাঙলা সংস্কৃতির মধ্যে তিনি প্রাচ্য সভ্যতার প্রকাশ দেখেছিলেন। এই দুই সভ্যতার সম্পর্কের চেতনা তাঁর সাহিত্যকে আজকের দিনেও আমাদের পক্ষে সমকালীন করে রেখেছে। এই দুই জগতেই তাঁর বিচরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে তিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দুই সভ্যতাকেই ভালবাসতেন, কিন্তু এককভাবে কোনটাই তাঁর মন ভরে নি। সেই অতৃপ্তির ফলেই তাঁর বিশাল সাহিত্য রচনা, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গল্প, বক্তৃতা, গানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এবং দেশদেশান্তরে ভ্রমণে তাঁর প্রতিভার অমিত উৎসার। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় বিদ্রোহের চার বছর পরে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার ছ বছর পূর্বে। সুতরাং ভারতবর্ষে বৃটিশ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসনের যে মেয়াদ, তার প্রায় সবটা জুড়েই তাঁর জীবৎকাল। মহাত্মা গান্ধী ছাড়া তিনিই প্রথমে বাংলা এবং পরে সর্ব ভারতের জাতীয় চেতনাকে প্রকাশ করেছেন, জাতির ভবিষ্যতকে নির্দিষ্ট করেছেন। বৃটেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আজ যে মৈত্রীর বন্ধন, রবীন্দ্রনাথের সাধনার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য জগতে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ লেখক বলেই খ্যাত এবং আমার মনে হয় লেখক হিসেবেই এদেশেও সকলে তাঁকে দীর্ঘকাল মমতার সঙ্গে স্মরণ করবে। বৃটেনে তিনি বহুবার নানা উপলক্ষ্যে এসেছেন। স্কুলের ছাত্র হিসেবে তিনি ইংলণ্ডে বাস করেছেন, সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করবার আগে আইনের ছাত্র হিসেবেও থেকেছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশে আবার এসেছিলেন এবং পর বৎসর বক্তৃতা দেবার জন্যে ফিরে আসেন। তিনি এদেশে শেষবারের মতন আসেন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। সেবার তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট-বক্তৃতা দেন এবং সেই বক্তৃতামালা পরে "মানুষের ধর্ম" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এদেশের বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, যেমন স্যার উইলিয়াম রোথেনস্টেইন এবং ডব্লু. বি. ইয়েটস। ইয়েটসই ইংরেজী গীতাঞ্জলির ভূমিকা লেখেন এবং গীতাঞ্জলিই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংকলনের প্রথম সুকৃত ইংরেজী অনুবাদ। এই কবিতা সংগ্রহই পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর প্রতিভাকে প্রথম উদ্ভাসিত করে।

আমি শুনেছি যে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। তিনি অসংখ্য গল্প লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তবু সারাজীবন তিনি মুখ্যতঃ কবিই ছিলেন। আমার বিশ্বাস তাঁর সবচেয়ে বড়ো সাহিত্যকীর্তি তাঁর কবিতা এবং নাটক, বিশেষতঃ তাদের মধ্য দিয়ে বাংলার জীবন এবং গ্রাম বাংলার উদ্বোধন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন নোবেল পুরস্কার দ্বারা পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁর প্রতিভার সমাদর করল, সারা এশিয়ায় তিনিই প্রথম এ স্বীকৃতি পান।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টিই ভাষার সৌন্দর্যে অনবদ্য। আমরা তার সৌন্দর্য আন্দাজ করতে পারি মাত্র, পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারি না—এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তবু মূল কবিতার অনুপম সৌন্দর্য অনুবাদেও ধরা পড়েছে। বিশেষ করে অন্যান্য লেখায় যেমন উপন্যাসে, বাংলার দিগন্তছোঁয়া নদীতে ভ্রমণের কাহিনীতে আমি শুনেছি, অনুবাদেও মূল রচনার মহত্ত্ব ও মাধুর্য বহুল পরিমাণে বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সেই স্বল্পসংখ্যক শিল্পীদের একজন যাঁরা শিল্পের বহু শাখায় পারদর্শী। তাই তাঁকে বলা হয়েছে ভারতীয় রেনেসাঁর দাভিঞ্চি। জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি ছবি

আঁকতে শুরু করলেন এবং শিল্পের অন্যান্য শাখায় যেমন এক্ষেত্রেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর ছবি আঁকলেন। তাঁর ছবির প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য প্রথম দৃষ্টিতেই নজরে পড়ে, ভারতীয় সনাতন শিল্পরীতির সঙ্গে বাহ্যত তার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বরঞ্চ তাঁর ছবি দেখে আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলার কথাই মনে আসে এবং তাই য়ুরোপীয় দর্শকদের কাছে তার আবেদন অনেক বেশি দ্রুত হবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে যাঁরা পারদর্শী, তাঁরা কিন্তু বলেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প যে নিগূঢ় অথচ নিশ্চিতভাবে ভারতীয় একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এসব ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সংগীতসাধকও ছিলেন এবং সেক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় অনুজ্জ্বল নয়। নিজের বহু কবিতা মিলিয়ে তিন হাজারেরও বেশি গানে তিনি সুর দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তাঁর কাব্যপ্রতিভার ওপরই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু দার্শনিক হিসেবেও তিনি প্রখ্যাত হয়েছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রে তাঁর উৎসাহ সমস্ত জীবনব্যাপী এবং অত্যন্ত গভীর। বেদান্ত দর্শনের মূলে উপনিষদের সূত্র কবিপ্রতিভার দ্বারা তিনি তাদের ব্যাখ্যা করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের নূতন করে প্রকাশিত করেছেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অদ্বৈত ঐক্য উপনিষদের বাণী। তিনি মনে প্রাণে সে বাণীকে গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে।
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে।

সংসার বর্জন করে ভগবান মেলে, এ মতবাদ রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর স্বয়ং কর্মী এবং তাঁর কর্মে আমাদের যোগ দিতে হবে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অবহেলা করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

ইংরাজি "গীতাঞ্জলি"র একটা কবিতায় তাঁর ভীষণ অনুভূতির পরিচয় মেলে—

এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ—

তাঁর জীবনদর্শন ছিল আবেগময় এবং মূলতঃ মানবীয়, নিরুত্তাপ বুদ্ধির কসরৎ তাঁর মনকে স্পর্শ করেনি। তাঁর মানবপ্রেম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি তাঁর এই ভালবাসার জন্যই বোধ হয় তিনি চিরকাল মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করতেন।

শান্তিনিকেতনে তিনি যে আদর্শকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তার উল্লেখ না করলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন সম্পূর্ণ হবে না। মধ্যজীবনে যেখানে তিনি ঘর বেঁধেছিলেন, সেখানে বিরাট তরুচ্ছায়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্ডিতব্যক্তি এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এখানেই প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণতির মতন ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির কেন্দ্র বিশ্বভারতী গড়ে উঠল। এ প্রচেষ্টায় তিনি অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছেন দুজন ইংরেজের কাছ থেকে, রেভারেণ্ড চার্লস্ এনড্রুজ এবং উইলিয়ম পিয়ারসন।



রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী, দুজনার সঙ্গেই তাঁরা কাজ করেছেন। দুজনেই তাঁদের ভালবেসেছিলেন। আজ তাঁদের কথাও আমাদের স্মরণ করা উচিত।

অন্য অনেকে আমার চেয়ে আরো ভালোভাবে শান্তিনিকেতনের আদর্শ সম্বন্ধে আপনাদের বলতে পারবেন। তাঁর বসন্তোৎসবের কথা, বিরাট গাছের ছায়ায় পাঠরত শিশুদের কথা, আজকের যান্ত্রিকতার হট্টগোল থেকে সরে অধ্যয়নরত পরিণতবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের কথা তাঁরা আপনাদের বলবেন। আমি শুধু বলব যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার অনেকগুলি শান্তিনিকেতনেই রচনা করেছিলেন, বাঙলার মাটিতে এমন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন যে, কোনকালে তার বিনাশ নেই।

রাজনীতির বাস্তব বিষয় নিয়ে আমার কারবার, আমার মতন রাজনৈতিকের মুখে এ প্রশস্তি বিচিত্র শোনাতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জাতীয় নেতা, সে কথা কি করে ভুলব? অবশ্য তিনি কোনদিনই প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক ছিলেন না এবং এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। এক অর্থে তিনি রাজনীতিকে অপছন্দই করতেন কিন্তু জাতির লক্ষ্য সাধনে রাজনীতির ভূমিকাকে তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। তাঁকে যে রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহে যোগ দিতে হয়েছিল এক অর্থে তা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাঁর মানসিক নির্মিতির বিরুদ্ধে তো বটেই। তাঁর লেখায় প্রায় সর্বত্রই জাতির পুনরুজ্জীবনের যে দীপ্ত পরিচয় মেলে, তাঁর নিজের রাজনৈতিক কার্যকলাপের চেয়ে সেই বাণীই স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। স্বাধীনতার প্রত্যেকটি সংগ্রামের জন্য, ইতিহাসের প্রত্যেক বিপ্লবের জন্যই কবির প্রয়োজন। তাঁর রচনায় সে যুগের আত্মা প্রকাশিত হয়, কবির বাণী সংঘাত ও বিপ্লবের পথে মশাল জেলে ধরে। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ উগ্র আবেগে রবীন্দ্রনাথ কখনই বিশ্বাসী ছিলেন না, এ ধরনের জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত বিপদ সম্বন্ধে তাঁর চেতনা ছিল প্রখর। যেখানেই তিনি উগ্রজাতীয়তার প্রকাশ দেখেছেন, মানবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে তার নিন্দা করেছেন। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ শান্তি এবং ঐক্যের মধ্যে বাস করবে, শান্তিময় এবং পূর্ণতর জীবনের জন্য তারা সাধনা করবে এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সাধন করতে হলে সকলকেই স্বাধীন হতে হবে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্জন করে নিজের জাতির এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর মধ্যে বহু বিষয়ে অমিল ছিল, কিন্তু দুজনেই একই স্বপ্ন দেখতেন, দুজনেরই লক্ষ্য একই ধরনের বলে এত পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার ছ'বছর আগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে যেদিন ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হল, তিনি যদি সেই দিনটি প্রত্যক্ষ করতে পারতেন তা হলে তাঁর শেষ জীবনের লেখায় যে হতাশার সুর, তা নিশ্চয়ই দূর হয়ে যেত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের রূপান্তরে, কমনওয়েলথ-এর আবির্ভাবে তিনি নিশ্চয়ই এ শতাব্দীর সবচেয়ে আনন্দজনক পরিণতি ব'লে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাতেন। বৃটেন এবং ভারতবর্ষের সম্পর্ক মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন নাটকীয়ভাবে পাল্টে যাবে, ১৯৪১ সালের যুদ্ধতিক্ত দিনে একজন অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে তা কল্পনা করা সহজ ছিল না। কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার ফলে বর্তমানে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে বন্ধুত্বের, সহযোগিতার

এবং পরস্পরকে বোঝবার সহস্র পথ খুলে গেছে, বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথ তাতে নিশ্চয়ই আনন্দিত হতেন।

কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার পর চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। ইংরেজ এবং ভারতবাসী এই নতুন পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। আমার মনে হয় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যজগতে বৃটেন এবং ভারতের মতো এমন সহমর্মী দুটি দেশ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ ঘটনা রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু যে অভিনন্দনই পেত তা নয়, তাঁর জীবন এবং সাধনাই প্রধানতঃ একে সম্ভব করেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা পৃথিবীতে খুব কমই আসে। তাঁর ধ্যানের জগৎ বাস্তবরূপ নেবার পূর্বেই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষির মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস, তাঁর প্রতিভা অনুগামীদের মনে সেই ধ্যানকে সঞ্চারিত করে এবং তারাই তাকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ চলে গেছেন, কিন্তু আমরা রয়েছি। তাঁর মহিমা, তাঁর স্মৃতিই আজ আমাদের সকলকে একই ক্ষেত্রে সমবেত করেছে। ভগবান এবং মানুষের প্রতি তাঁর প্রেমের উজ্জ্বল ঐশ্বর্য, মানবাত্মার বিশ্বজনীনতার প্রতি তাঁর আস্থাকে আগামীকালে বয়ে নিয়ে যাবার মতো সংকল্পের স্থিরতা এবং সৎ মনোবৃত্তি আমাদের আছে কিনা, ভবিষ্যতই তার বিচার করবে।

# রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার

## আঁদ্রে অস্টারলিং

১৯১৩ সাল। পৃথিবীতে তখনও শান্তি বজায় আছে। তাই যখন ভারতের মহান্ কবিকে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল, তখন অনেকের কাছেই এটা শুভ ইঙ্গিত বা আশ্বাস বলে মনে হয়েছিল। হাত বাড়িয়ে পশ্চিম যেন অভিনন্দন জানাল পূবকে। কবিও তাঁর ধন্যবাদ জানিয়ে তার-বার্তায় এই ভাবটি প্রকাশ করলেন যে গভীর মর্মজ্ঞতাই দূরকে নিকট আর পরকে ভাই করতে পেরেছে। ইংলেন্ডে তাঁর খ্যাতি তখনও পর্যন্ত খুবই অল্প দিনের। তবু রয়্যাল সোসাইটির সদস্য এক ইংরেজ লেখক টি. স্টার্জ মুর পুরস্কার-যোগ্যতার বিবেচনার জন্য তাঁর নাম দাখিল করেছিলেন।

নির্বাচনী-সমিতির বিবরণী থেকে প্রকাশ পায় যে সুইডিশ আকাডেমির কাছে এই প্রস্তাব চমক-জাগানো কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য একথা সত্য, যে কমিটির তদানীন্তন চেয়ারম্যান হ্যারল্ড হিয়ার্ন তাঁর নিজস্ব মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে চাননি। তবে এই রকম একটা মন্তব্য করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কতটুকু তাঁর ব্যক্তিগত সৃষ্টি আর কতখানিই বা ভারতীয় সাহিত্যের ক্লাসিকাল ঐতিহ্য থেকে পাওয়া, তা নির্ণয় করা কঠিন। তাই কমিটি প্রথমে আর একটি প্রস্তাবিত নাম সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে লাগলেন। ইনি হলেন এমিল ফাগুয়ে, ফরাসী সাহিত্যের ঐতিহাসিক এবং নীতিশাস্ত্রবিৎ।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের স্বপক্ষে আকাডেমির মধ্যে উৎসাহী সমর্থকেরও অভাব ছিল না। এঁদের মধ্যে একজন হলেন প্যার হলস্টম, যাঁর চমৎকার প্রবন্ধগুলি থেকে বোঝা যায় যে কবির সম্বন্ধে তাঁর নবজাগ্রত শ্রদ্ধা অন্তর্দৃষ্টিময় আলোচনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আকাডেমির মধ্যে এই বিতর্কের যে প্রীতিকর পরিণাম ঘটল, তার জন্য নিঃসংশয় বহুলাংশে দায়ী হল ভার্নার ভন হাইডেনস্টাম-লিখিত একটি রসজ্ঞ আলোচনা। ইনি নিজেই তিন বছর আগে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজি ভাষায় "গীতাঞ্জলি" নিবেদন করেন, তারই এক অপরিস্ফুট সুইডিশ-নরওয়েজিয়ন অনুবাদের মাধ্যমে "গীতাঞ্জলি"র আস্বাদ পেয়ে হাইডেনস্ট্যাম বলেছিলেন : 'এ কবিতাগুলি যখন আমি পড়ি, তখন আমার মন গভীর ভাবে আলোড়িত হয়েছিল। গত বিশ বছর বা তারও কিছু বেশি কালের মধ্যে এদের সমতুল্য কোনও গীতমর্ম 'লিরিক' পড়েছি বলে মনে হয় না। এদের প্রসাদে বহু আনন্দঘন মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি,—মনে হয়েছে যেন এক নূতন ঝরনার নির্মল জল পান করছি। তাঁর প্রতিটি উপলব্ধি ও চিন্তা-বিধৃত গভীর প্রেমময় ধর্মভাব, তাঁর পূত হৃদয়, তাঁর ভাষার স্বভাবসুন্দর মহান গাম্ভীর্য—সব মিলে এমন এক অখণ্ড রূপ সৃষ্টি করেছে যার গভীর অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের তুলনা বিরল। তাঁর রচনায় এমন কিছু পাওয়া যাবে না,—যা বিতর্কের সৃষ্টি করে বা আঘাত দেয়; যা তুচ্ছ, পার্থিব অথবা অহমিকা-স্পৃষ্ট। যদি কোনও কবির সম্পর্কে বলা যায় যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো তাঁর যোগ্যতা-গুণে আছে, তা হলে ইনিই সেই কবি.....এখন, শেষ পর্যন্ত যদি সেই জাতের প্রকৃত উচ্চ-মান আদর্শ কবির সাক্ষাৎ আমরা পেয়েই থাকি, তা হলে তাঁর

দাবি পাশ কাটিয়ে যাওয়া আমাদের উচিত কর্ম হবে না। বহু সংবাদপত্রে ঘোষিত হওয়ার পূর্বে একটি প্রতিভাময় নাম আবিষ্কার করার গৌরব আমাদের ভাগ্যে এই প্রথম জুটল, অনেক আগামী দিনেও এ সুযোগ হয় তো আর মিলবে না। আর তাই যদি যথার্থ প্রতিপন্ন করতে হয়, তা হলে আর ইতস্ততঃ করা চলে না। আবার এক বছর স্থগিত রেখে এই শুভ লগ্ন নষ্ট করা উচিত হবে না।'

আকাডেমি-সদস্যদের মধ্যে, খুব সম্ভব, মাত্র একজনই ছিলেন যিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য আদি ভাষায় পড়তে পারতেন। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, যখন আমি লন্‌ডন-এ সাহিত্য-বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করি, তখন বিখ্যাত কবির সুপণ্ডিত নাতি ইসেয়াস টেন্যার-এর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাই—রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ধারণা অর্জন করতে হলে সব চেয়ে ভালো উপায় কি, সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে। সরল বৃদ্ধ পণ্ডিত অমনি তাঁর লাইব্রেরী ঘরে মই লাগিয়ে ওপরের শেল্‌ফ থেকে বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ পেড়ে আনলেন। আমাকে বললেন যে, দু' তিন সপ্তাহ বইটা ভালো করে পড়লে, ঠাকুরের মাতৃ-ভাষায় তাঁর কাব্য বুঝতে পারবো! এখানে বলে রাখি, টেন্যার মোটেই তামাশা করে কথা কন নি।

যাই হোক, এর কয়েক বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত তাৎপর্যপূর্ণ রচনাগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে লাগল। আর সেই সঙ্গে নোবেল পুরস্কার যে যোগ্যপাত্রেই অর্পণ করা হয়েছে, এ ধারণা সর্বত্রই স্বীকৃতি পেতে লাগল। ভারতেও এই পুরস্কার-প্রাপ্তি সর্বসাধারণের সানন্দ সমর্থন লাভ করে এবং সেই থেকে ভারতীয়রা আগ্রহ-ভরে বরাবরই নির্বাচন বা মনোনয়ন সম্পর্কে তাঁদের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারের গুরুত্বকে অতিরঞ্জিত না করেও বোধ হয় সঙ্গতভাবেই বলতে পারি যে সেদিন বাহান্ন বছরের কবিকে সম্মানিত করে, সুইডেন তাঁর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছিল। তাই আমার মনে হয়, এই ক্ষুদ্র বিবরণীর কিছু কৌতূহল-মূল্য থাকতে পারে।

সকলেই বোধ হয় জানেন যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ সুইডেনে দু'বার এসেছিলেন। রেশমের মত দীর্ঘ কুঞ্চিতকেশ সেই অপূর্বগঠন শির আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মনে পড়ছে সেই মরমী দৃষ্টি—বিখ্যাত পর্যটক ও আবিষ্কারক স্বেন হেডিনের বাড়ীতে বসে সম্ভরণশীল হ্রদ লপ-নরের কাহিনী নিবিষ্ট মনে শুনছেন গৃহস্বামীর মুখ থেকে! রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই নিজের কথা তৃতীয় পুরুষে উল্লেখ করতেন : 'কবি বলেন...' তাঁর এই বাচনভঙ্গী কবিজনোচিত মূর্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করছে বলে আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-চরিতেই প্রকাশ যে একদিকে তাঁর সৃজনশীল রচনা আর অপর দিকে, একই সঙ্গে সংস্কারক-শিক্ষক হিসাবে, তাঁর কর্মজীবন। কর্মের মাঝে মাঝে ধ্যান-গম্ভীর বিরতি—এই দ্বৈত সত্তার যতদূর সম্ভব পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। অবশ্য ব্যাঘাত-জনিত চাঞ্চল্য তাঁর মানসকে যে একেবারে স্পর্শ করেনি তা নয়। তবে ওরই মধ্যে, গম্ভীর বহমান নদীর মতই তাঁর সত্তা ছিল প্রশান্তি-পূর্ণ। শ্রেষ্ঠ এই কবিপুরুষ উদারচরিত সাধকের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, সমকালীনদের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করে। এই নিরন্তর পরিভ্রমণ তাঁকে ভারতের অতুলনীয় অলংকার দূত হিসাবে চিহ্নিত করেছিল, যদিও ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তিনি দেখে যেতে পারেন নি।



তাঁকে 'ভারতের গয়টে' বলা হয়। উভয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য হচ্ছে, অন্ধ জাতীয়তা-বাদ এবং রাজনৈতিক বাদ-বিসংবাদ সম্পর্কে একটা বিশেষ মনোভাব। উভয়ের মধ্যেই দেখা যায় সৃজনশীল মানুষের তন্ময়ত্ব, নির্দলীয় মানুষের আত্মরক্ষায় মাথা তুলে দাঁড়াবার দাবি।

পারস্পরিক জ্ঞানের উদ্বোধনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ক্রমাগ্রসর মিলন বা সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্বয়—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাম্য আদর্শ। কিন্তু এই প্রচেষ্টাকে অন্যায়ভাবে আপোস বলে ভুল করা হয়েছিল। ভারতীয়দের মধ্যেও সমালোচকের অভাব ছিল না। তাঁদের বিবেচনায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বড় বেশি পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আর সেই কারণেই পশ্চিমের পাঠক-সাধারণের চিত্ত তিনি অত সহজে জয় করতে পেরেছিলেন। একজন ভারতীয় সমালোচক তো বলেই ফেলেছিলেন : 'বাংলা দেশ য়ুরোপকে রবীন্দ্রনাথ দেয় নি—বরং য়ুরোপই রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে বাংলা দেশকে।'

এ কথা সত্য যে প্রাচীন উপনিষদের দর্শন আর বহু যুগসঞ্চিত জ্ঞানরহস্যের ঐতিহ্য-পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রেরণা এখনও আমাদের অনুপ্রেরণা। কিন্তু য়ুরোপীয় পাঠক বুঝতে পারে যে তাঁর বাক্‌প্রতিমায় ভারতীয় পৌরাণিকতার প্রাচুর্য থাকলেও, কল্পনার বিচিত্র ঐশ্বর্য সত্ত্বেও তাঁর কাব্যাশিল্প অনেকাংশেই সহজ ও মুক্ত। তাঁর কবি-কৃতি বোঝবার জন্য অন্তরিত কোনও জটিল তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। তাঁর কাব্য যেন এক স্নিগ্ধশীতল ছায়াবীথি, অজানা পাখীদের কলগীতে মুখর। কিন্তু লতাগুল্মের ঘনবেষ্টন প্রবেশ-প্রার্থীদের বিমুখ করে না। কবি এক নিগূঢ় উচ্চ সত্যের সন্ধান দেন, তবে ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে সব কিছু আনন্দ বর্জন করে যোগাসনে বসে নয়।

ভারতের যে প্রান্তে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে প্রবাহিণী মাতৃসমা পদ্মা নিয়তই তাঁকে বিচিত্র দৃশ্যময় নানা প্রতীক চিত্র জুগিয়েছেন; তারা যেন দেবী ও লক্ষ্মীর পূজায় উৎসৃষ্ট ভেসে-যাওয়া দীপাবলি। বড় সুন্দর হয়ে তাঁর সঙ্গীত বেজে ওঠে, যখন দূর থেকে কর্ম-ক্রীড়া-রত নিখিলের ধ্যানে তিনি মগ্ন। তাঁর একটি কবিতার একটি লাইনে আছে—'জগৎ-পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।' আর দিনের শেষে, ফুল যেমন মুদে আসে, কবিও তেমনি সহজ ভাবে বিদায় নেন,—বলেন : এই আনন্দভোজে বীণা বাজানোর ভার ছিল আমার উপর। যা জানি ও পারি, তা করেছি। এখন প্রভু তোমাকে শুধাই—শেষ ক্ষণ কি এল এবার যখন ভিতরে এসে তোমার মুখ দেখতে পাবো, উজাড় করে ঢেলে দেবো নিভৃত প্রাণের নৈবেদ্য?

কিন্তু আজকের দিনে এই সুষমার, এই মোহের কতটুকু রেশ টিকে আছে? এ প্রশ্নের অকুণ্ঠ জবাব দেওয়া যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথও তাঁর যুগেরই মানুষ। ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের একাধিক নিকট ও সমকালীন কবির মতই তাঁরও অদৃষ্টে ঘটেছে বিপর্যয়,—যখন প্রথম জীবনের বহু মধুময় উজ্জ্বল সৃষ্টি এই লৌহযুগের নূতন ঝঞ্ঝায় ঝরে' খসে গিয়েছে! স্বপ্নদ্রষ্টার পূতশুভ্র পরিচ্ছদ এ যুগের ঝুল-কালি আর রক্তবর্ষণে মানায় না। তবে তাঁর সেই রোমাণ্টিক হিন্দুস্থানের দর্শন পেতে হলে গ্রীষ্মের দিনে সূর্যোদয়ের আগেই উঠতে হয়, ব্রাহ্ম মুহূর্তে—যখন সব কিছুই নূতন ও স্বতন্ত্র—যখন এক অজানা দৈব উপস্থিতির অদৃশ্য পদক্ষেপে ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু ঝলমলিয়ে ওঠে ...

# আধুনিক সাহিত্য

আলোচ্য বইটি রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত নানা বইয়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বই। এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে টেগোর কমেমোরেটিভ ভল্যুম সোসাইটির পক্ষ থেকে। এর একটু ইতিহাস আছে। দুই বছর আগে আমেরিকার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন' পণ্ডিত নেহরু ও ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে আলোচনা করে, সমসাময়িক সামাজিক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নানা প্রবন্ধ ও বক্তৃতা থেকে নির্বাচিত কয়েকটি বিশিষ্ট রচনার ইংরেজি অনুবাদ ভারতবর্ষ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচারের সিদ্ধান্ত করেন। তারই ফল এই বইটি।

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা হয় প্রথমত গীতাঞ্জলির কবি হিসাবে। ইংরেজি গীতাঞ্জলির পর রবীন্দ্রনাথের নাটক ও কবিতার অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় বহুল প্রচার হয়েছিল মূল ইংরেজিতে লেখা একাধিক গদ্য রচনার বই, যেমন *Sadhana, Personality, Nationalism, Creative Unity, The Religion of Man*. এই রচনাগুলির মধ্যে পরিচয় পাওয়া যায় যেমন ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যের তেমনি একটি বিরাট মননশীল মনের যা সমৃদ্ধ হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গমে অবগাহন করে। কবিকে দার্শনিক বলা যে খুব সঙ্গত নয় *The Philosophy of Rabindranath Tagore*-এর লেখক ডঃ রাধাকৃষ্ণন একথা স্বীকার করেছেন। তবু রবীন্দ্রদর্শন বলে একটি বহুল প্রচলন আছে এবং এই কথাটি একেবারে নিরর্থক নয়। কেননা দার্শনিক না হলেও কবিদেরও একটা জীবনদর্শন থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বলতে যা বোঝায় তা ঐ ইংরেজি বইগুলির মধ্যে যত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় তা বোধ হয় তাঁর বিরাট বাংলা রচনা-সাহিত্যেও পাওয়া যায় না। তার কারণ ইংরেজি রচনাগুলি তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনা এবং ঐগুলিতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তার সারমর্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের পুরো পরিচয় ইয়োরোপ, আমেরিকা এতদিন পায় নি কেননা *Nationalism* বাদে উল্লিখিত বইগুলিতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চিন্তাই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের *Nationalism* বইয়ের বক্তৃতাগুলি শুধু পাশ্চাত্ত্য দেশে নয় জাপানেও কিছু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল (এই বক্তৃতামালার শুরু হয় জাপানেই) কিন্তু সে আলোড়ন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এ যেন একটা অপলাপ মাত্র—আসল রবীন্দ্রনাথ হলেন (ইয়োরোপ আমেরিকার চোখে) কবি ও মিস্টিক, বোধ হয় কবির থেকে মিস্টিকই বেশি, কেননা "গীতাঞ্জলি" বাদে রবীন্দ্রনাথের আর কোনো কাব্যগ্রন্থ ইয়োরোপ আমেরিকাকে অভিভূত করে নি। তার কারণ ভাষান্তরে কবিতার চরিত্রবিকার ঘটতে বাধ্য। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাগুলি এত কাঁটছাঁট করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন যে মূল রচনার রস এই অনুবাদগুলিতে সামান্যই পাওয়া যায়। বিদেশী ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিও এই মিস্টিকের ছবিই আরও গাঢ় রঙে ফুটিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু বাংলার মাটিতে এই যে একটি বিরাট মানুষ বছরের পর বছর, দিনের পর দিন, অবগাহন করেছেন প্রবহমান কালস্রোতে, সাড়া দিয়েছেন সমসাময়িক জীবনের ঘটনার পর



ঘটনায়, গদ্যে ও পদ্যে, বক্তৃতামঞ্চে ও মাসিকপত্রের পাতায়—তাঁর কতটুকু পরিচয় ইয়োরোপ আমেরিকা এতদিন পেয়েছিল?

এই অপরিচয় মোচনের যে চেষ্টা আলোচ্য বইতে হয়েছে তার সার্থকতার প্রমাণ পাওয়া যায় *Times Literary Supplement*-এর Embattled Idealist শিরোনামায় সমালোচনা প্রসঙ্গে এই উক্তিতে—

This volume of Tagore's essays, published to commemorate the centenary of his birth, will administer a salutary shock to those who think of him as a Shelleyan lyric poet or a purveyor of vaguely mystical conceits. He emerges from these pages as a tough-minded and courageous man, an idealist certainly, but one with a clear conception of the practical application of his ideals to the world. If his poetry often errs through a lack of concreteness, the fault is not carried over into his social and political thinking. In these essays he is lucid, practical and passionately embattled against superstition and sentimentality.

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে ইংরেজ কবি শেলিও অবশ্য ছিলেন embattled idealist—ম্যাথু আর্নল্ড্ যাই বলুন না কেন।

বইটিতে রবীন্দ্রনাথের মোট আঠারোটি প্রবন্ধ বা বক্তৃতার ইংরেজি অনুবাদ সংকলিত হয়েছে, যথা : ১। শিক্ষার হেরফের (১৮৯২ সালে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ৩১ বছর বয়সে সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত); ২। স্বদেশী সমাজ (১৯০৪); ৩। শিক্ষা-সমস্যা (১৯০৬); ৪। ততঃ কিম (১৯০৬); ৫। সভাপতির অভিভাষণ (১৯০৮ সালে রাজসাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে পঠিত); ৬। পূর্ব ও পশ্চিম (১৯০৮); ৭। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১১); ৮। যাত্রার পূর্বপত্র (১৯১২ সালে ইয়োরোপ যাত্রার প্রাক্কালে শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদের কাছে লিখিত); ৯। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১৯১৭); ১০। *The Centre of Indian Culture* (ইংরেজিতে লেখা : ১৯১৯); ১১। শিক্ষার মিলন (১৯২১); ১২। সত্যের আহ্বান (১৯২১); ১৩। স্বরাজ সাধন (১৯২৫); ১৪। *A Poet's School* (ইংরেজি রচনা : ১৯২৬); ১৫। পল্লী-প্রকৃতি (১৯২৮); ১৬। সমবায়. (১৯২৯)। ১৭। কালান্তর (১৯৩৩); ১৮। সভ্যতার সংকট (১৯৪১)।

এর চাইতেও ভালো সংকলন হতে পারত কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয় মতভেদ ঘটতে পারে। কোনো বড় লেখকের সমগ্র রচনাবলী থেকে এমন কোনো সংকলন বাছাই করা যায় কি যা সকলের মনঃপূত হবে? আলোচ্য সংকলনটি তৈরি করতে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। প্রথমত বাছাই করা হয়েছিল ত্রিশটি প্রবন্ধ ও এই বাছাই করার ভার দেওয়া হয়েছিল এমন ছত্রিশজন ব্যক্তির ওপর রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের অন্তরঙ্গ ও গভীর পরিচয় সর্বজন-স্বীকৃত, যেমন : প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, পুলিন-বিহারী সেন, কাজি আবদুল ওদুদ, অমল হোম, নীহাররঞ্জন রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, বুদ্ধদেব বসু, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, এঁরা যে ত্রিশটি প্রবন্ধ বাছাই করেছিলেন তার ইংরেজি অনুবাদ ভারতবর্ষ ব্রিটেন ও আমেরিকার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়ে তাঁদের যুক্তি অনুসারে এই

প্রবন্ধগুলি থেকে বইটির আঠারোটি প্রবন্ধ নির্বাচন করা হয়। এ ছাড়া আর কি উপায় ছিল জানি না।

*Times Literary Supplement*-এর মতে বইটির নামকরণও সার্থক হয়েছে কেননা, Whether he is writing about the theory of education, local political questions, world issues, economics, poetry, religion or whether he is describing the fundamentals of an endemic Indian culture or lecturing his compatriots out of their inertia, his thought begins with and continually refers back to his ideal of 'Universal Man' and a world society established by intelligence and maintained by tolerance.

রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনাতেও বিশ্বমানবের ধ্যান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। ষোলো বৎসর বয়সে লেখা "কবি-কাহিনী" থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

হিমাদ্রি, মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপশিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে,
তবে বল কবে গিরি, হবে সেই দিন
যে দিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ!
সে দিন আসিবে গিরি, এখনই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবন্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।

কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, বিশেষভাবে তাঁর কাব্য, পুষ্ট হয়েছে বাংলার মাটির রসে। এই বইটির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবির এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে জমিদারির কাজ তদারক করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে যখন পদ্মার ধারে বাস করতে হয়েছিল তখন তিনি secured entry into a world unknown to the majority of the new educated class and struck roots in some of the deepest levels of the collective consciousness of the people. এইভাবে শুরু হল বাঙালির মননে নতুন এক অধ্যায়। বাংলাদেশকে বাঙালি নতুন করে দেখল রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে। ভাষান্তরিত রবীন্দ্রকাব্যে বাংলার মাটির সৌরভ উবে গিয়েছে বলে *Times Literary Supplement*-এর সমালোচক তাতে concreteness অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশের ও বাঙালির সমস্যা রবীন্দ্রনাথের মনকে কী ভাবে পঞ্চাশ বছর ধরে ক্রমাগত নাড়া দিয়েছে তার পরিচয় আলোচ্য প্রবন্ধগুলিতে বারবার পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে কবির সাহেব তাঁর মূল্যবান ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন যে কোনো কোনো সমালোচক অভিযোগ করেছেন যে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল ভারত-



বর্ষ ততটা নয় যতটা বাংলাদেশ আর তাঁর মনের টান ছিল বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর। এই অভিযোগের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে—

"বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়ো রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্যসাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।' সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

"আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনই প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনই নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনই আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজনসাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।"

কবির সাহেব তাঁর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের এই কথারই সারমর্ম ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের বিচিত্র ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কতটা অন্তরঙ্গ ছিল তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শতাব্দীবাহিত ভারতীয় সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে।

আজকাল কারও কারও মুখে শোনা যায় সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতবাসীর ধ্যান হওয়া উচিত—আগে ভারতবাসী তারপর বাঙালি, গুজরাটি, মারাঠি ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের বাণী এই আদর্শের প্রতিবাদ। নিবিড়ভাবে বাঙালি ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষের মহত্তম প্রতিনিধি হতে পেরেছিলেন আর এই বাঙালিত্বের মধ্যে দিয়েই তাঁর ধ্যানে সত্য হয়ে উঠেছিল বিশ্বমানবের আদর্শ।

পদ্মার বক্ষে নৌকোয় দিনের পর দিন একলা থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে দেখেছিলেন দুলোকের শিল্পী প্রহরের পর প্রহর নদীর স্রোতে রচনা করছেন আলোছায়ার আলপনা তেমনি দেখেছিলেন বাংলার গ্রামবাসীদের অবর্ণনীয় জলকষ্ট। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের জন্ম হয়েছিল এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে। জীবনের প্রান্তে এসে আবার যৌবনের এই অভিজ্ঞতার স্মৃতি হল 'সভ্যতার সংকট'-এর প্রেরণা। দু'শ বছরের ব্রিটিশ

শাসনের পর দেশে অর্থাৎ যে বাংলা দেশকে তিনি অন্তরঙ্গভাবে জানতেন সেই দেশে জলের অভাব ও শিক্ষার অভাব তাঁকে কী রকম বিচলিত করেছিল সেই সময়ে যাঁরা কবির কাছাকাছি ছিলেন তাঁরা জানেন। তবু শেষ পর্যন্ত তিনি ঘোষণা করলেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেলেন সমগ্র বিশ্বকে তাঁর চরম দান হিসেবে।

রবীন্দ্রনাথের সামাজিক বা রাষ্ট্রিক চিন্তায় কোথাও যে কোনো ত্রুটি নেই সে কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না; তাঁর চিন্তার ধারা রাষ্ট্রতত্ত্বের বা সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞান-নির্দিষ্ট প্রণালীতে সব সময়ে হয়তো প্রবাহিত হয়নি। কিন্তু এ হল নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের উন্মুখ সতেজ মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায়। এই পরিচয় স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত হয়েছে *Towards Universal Man* বইতে।

শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবিরের ভূমিকা এই বইটির উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। কবির সাহেব কোথাও কোথাও হয়তো এমন কথা বলেছেন যা সকলে মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি ও সব দিক দিয়ে বিচার করে এমন কথা আজ পর্যন্ত কে বলেছেন যা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ছে? রবীন্দ্রনাথের কীর্তি বিরাট ও বিচিত্র বলেই তা সম্ভব নয়।*

**হিরণকুমার সান্যাল**

*Towards Universal Man *By* Rabindranath Tagore. Asia Publishing House, Bombay. Rs. 12.50.

## সমালোচনা

---

**বিচিত্রা**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, কলিকাতা ৭। মূল্য ছয় টাকা।

রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী এই সঙ্কলন গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। যে কোনো সঙ্কলনগ্রন্থ নিয়ে খুঁতখুঁত করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়, বিশেষত যখন রবীন্দ্রনাথের মতো লেখকের রচনা নিয়ে সে-গ্রন্থ সঙ্কলিত। বিশ্বভারতীর উদ্যোক্তারা এই দুরূহ দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত, রবীন্দ্র-সাহিত্যের জনকয়েক সুপরিচিত সুধীর সহযোগিতায় ও সুযোগ্য সম্পাদকের বিচার বুদ্ধিতে এই দুরূহ কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। এই সঙ্কলন গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা' সাধিত হয়েছে, অর্থাৎ এ-গ্রন্থে বিশাল রবীন্দ্রবর্ষের কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থের তিনটি প্রধান অংশে ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে। প্রবন্ধ অংশে ৩১৮ পৃষ্ঠা, আখ্যান অংশে (অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, গদ্যনাট্য, কাব্যনাট্য) ৪৫২ পৃষ্ঠা, কবিতা অংশে ২৩৫ পৃষ্ঠা। নেহাৎ পাটোয়ারি বিচারেও এ-গ্রন্থের ক্রেতা সামান্য অর্থব্যয়ের বিনিময়ে অনেকগুণ বেশি দামের জিনিস পাবেন। কতকগুলি ছোটোগল্প ছাড়া এখানে আছে গোটা একটি উপন্যাস "চতুরঙ্গ", চার চারটে নাটক, "লক্ষ্মীর পরীক্ষা," "বিসর্জন", "ডাকঘর", "মুক্তধারা"। এমন কবিতা ও গান সঙ্কলিত হয়েছে যাদের সৌন্দর্য সর্বজন স্বীকৃত। আমার নিজ বিচারে এ-সঙ্কলনের প্রবন্ধ অংশ সবচেয়ে মূল্যবান, এ-অংশে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র সমাবেশিত হয়েছে যা সচরাচর সাধারণ পাঠকের হাতের কাছে থাকে না। দুরূহ কাজে নিযুক্ত হয়ে সঙ্কলন কর্তা সংবেদনশীল বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

এ-গ্রন্থের সঙ্কলিত রচনাগুলি সম্বন্ধে সম্বিচারী আলোচনার অবকাশ রিভিউ-প্রবন্ধে নেই কেননা এ-রচনাগুলির আলোচনা মানে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা, তেমন আলোচনার স্থান প্রবন্ধে তো নয়ই, বৃহদায়তন পুস্তকে যদি-বা আছে (তেমন পুস্তক অবশ্য বাঙলা ও অন্য ভাষায় এখনো আছে), আমার সংশয় রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সর্বত্রগামী প্রতিভা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করার জন্য—সে-প্রতিভার দিকে নির্দেশ বহন করেছে বর্তমান সঙ্কলন গ্রন্থের সার্থক নামকরণ—সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচারের, রবীন্দ্র-প্রতিভার সমঞ্জস রূপচিন্তনের সময় এসেছে কি? কত যে বিচিত্র এই প্রতিভা তার কিছু গৌণ প্রমাণ পাওয়া যায় এই শতবর্ষপূর্তি বৎসরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে-অসংখ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে সেদিকে নজর করলে। সমগ্রভাবে মূল্যায়নের জন্য চাই প্রমাণ-নিষ্ঠ তথ্যানুগ সমানুভূতিসম্পন্ন সহৃদয় আলোচনা, কিন্তু তেমন আলোচনা এখন সম্ভব কি? আমার বিচারে সম্ভব নয়, কেন সম্ভব নয় তা'র কয়েকটি কারণ পেশ করি।

১। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এখনো সাধারণ পাঠকের অধিগম্য কিনা সন্দেহ। অনেক চিঠিপত্র এখনো প্রকাশিত হয়নি, এখনো সহসা কোনো সাময়িকী পত্রে অপ্রকাশিত-পূর্ব রচনা প্রকাশিত হচ্ছে।

২। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত হয়নি, হয়তো কেউ এ কার্যের অধিকারী আছেন

কিন্তু এখন অবধি সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী লোক সমক্ষে নেই। আমি গ্রন্থতালিকার কথা ভাবছি না, ভাবছি আধুনিক গ্রন্থবিজ্ঞানসম্মত পঞ্জীর কথা, যেমন পঞ্জী (পরিতাপের বিষয়) আমাদের সাহিত্যে আদৌ নেই, বিব্লিঅগ্রাফি কথাটির বড়ই অপব্যবহার শুনতে পাই চারদিকে, অথচ সুসম্বন্ধ গ্রন্থপঞ্জী বিদেশী ভাষায় প্রচুর। ইংরেজ গ্রন্থপঞ্জীবিৎ টি. জে. ওয়াইজ-এর অ্যাশ্‌লে লাইব্রেরী ক্যাটালগ ব্যবহার করলে (যদিও ওয়াইজ মহোদয়ের সততা সম্বন্ধে কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে) শুধু পঞ্জীপ্রমাণে সমালোচকের প্রভূত উপকার হয়। পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে, গ্রন্থের বহিরঙ্গ সম্বন্ধে, প্রতিটি তথ্য, গ্রন্থের বিবিধ সংস্করণ সম্বন্ধে তথ্য ইত্যাদি কত না তথ্য বিব্লিঅগ্রাফি শাস্ত্রের কল্যাণে আধুনিক সমালোচকের সাধ্যায়ত্ত। রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্যক আলোচনার পূর্বে এ সমস্ত তথ্যের পরিবেশন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

এসব তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য এক শ্রেণীর তথ্যও আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কোনো একখানা বইয়ের কথা চিন্তা করুন, ধরা যাক, "সোনার তরী"। প্রত্যেকটি কবিতার জন্মবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার; যত তথ্য প্রমাণ আমাদের আয়ত্তে আছে তার সাহায্যে এ-বৃত্তান্ত রচিত হবে। কবে, কেন, কোথায়, কোন আত্মিক ও সাংসারিক পরিবেশে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল, কোথায় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রকাশের পরে সমকালীন পাঠকজগতে প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল? কবিতাগুলির After-history কী? শেক্‌স্‌পীয়রের রচনাবলী সম্বন্ধে এহেন বিস্তীর্ণ তথ্য আমাদের আয়ত্তে আছে। রবীন্দ্ররচনা সম্বন্ধে ঠিক ততটা বিস্তীর্ণ তথ্য সমাবেশ যদিও বা এখনই সম্ভব না হয়, কিছুটা শাদামাটা হিসাবে হওয়া আদৌ দুরূহ নয়।

৩। গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্গে চিত্রপঞ্জী প্রস্তুত হওয়া একান্ত দরকার। এই দুখানা পঞ্জী ও রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত জীবনকাহিনী আমাদের হাতের কাছে থাকলে হয়তো কোনো কোনো সাম্প্রতিক সমালোচনার শিথিল দায়িত্ব অনুমান-সর্বস্বতার দৌরাত্ম্য থেকে আমরা রেহাই পেতাম। তার চেয়েও বড়ো কথা, চিত্রশিল্প ও সাহিত্যশিল্প দুইয়ের তুলনায় উভয় শিল্প সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান ও উপভোগ উজ্জ্বলতর হ'ত, আমরা আরো ভালো বুঝতে পারতাম এক শিল্পে অভূতপূর্ব পারঙ্গমতায় সমৃদ্ধ হয়েও কোন তীব্র সৃজনী প্রেরণায় তিনি অনভ্যস্ত অন্য শিল্পকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন, চিত্রশিল্পের একান্ত শৈল্পিক রূপে তিনি এমন কোনো সুযোগ পেয়েছিলেন কি যা সাহিত্যশিল্পে পাওয়া সম্ভব নয়?

৪। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর কথা ছেড়ে দিয়েও শুধু কবিতাগুলির ও কোনো ভেয়ারিঅরাম্ সংস্করণ আমাদের সম্মুখে নেই। অথচ ইয়েট্‌সের কবিতার প্রামাণ্য ভেয়ারিঅরাম্ সংস্করণ কবেই বেরিয়ে গেছে যদিও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র দু'বছর আগে তাঁরও মৃত্যু হয়েছিল। নিষ্ঠাবান সমালোচকের পক্ষে এহেন সংস্করণ অতীব মূল্যবান। কবির যে কোনো কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় যদি প্রবৃত্ত হই, তখন যদি কবিতাটির পাণ্ডুলিপি আমাদের সামনে থাকে আর সেই সঙ্গে থাকে প্রথম প্রকাশ থেকে কবির জীবৎকাল অবধি প্রকাশিত সব কয়টি সংস্করণের পাঠান্তর, তা হলে সেগুলির তুলনায় মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব। বিদেশী সাহিত্যের সমালোচনায় এই পদ্ধতির অনেক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কীট্‌সের 'ওড্ টু নাইটিঙ্গেল্' কবিতার পাণ্ডুলিপি বিচারে অধ্যাপক রিড্‌লে প্রমাণ করেছেন যে এ কবিতার পাঠান্তরে শুধু দু'চারিটি শব্দপ্রয়োগের তারতম্যই হয়নি, কবির চিন্তারও বিবর্তন হয়েছে, কাব্যবস্তু অনেকটা বদলে গেছে। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডু-



লিপিতেও কি এহেন প্রগাঢ় বিবর্তনের নিদর্শন পাওয়া যাবে? "সঞ্চয়িতা"য় ও অন্যান্য কোনো কোনো গ্রন্থে যে কয়েকটি ফটোস্টাট দেখতে পাই সেগুলির নির্ভরে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিগুলিতে অনেক মূল্যবান চিন্তাসংযোগের আকর বিদ্যমান। পাণ্ডুলিপি অবশ্য সাধারণ পাঠকের অধিগম্য নয়, তার জন্য থাকবে ভেয়ারিঅরাম্ সংস্করণ। কিন্তু শুধু পাণ্ডুলিপি নয়, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ও রূপান্তর লক্ষ্য করতে পারলেও আমাদের সমালোচনা শক্তিমান হতে পারে। "বিচিত্রা"-গ্রন্থে দেখতে পাচ্ছি একাধিক আকরগ্রন্থের ব্যবহার হয়েছে। সূচীপত্রের নির্দেশ থেকে জানতে পাই যে কোনো ক্ষেত্রে ১৩৪০ সালের "সঞ্চয়িতা"র পাঠগ্রহণ করা হয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণ "চয়নিকা"র পাঠ, কোনো ক্ষেত্রে চতুর্থ সংস্করণ "চয়নিকা"র পাঠ। বর্তমান সম্পাদক কোন্ যুক্তিতে বিভিন্ন পাঠ গ্রহণ করেছেন তা জানাননি, আমার অনুমান যে মূলতঃ সংক্ষেপীকৃত পাঠ ছিল তাঁর লক্ষ্য, কিন্তু বর্তমান সম্পাদনার যুক্তি ও প্রণালী আমার আলোচ্য নয়। আমার প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ নিজেই কেন বিভিন্ন সংস্করণে বিভিন্ন পাঠ প্রবর্তিত করেছিলেন? এ সব পাঠান্তরের পটভূমিতে কোনো শৈল্পিক উদ্দেশ্য বা শৈল্পিক মূল্য উপস্থিত ছিল কি? আমার কথাটি পরিষ্কার করার জন্য ইয়েট্‌সের একটি কবিতা লক্ষ্য করছি। কবিতাটির নাম The Sorrow of Love, এটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল *The Rose* নামক কাব্যগ্রন্থে ১৮৯৩ সালে। নিচে কবিতাটির প্রথম পাঠ ও পরবর্তী পাঠ দুই দিলাম, বাঁদিকের ছত্রগুলিতে প্রথম পাঠ ডান দিকেরগুলিতে শেষের পাঠ।

প্রথম পাঠ : The quarrel of the sparrows in the eaves,
The brawling of a sparrow in the eaves.

দ্বিতীয় পাঠ : The brilliant moon and all the milky sky,
The brilliant moon and all the milky sky,
And all that famous harmony of leaves,
And all that famous harmony of leaves.
Had blotted out man's image and his cry.

And then you came with those red mournful lips,
A girl arose that had red mournful lips
And with you came the whole of the world's tears,
And seemed the greatness of the world in tears,
And all the trouble of her labouring ships
Doomed like Odysseus and the labouring ships
And all the trouble of her myriad years.
And proud as Priam murdered with his peers.

Arose, and on the instant clamourous eaves,
Arose, and on the instant clamourous eaves,

A curd-pale moon upon an empty sky,
A climbing moon upon an empty sky,
And all that lamentation of the leaves,
And all that lamentation of the leaves
Are shaken with earth's ald and weary cry.
Cloud but compose man's image and his cry.

পাঠ দুইটির অন্তর্বর্তী কালে ইয়েট্সের কাব্যচিন্তায় প্রগাঢ় পরিবর্তন ঘটেছিল, সে পরিবর্তনের ছাপ শেষ পাঠান্তরে। প্রথম পাঠে যেখানে যা কিছু ছিল কাব্যিক, নমনীয়, মৃদু, সে সব বর্জন করে কবি এখন ইস্পাত-কঠিন সংহতির প্রয়াসী। প্রথম ছত্রের quarrel বদলে brawling লেখা হয়েছে, নতুন শব্দটিতে রূঢ়তার আমদানী হয়েছে। কবি এখন কর্কশ পৌরুষের অভিলাষী। দশম ছত্রে ছিল curd-pale moon, কাব্যিকতার চেষ্টায় ক্লান্ত, তার বদলে এসেছে climbing—ঋজু আবেদনসম্পন্ন কথা। শেষ ছত্রের earth's old and weary cry, রোমান্টিক কল্পনা বিলাসে বিলম্বিত স্বরবর্ণের ধূসর গোধূলির দিকে হাত বাড়িয়েছে, কিন্তু man's image and his cry ভাব সংহত এবং প্রত্যক্ষী ইশারার সন্ধানী। প্রথম পাঠের সমস্ত আবছায়া উল্লেখ ছেঁটে ফেলে বাকপ্রতিমাগুলিকে এখন প্রত্যক্ষ, সাবয়ব করা হয়েছে, এখন 'তুমি'র বদলে বিশেষ একটি কন্যার উল্লেখ হয়েছে, অডিসিয়ুস্ ও প্রিয়ামের উল্লেখে ট্রয়ের সংগ্রাম সুনির্দিষ্ট হয়েছে। প্রথম পাঠটিতে ইয়েট্স্-কাব্যের তরুণ রূপ, দ্বিতীয়টিতে পরিণত রূপ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও কি এহেন পরিমার্জনা হয়েছিল পাঠ থেকে পাঠান্তরে, এমন পরিমার্জনা যাতে তাঁর কাব্যকারুর বিবর্তনের ইতিহাস বিধৃত? পরিশ্রমী পাঠক অবশ্য এখনো সমস্ত সংস্করণ সামনে রেখে তুলনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন কিন্তু প্রামাণ্য ভেয়ারিঅরম্ সংস্করণ প্রস্তুত হলে ভবিষ্যতে অনেক অনর্থক পরিশ্রমের লাঘব হবে।

৫। সবচেয়ে বেশি দরকার রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী। একথা বলার সময় আমি অশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মূল্যবান জীবনীর কথা বিস্মৃত হইনি কিন্তু স্যর এড্মণ্ড্ চেম্বার্স যে ধরনের শেক্স্পীয়র-জীবনী রচনা করেছেন, সে ধরনের সর্বগ্রাহী অনুরাগে রবীন্দ্রনাথের জীবনের যাবতীয় ঘটনা লিপিবদ্ধ ও পঞ্জীকৃত হওয়া দরকার। আমার কল্পিত এই জীবনীতে শুধুই সাহিত্যিক ঘটনা স্থান পাবে না, রবীন্দ্রনাথের সহস্রমুখী প্রতিভা থেকে উৎসারিত প্রতিটি কর্মের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রমাণ নির্ভরে লিপিবদ্ধ থাকবে রবীন্দ্রনাথ কবে কোন্ রচনায় কোন্ চিত্রকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সে সব কর্ম কবে সাঙ্গ হল; কোন্ কোন্ বই তিনি পড়েছেন, কাদের সঙ্গে মিলেছেন। এ গ্রন্থে থাকবে তাঁর অন্যান্য সব কর্মের বিবরণ—ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈল্পিক, ব্যবহারিক জীবনের অসংখ্য ঘটনাবলী। সার্থকনামা "বিচিত্রা" গ্রন্থে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈচিত্র্য ও বিশালতার দিকে ইশারা আছে, যে-বিচিত্রের সন্ধানী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সারাজীবন : 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে/তুমি বিচিত্ররূপিণী।' বিচিত্র প্রতিভার প্রতিটি দিক আলোচনা করার কালে অন্য প্রতিটি দিক সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, একটি দিক নিয়ে যিনি বই বা প্রবন্ধ লিখবেন তাঁর বইয়ে বা প্রবন্ধে অন্য দিকগুলির সংযোগ সূত্র নির্দিষ্ট হবে, তবেই না রবীন্দ্রপ্রতিভার যোগ্য আলোচনা হবে। আজ এই মুহূর্তে অনেক ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আছেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানতেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে



এঁদের নিজেদের ধারণা থাকার দরুণ যে-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে এঁরা রবীন্দ্রনাথের কর্ম সম্বন্ধে যত সহজে আলোচনা করতে পারেন, ভবিষ্যতের পাঠক সাক্ষাৎ পরিচয়ের সেই অমূল্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন, তাঁদের জন্য (কেননা তাঁদের অনুরাগেই রবীন্দ্রনাথ চিরজীবী থাকবেন) এ যুগের বাঙালীর কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত যাবতীয় আকর তথ্য সংগ্রহ করা, লিপিবদ্ধ করা।

সাধারণ বিচারে এসব কাজ হয়তো খুব উদ্দীপনাময় নয়। এসব কাজ অধ্যবসায়ী গবেষকের কাজ। কেউ বা হয়তো এ কাজকে আর্কেঅলজিক্যাল আলোচনা বলে তুচ্ছ করবেন, কিন্তু আর্কেঅলজি তুচ্ছ নয় আর নিষ্ঠাবান সাহিত্য সমালোচনার গোড়ার কথা, তথ্য সংগ্রহ, অন্য অধিকাংশ সমালোচনায় পল্লবগ্রাহিতা মাত্র। টি. এস. এলিয়ট বলেছেন : Any book, any essay, any note in *Notes and Queries* which produces a fact even of the lowest order about a work of art is a better piece of work than nine-tenths of the most pretentious critical journalism. তথ্য সংগ্রহের এই শ্রমসাধ্য কার্য কর্মীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন চিত্তের পরিচায়ক, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা এই তথ্যপঞ্জীর নির্ভরে রবীন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের অপার বৈচিত্র্য পাঠকের কাছে সুষ্ঠুরকমে প্রতিভাত হবে।

"বিচিত্রা" গ্রন্থের সমালোচনা লিখতে গিয়ে এসব কথা যেন ধান ভানতে শিবের গীত। কিন্তু শিবেরই গীত।

**অমলেন্দু বসু**

Thirty-seven Paintings of Rabindranath Tagore. Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs, Govt. of India, New Delhi.
Drawings and Paintings of Rabindranath Tagore, Lalit Kala Academi, New Delhi. Rs. 25.00.
Twelve Paintings by Rabindranath Tagore, Tata Iron and Steel Company, Calcutta. Rs. 8.00.

সার্থক লেখক, এমন কি মহৎ কবিরা কেউ কেউ সার্থক ছবি এঁকেছেন, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। নিজেদের আত্মপ্রকাশের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটেন তাঁদের শুধু কাব্য বা নাটক, গল্প বা উপন্যাস রচনা করে; তার তাড়নায় কখনও কখনও তাঁরা নক্সা কেটেছেন, ছবি এঁকেছেন, তক্ষণ কর্ম করেছেন, কখনও লীলাচ্ছলে, শুধু চিত্ত-বিনোদনের জন্যে, কখনও সৃষ্টিপ্রেরণার অনিবার্যতায় এবং সেই হেতু গভীর নিষ্ঠায় ও অভিনিবেশে। এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। বহুকালের অভ্যাসে প্রকাশের মাধ্যম অনুযায়ী শিল্পের নামকরণ একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে; ধ্বনির মাধ্যমে যিনি নিজকে প্রকাশ করেন, তাঁকে আমরা বলি গায়ক, শব্দ ও বাক্য নিয়ে যাঁর প্রকাশ তাকে বলি কবি বা সাহিত্যিক, রঙ ও রেখার মাধ্যম যাঁর তিনি চিত্রী। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বড় জটিল; তাঁর একই ব্যক্তিসত্তায় গায়ক, কবি, চিত্রী সকলেই বিরাজমান সূক্ষ্ম অথচ বিচিত্র প্রমাণ-

পারিপাট্যে। সার্থক কবি ও লেখকরা সার্থক ছবি এঁকেছেন এমন প্রমাণ যেমন আছে তেমনই সার্থক চিত্রী বা ভাস্কর বা গায়ক সার্থক সাহিত্য রচনা করেছেন সে-প্রমাণও আছে। রিচার্ড হুগনার তাঁর অপেরাগুলোর জন্যে যে অগুণতি স্কেচ করেছিলেন, শিল্পের ক্ষেত্রে তার মূল্য ও মর্যাদা তুচ্ছ করবার মত নয়। তবু, কবি ও লেখকদের ছবি আঁকার প্রমাণ যত বেশি, চিত্রী বা গায়কদের সাহিত্যরচনার প্রমাণ তত নয়।

য়ুরিপিডিস ও পেত্রার্ক যে ছবি আঁকতেন, এ-তথ্য হয়ত অনেকের জানা নেই। চীন-দেশে অনেক কবি ছিলেন চিত্রী, অনেক চিত্রীই ছিলেন কবি। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ল্যাসিকাল যুগে সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা প্রায় সকলেই একটু আধটু ছবি আঁকা অভ্যাস করতেন; বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে তাঁদের কথা বলেছেন। দান্তে, গ্যেটে, টলস্টয়, গোগোল, ব্লেক, জর্জ সেনড, রাঁবো, স্টিনডবের্গ, পুশকিন, পল ভ্যালেরি, বদলেয়ার, লেউস ক্যারল, পিয়ের লোটি, ওয়াশিংটন আরভিং, এডগার এ্যালান পো, হানস ক্রিশ্চিয়ান এনডারসন, রবার্ট ল্যুই স্টিভেনসন, জ্যাঁ ককতো, রসেটি, ভিকতর হুগো, হফম্যান, ভি. এচ. লরেন্স, ওয়েলস, গার্সিয়া লর্কা, কিপলিং, থ্যাকারে, মার্ক টোয়েন—এলোমেলো ভাবে কয়েকজন কবি ও লেখকের নামোল্লেখ করছি; এঁদের প্রত্যেকেই ছবি আঁকায় অভ্যস্ত ছিলেন, এবং কেউ কেউ বিশেষ দক্ষতার পরিচয়ও রেখে গেছেন। তাঁদের ছবির মূল্য ও মর্যাদা নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনাও হয়েছে। ১৯৫৭ সালের অগস্ট মাসের The Unesco *Courier*-এ এঁদের অনেকের ছবির কিছু কিছু প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে, অল্প বিস্তর আলোচনাও আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও আছে এই সংখ্যাটিতে, কয়েকটি প্রতিলিপিসহ; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ছবি কেন্দ্র করেই এই বিশেষ মূল্যবান সংখ্যাটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর আগেও, কবির জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরে, দেশে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে রসিক ও বিদগ্ধ সমালোচকেরা নানা কথা বলেছেন, নানা আলোচনা করেছেন, বেশির ভাগ কোনো প্রদর্শনী উপলক্ষে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজের ছবি সম্বন্ধে নানা উপলক্ষে নানা মন্তব্য লিখে রেখে গেছেন—চিঠিতে, প্রবন্ধে, কবিতায়। বাংলায় লেখা অন্তত একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থও আছে, এবং সেটি বেশ তথ্যপূর্ণ।

কবির জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে কবিকীর্তির ও কবিজীবনের বিচিত্র দিকের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি নিয়েও আলোচনা যা এ যাবৎ হয়েছে তার পরিমাণ কম নয়। ছোট ছোট স্বতন্ত্র রচনা তো অনেকেই লিখেছেন, নানা প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে, নানা তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, নানা দিক থেকে এই বিশেষ ক্ষেত্রে কবিকীর্তির বিচার হয়েছে। বড় সুদৃশ্য সুবিন্যস্ত পোর্টফোলিও-এ্যালবামও প্রকাশিত হয়েছে একাধিক, অল্পবিস্তর আলোচনা সহ। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণা দপ্তর এবং ভারতীয় ললিতকলা আকাদমী যে দুটি এ্যালবাম-গ্রন্থ বার করেছেন, দুটিই খুব উল্লেখ-যোগ্য প্রকাশন। তা ছাড়া, টাটা আয়রন ও স্টীল কোম্পানী বারোখানা ছবি ও প্রতিলিপি সহ যে পোর্টফোলিও বার করেছেন, তারও উল্লেখ করতে হয়। প্রথম এ্যালবামটি খুব স্বল্প সংখ্যায়, বোধ হয় ২০০ কি ২৫০ কপি, ছাপা হয়েছে, প্রচুর অর্থব্যয়ে এবং রঙীন ছবি মুদ্রণের একান্ত সাম্প্রতিক রীতি ও আঙ্গিক অনুযায়ী। শুনেছি, ৩৭ খানা ছবির এই এ্যালবামটির প্রত্যেকটি খণ্ডের জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ১৫০০/১৬০০ টাকার মত। এ হেন উদ্যমের ফসল যে খুবই মূল্যবান হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? শুধু দুঃখ হয় এই ভেবে যে, এ্যালবামটিতে ছবিগুলোর প্রতিলিপি ছাড়া আর কিছু নেই—নামপৃষ্ঠা নেই,



পরিচয়পত্র নেই, ছবিগুলোর তালিকা পর্যন্ত নেই; কবে, কোথায় ছাপা হয়েছে, কারা প্রকাশক, কিছুই উল্লেখ নেই। তবে, স্বীকার করতেই হয়, ছবির এই ধরনের সুষ্ঠু প্রতিলিপি, মূলের প্রকৃতি ও চরিত্র রক্ষার এমন সজাগ প্রয়াস সত্যই অত্যন্ত দুর্লভ। তাছাড়া, প্রতিলিপিগুলোও মূলের আকৃতি ও প্রমাণও অক্ষুণ্ণ আছে। দ্বিতীয় এ্যালবামটির প্রকাশনেও রুচির সৌষ্ঠব, মুদ্রণ পারিপাট্য এবং অঙ্গসজ্জা সত্যই খুব প্রশংসনীয় এবং ললিতকলা আকাদমী এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন। এই গ্রন্থের রঙীন ছবির প্রতিলিপিগুলিতেও মূলের প্রকৃতি ও চরিত্র অক্ষুণ্ণ। ছোট একবর্ণ প্রতিলিপিগুলোও খুব বিশ্বস্ত ও সুস্পষ্ট। আর, পৃথ্বীশ নিয়োগী মশায়ের নাতিদীর্ঘ পরিচায়িকাটিও খুব সুলিখিত, যদিও কোথাও কোথাও কেউ কেউ কিছুটা দুর্বোধ্যতার আপত্তি তুলতে হয়তো পারেন। তাছাড়া, প্রথমোক্ত এ্যালবামটির মত এ এ্যালবামটিতে কোনো ছবিরই সন-তারিখ দেওয়া নেই; থাকলে ভালো হত। প্রথমটির মত এ এ্যালবামটিও ভারত সরকারের উদ্যম ও অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত এবং বোধ হয় সেইজন্যই মাত্র পঁচিশ টাকার বিনিময়ে এ-ধরনের গ্রন্থ শিক্ষিত সাধারণের হাতে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এ-বিষয়ে, বস্তুত পৃথিবীব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদযাপনে ও পালনে ভারত সরকার যে তৎপরতা দেখিয়েছেন, যেভাবে সর্বপ্রকার আনুকূল্য প্রকাশ করেছেন তার মর্যাদার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণাদপ্তরের প্রাপ্য। টাটা কোম্পানীর সুরুচিসম্পন্ন এ্যালবামটিও প্রশংসার দাবি রাখে। বারোখানা ছবি প্রত্যেকটিই সুনির্বাচিত, সুমুদ্রিত এবং এক পৃষ্ঠার মুখবন্ধে কবির উক্তি ও রচনা থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটিই প্রাসঙ্গিক, এবং পৃথক পৃথক হলেও একটি পরম্পরাগত যুক্তিসূত্রে গাঁথা। একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এ-ব্যাপারে যে-উদ্যম প্রকাশ করেছেন, যে বিনাদ্বিধায় অর্থব্যয় করেছেন এবং যে সুষ্ঠু সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন তার উল্লেখ না করলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। রবীন্দ্রনাথের ছবির যাঁরা অনুরাগী, তার সৃষ্টি-কর্মের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা এই তিনটি এ্যালবাম-গ্রন্থের সঙ্গ উপভোগ করে লাভবান হবেন, এ-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

গ্রন্থ সমালোচনায় গ্রন্থোক্ত বিষয়ালোচনার সুযোগ স্বল্প। তবু, খুব সংক্ষেপে দু-একটি তথ্যের উল্লেখ করছি; এ-বিষয়ে যাঁরা অনুরাগী তাঁরা বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

প্রথমত, একথা সত্য নয় যে, রবীন্দ্রনাথ আগে কখনও ছবি আঁকা অভ্যেস করেননি। কবির একাধিক প্রাসঙ্গিক রচনায় উল্লেখ আছে, যখন তাঁর ৩০/৩২ বৎসর বয়স, তখনই তিনি অনেক সময় চিত্রবিদ্যার প্রতি 'হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত' করতেন। "কড়ি ও কোমল" রচনার সময় যে তিনি ছবি আঁকার বিদ্যেটা নিয়ে মাথা ঘামাতেন তার কিছু উল্লেখ "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে আছে। ৩৯ বৎসর বয়সে জগদীশচন্দ্র বসুকে একখানি পত্রে লিখছেন, 'শুনে আশ্চর্য হবেন একখানা sketch book নিয়ে বসে বসে ছবি আঁকচি.....'। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাই করতেন এবং এ-ব্যাপারে তাঁর দক্ষতার পরিচয় অনেকের জানা আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের sketch book-খানা গেল কোথায়? চিত্রী মুকুল দে মশায়ের একটি স্বীকারোক্তি আছে যে, কবি তাঁকে নিজের স্কেচের একখানা বই রাখতে দিয়েছিলেন। মুকুলবাবু রক্ষিত স্কেচ বইখানা কি সেই sketch book যার উল্লেখ করেছেন কবি জগদীশচন্দ্রের কাছে চিঠিতে?

দ্বিতীয়ত, চিত্রী হিসেবে যে-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয়, তাঁর জন্ম ১৯২৮এ। তারপর ১২/১৩ বছর তিনি সমানে নেশায় পাওয়া মানুষের মত যত ছবি এঁকেছেন তার সংখ্যা তিন হাজারের উপর; ১৫০০-র বেশি ছবি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র সদনেই আছে। সংখ্যা বিচারে এই সময়ের মধ্যে এতগুলো ছবি আঁকা প্রায় অবিশ্বাস্য, তবু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এক-এক দিনে দুতিনখানা ছবিও এঁকেছেন, দেখেছি এবং আঁকতেন যেন possessed বা আচ্ছন্ন অবস্থায় একটি মানুষ সমানে তুলি চালিয়ে যাচ্ছে, অত্যন্ত দ্রুত ও অস্থিরভাবে। কবির ছবিতে অনেকে একটা অনির্দেশ্য প্যাসনের উল্লেখ করেছেন; একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু, এর কারণ কি? শুধু অবচেতনার উল্লেখ করে প্রশ্ন।

তৃতীয়ত, অনেকে বলে থাকেন রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ছবি-আঁকার কোনো ব্যাকরণ-প্রকরণ নেই; যে-পটুত্ব স্বপ্রকাশ ছবিগুলোতে তা অশিক্ষিত পটুত্ব। কথাটি কি সত্য? তাঁরা কি কবির রেখাচিত্র এবং 'চিত্তিরবিচিত্তিরগুলি ভাল করে বিচার করে দেখেছেন? কিংবা তাঁর রঙ্গীন ছবির রং-প্রলেপের নীচে যে রেখাঙ্কন আছে, যা অনেক সময় শুধু চোখেও ধরা পড়ে, তার বিশ্লেষণ করেছেন?

চতুর্থত, অনেকে আরও বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে তাঁর ছবিগুলোর কোনো প্রকৃতিগত বা কল্পনাগত সাযুজ্য নেই। কথাটা কি সত্য? তাঁরা কি সমসাময়িক কবিতা ও ছবিগুলো ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন? জানি, এ ধরনের উক্তির জন্য দায়ী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তবু, সবিনয়ে বলি, এ-ব্যাপারে আমার সন্দেহ অকারণ নয়।

**নীহাররঞ্জন রায়**

**রবীন্দ্রায়ণ** (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত। বাক্-সাহিত্য। কলিকাতা-৯। মূল্য প্রতি খণ্ড দশ টাকা।

যে দেশে সভ্যতার সূচনা প্রাক্-ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে এবং যার ইতিবৃত্তের সময় গণনায় শতাব্দের চেয়ে সহস্রাব্দ প্রয়োগ করাই সঙ্গত মনে হয়, সেখানে আশী বছরের জীবন নিতান্তই ক্ষীণ আয়ুষ্কাল। কিন্তু প্রাচীনত্বের গৌরব আর দীর্ঘ কালমাহাত্ম্য মেনে নিয়েও বলা চলে যে ভারতীয় ঐতিহ্যের পাতায় মাত্র ঐ আশীটি বছর এমন এক স্বাক্ষর রেখে গেছে যা একটি বিস্তৃত সমগ্র যুগের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। একদিকে ঔপনিষদিক সংস্কৃতি ও সাধনা, অপর দিকে আধুনিক সমাজ-চিন্তার বলিষ্ঠ সরসতা—এ দুয়ের মিলন রবীন্দ্র জীবনে ও মানসে বিধৃত হয়ে প্রমাণ করেছে, আয়তির চেয়ে কীর্তি মহৎ। সেই কীর্তির তথ্য-আহরণ ও বিশ্লেষণ কম মহৎ কাজ নয়।

গত চল্লিশ বছরে, বিশেষ করে শেষ দুই তিন দশকে, বাংলা দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে রকম চর্চা ও অনুশীলন হয়েছে, তা শুধু আনন্দের কথা নয়, গৌরবেরও বিষয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে সব গবেষণা করা হয়েছে, তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে, তার অনেকগুলিই সারবান। ফলে, কবির



শিল্পভাবনা ও কর্মসূচী সম্বন্ধে এমন অনেক জ্ঞাতব্য সংগৃহীত ও পরিবেশিত হয়েছে, যার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এতাবৎ অসম্পূর্ণ বা উদাসীনতায় অনধিগত ছিল। রবীন্দ্র-চর্চায় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে, তাঁর গদ্য কাব্য সঙ্গীত ও চিত্রকলার নানামুখী আলোচনায় অনুশীলনের পদ্ধতি এবং বিচারের মান-সূত্রও বদলাচ্ছে। অনুবুদ্ধ উচ্ছ্বাস আবার শিথিল বক্রোক্তি, কোনোটাই এখন গ্রাহ্য নয়। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য ও বিচিন্তার, জীবনের ও বাণীর যথার্থ মূল্য নিরূপণে বাংলায় এবং অন্যত্রও একটি 'ট্র্যাডিশন' গড়ে উঠছে। অনুশীলনের পরিধি ক্রমবিস্তৃত হওয়ার ফলে গবেষণার ক্ষেত্র যেমন বেড়ে গেছে, বিষয়-বিভাগ এবং বিশেষবিৎ চর্চার মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তাও তেমনি স্বীকৃত হচ্ছে।

এই সর্বজনস্বীকৃতি এবং সর্বজনগ্রাহ্যতাতেই রবীন্দ্ররচনার সার্থকতা। যেসব ভাবনা কল্পনা সত্যানুভূতি ও উপলব্ধি তাঁর সঙ্গীতে কাব্যে কথিকায় আখ্যানে চিত্রে প্রবন্ধে অজস্র মুক্তার মতো বিকীর্ণ হয়ে আছে, সেগুলি কাল স্তর ও বিষয়ানুযায়ী সমসূত্রে ও বিভিন্ন গুচ্ছে গ্রথিত করে সর্বসমক্ষে সম্যক্ আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করাই এখন দেশবাসীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য। একমাত্র গুণগ্রাহী, দায়িত্ববোধসম্পন্ন, নিষ্ঠাশীল সম্পাদনায় এই গুরু কৃত্য নিষ্পন্ন হতে পারে। "রবীন্দ্রায়ণ" দুই খণ্ডে শতবর্ষপূর্তির প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিনা আড়ম্বরে, পরিচ্ছন্ন রুচিবত্তায়, সেই দায়িত্ব পালন করেছে বলেই এই ভূমিকার অবতারণা। রবীন্দ্র-প্রতিভার সমস্ত দিক যে পূর্ণাঙ্গভাবে আলোকিত হল এর ফলে, অথবা বিষয়ান্তর অবলম্বন করে নূতনতর নিবন্ধের প্রয়োজন আর নেই—এমন কথা কেউই বলতে চাইবেন না, সম্পাদকও সে দাবি করবেন না।

রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রায় সকল পরিচিত বিভাগগুলি আলোচ্য সঙ্কলনে উপস্থাপিত হয়েছে এবং বিভিন্ন আলোচনায় কখনও সাধারণ ও ব্যাপকভাবে, কখনও সীমিত অথচ গভীরভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টি থেকে সুধীবৃন্দ বিশেষ ধরনের আলোকপাত করেছেন। ভাষা ও ভঙ্গীর স্বতন্ত্রতায় আলোচনাগুলিতে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এসেছে, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক আধটি প্রবন্ধ আংশিক লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাতে তেমন ক্ষতি হয়নি, অন্ততঃ পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, একজন লেখক হয়তো একটি ব্যাপক বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন, তার পরে অপর কোনও লেখক হয়তো ক্ষুদ্রতর পরিসরে সেই বিষয়েরই একটি অংশকে আশ্রয় করে আরও বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন প্রথম খণ্ডে 'উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ' লেখাটির পরে 'দামিনী' প্রবন্ধটি সুনাস্ত হয়ে অর্থ-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ ধরনের সংযোজন-বৈশিষ্ট্যের জন্য সম্পাদক ধন্যবাদ পেতে পারেন। 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ' আর 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস' আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নধর্মী রচনা নিশ্চয়ই। কিন্তু বিষয়ানুগ পৃথকীকরণ করেও বলা যেতে পারে রবীন্দ্র রচনার উৎস ও মূল ভিত্তি নির্ণয়ের দিক থেকে,—ঐতিহ্যপুষ্টির দিক থেকে, এ দুটি প্রবন্ধের সুরে খুব বেশি তফাত নেই।

"রবীন্দ্রায়ণ" দুই খণ্ড একত্র করে দেখলে বোঝা যাবে, জয়ন্তী বা শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে নানা ধাঁচের সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল এবং হয়েছে, তা থেকে এই বই কিছু স্বতন্ত্র। কারণ এর মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় একাধিক লেখক আছেন সত্য, কিন্তু লেখক-গোষ্ঠীর অস্তিত্বটা প্রধান তথ্য নয়। রবীন্দ্রনাথই মুখ্য, তাঁর প্রতিভার বহুমুখী আলোচনাই মূল উদ্দেশ্য। আরও লেখক আরও বিষয়-আলোচনা সন্নিবেশিত করা যেতে পারত, একথা বলা চলে নিশ্চয়ই। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় এসে থামতে হয়, সীমা-

রেখা টানতে হয়, এ কথাও সত্য। সুতরাং যা আছে, যা পাওয়া গেছে, তার বিন্যাস সুষ্ঠু এবং পরিকল্পনা শোভন ও সংগত কিনা, সেইটাই বিচার্য। সে বিচারে সম্পাদক কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন এই কারণে যে, তিনি শুধু রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পঞ্জীর নির্ভুল সংগ্রাহক এবং রবীন্দ্ররচনার পাঠশুদ্ধি ও পাঠান্তর-সম্পর্কে প্রামাণ্য তন্ত্রধারক নন, কবি-সান্নিধ্য-লালিত, পরিবেশ-পুষ্ট এবং ঐতিহ্যনিষিক্ত হয়েও বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায়, সচেতন সম্পাদনায় আস্থা রাখেন।

মোট ছয় শত পৃষ্ঠারও বেশী এ দুই গ্রন্থ ভবিষ্যতের পাঠক-গবেষকের কাছে মূল্যবান আকর-গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হবে, এটা আশা করা অসংগত হবে না এবং গত বিশ ত্রিশ বছর ধরে রবীন্দ্র-আলোচনার গতি-ধারা এবং অভিমুখিতার একটি সুগ্রথিত নির্দেশ-সূচী বলে গণ্য হবে। প্রথম খণ্ডে ষোলটি প্রবন্ধ আর এগারোখানি খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা চিত্র, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবন্ধ-সংখ্যা হল বিশ এবং মৌল চিত্র, আলোক-চিত্র এবং হস্ত-লিপির চিত্র-সংখ্যা হল বাইশ। এর তৃতীয় পরিচয় হচ্ছে, পরিধি অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের নির্ধারণ, নিগূঢ়তর আলোচনার অবকাশ এবং রবীন্দ্র-চর্চার ভবিষ্য ইঙ্গিত। এই তিনটি পরিচয়ে এই কথা বোধ হয় প্রমাণিত হয় যে বৃহদায়তন সম্পাদনার যে দায়িত্ব ও নৈপুণ্যের নমুনা পশ্চিমী প্রকাশনে দেখা যায়, তার দোসর এ দেশে বিরল নয়।

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলির কোনোটিই স্বল্পায়তন নয়, কারণ পরিসরের অজুহাতে বক্তব্যকে সংকুচিত ও সংক্ষিপ্ত করবার প্রয়োজন ঘটেনি। বরঞ্চ লেখকরা যতদূর সম্ভব আলোচনার সূত্রকে স্বাভাবিক সম্পূর্ণতায় এনে শেষ করেছেন। তাই এতগুলি প্রায়-পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের পরিচয় দিয়ে ক্ষান্ত হতে হবে। বলা বাহুল্য, রসজ্ঞ গুণগ্রাহী পাঠকরা দুই খণ্ড "রবীন্দ্রায়ণ" আদ্যন্ত পড়ে সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্র-সত্তার সামগ্রিক পরিচয় পাবেন এবং তার চেয়েও বড় কথা—রবীন্দ্র-চর্চায় উৎসাহিত হয়ে তাঁরা কবির সমস্ত রচনা,—বিশেষ করে তাঁর যাবতীয় গদ্য, প্রবন্ধ, জিজ্ঞাসু মন নিয়ে পড়বেন। 'বিশ্বকবি' সম্বোধনে, সগৌরব অনুষ্ঠান-পালনে, কিংবা মৌখিক ভক্তিবিহ্বলতায় যে নিশ্চিন্ত আত্মতৃপ্তি, তার বিষম গলদ ও ফাঁকি কোথায়, সে কথা অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁর অসম্পূর্ণ শেষ লেখাটিতে ব্যক্ত করে গেছেন। বিদেশী পণ্ডিত সমালোচকদের মন্তব্য ও মতামতের মূল্য যাই হোক, রবীন্দ্র-সাহিত্যের যথার্থ রসগ্রহণ ও বিচার এ দেশের পাঠকদের আত্মনির্ভর অনুশীলন এবং উদ্বোধনেই একমাত্র সম্ভব হতে পারে। বিশ্বব্যাপী জীবন ও আলোকস্রষ্টা সবিতার কেবল স্তুতি নিতান্তই অর্থহীন হয়ে যায়, যদি না সাবিত্রী মন্ত্রের অর্থ বুঝি। রবি-প্রদক্ষিণও শুধু যান্ত্রিক হয়ে যায়, যদি উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে সমগ্র অয়ন না দেখি এবং প্রতিটি অয়নাংশের ভোগ্য ফল আস্বাদ না করে, শুধুই অন্ধাবর্তে পরিক্রমা করতে থাকি।

প্রথম খণ্ডের বিষয়াবকাশ সুনির্দিষ্ট, তা মূলতঃ সাহিত্যিক। অর্থাৎ কবির সাহিত্য-কর্মের মধ্যে আবদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ কোনো কোনো প্রবন্ধে বিষয়ান্তর এসে গেছে এবং সেটা ন্যায্য ও স্বাভাবিক, যেহেতু কবির মনোজগৎ থেকে একেবারে সম্পর্কলেশহীন হতে পারে না। তবে মোটের ওপর, প্রথম খণ্ডে কবিকৃতির উপরই প্রবন্ধগুলির দৃষ্টি-নিবদ্ধ। এই সৃজনশীল কবি-মানসের বিভিন্ন দিক রয়েছে—যেমন কবি-ভাবনার বা কাব্য-প্রেরণার উৎস, মানস-মণ্ডল, তার উপাদান, কবি-কল্পনার প্রকৃতি, গতি-রীতি ও বিবর্তন, মন্ময়তা ও বহির্মুখিতার রূপ-সম্পর্ক, প্রকাশ-ভঙ্গী, ভাষা ও ছন্দের বিশ্লেষণ। এইসব উপকরণ নিয়ে



যে ষোলটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, তাদের জাতি ও মান সব ক্ষেত্রে সমান নয়, কিন্তু লেখকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারিত হয়ে তারা সুলিখিত এবং নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। যদিও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ'-এ স্থানে স্থানে গূঢ় গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়, তবু এই রকম আলোচনার পদ্ধতিতে, মোটামুটি সহজ বোধগ্রাহ্য কয়েকটি তথ্যোপকরণকে বিপরীত কোটিতে স্থাপন করে', তারপর কিছুটা বাগ্‌বহুল, ঈষৎ ফেনায়িত মন্তব্য ও ব্যাখ্যার জালে টেনে একত্র প্রতিষ্ঠিত করার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে, কেমন যেন একটা সোচ্চার 'নাটকীয়তা, একটু প্রগল্‌ভ অতিকথনের আভাস এসে যায়। সমালোচনার শিক্ষিত পটুত্ব সত্ত্বেও এই ত্রুটিটুকুর উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর দৃষ্টি বহুসঞ্চারী ও সন্ধানী। কিন্তু বোধ হয়, বেশি বলার জন্য মাঝে মাঝে স্রোতের চেয়ে তীরের কথাই বড় হয়ে ওঠে। তাঁর লক্ষ্যভেদ-নৈপুণ্য চমৎকার। তবে দৃষ্টি সমভাবে নিবদ্ধ না থাকার দরুণ কিছু শৈথিল্য অনিবার্য।

অথচ 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষা ব্যবহার' এবং 'বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ' এই দুটি প্রবন্ধের রচয়িতা মূলতঃ সাহিত্যিক বলে কীর্তিত না হয়েও তাঁদের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্যকে কেমন ঋজু প্রত্যক্ষ ও সংহতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। শ্রীসুকুমার সেনের পরিচ্ছন্ন রচনাটিতে একাধিক দিক্‌নির্দেশ আছে, লেখাটি স্বয়ংপূর্ণ অথচ নানা সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। সংস্কৃত কবিদের ভাষাব্যবহারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শব্দপ্রয়োগ-সাদৃশ্য তিনি কুশলী ভাষাতত্ত্ববিদের মতই দেখিয়েছেন। শ্রীভবতোষ দত্তও রবীন্দ্রনাথের বাংলা গদ্যের ব্যবহার, বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য খুব পরিষ্কার করে দেখাতে পেরেছেন, বিষয়টি কঠিন হওয়া সত্ত্বেও। কবির প্রোজ স্টাইল সম্পর্কে এই বিশদ অথচ সূক্ষ্ম আলোচনাটি যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি। এতে বাংলা গদ্যের, প্রথমতঃ প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের ইতিহাসটি, ভাষাব্যবহার এবং রচনাশৈলীর দিক থেকে, অতি সংগতভাবে যুক্ত ও আলোচিত হয়েছে। আর যে রীতি অবলম্বন করে লেখক রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির নবরূপায়ণের কীর্তি-ব্যাখ্যা করেছেন, সেই রীতিতে বিজ্ঞানী বিশ্লেষণ লক্ষ্য করি। মনে হয়, মর্ম ও কনটেন্ট,—আঙ্গিক ও অন্তর্বস্তু অর্থাৎ বাহক এবং বাহ্য—এ দুই পদার্থের সমন্বয় কোথায় কিভাবে সার্থক, পরিস্ফুট হচ্ছে—এটা শিল্পীর সৃষ্টি-নিদর্শন থেকে প্রমাণ করাই হচ্ছে প্রকৃত আলোচনা। লেখক কোথাও ভাসা-ভাসা সৌখীন সমালোচনার সিদ্ধান্ত খাড়া করেন নি। রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথেরই ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি সাজিয়েছেন। 'বিদ্যাসাগর চরিত', 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য', 'বাংলা ভাষা-পরিচয়', 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'ভাষা ও ছন্দ' প্রভৃতি নানা রচনা থেকে তিনি কবির শব্দ ও স্টাইল সম্বন্ধে মতামত উদ্ধৃত করেছেন এবং সবচেয়ে প্রশংসার কথা,—কবির গদ্যরীতি-নির্মাণের ক্রমিক ইতিহাসটি সযত্নে গঠন করেছেন। গদ্যের চরিত্র কেমন পর্বভেদে বদলাচ্ছে, বিষয়ভেদে বিষয়াশ্রয়ী প্রকাশভঙ্গিমা পরিবর্তিত হচ্ছে, অনুগামী কিভাবে স্রষ্টা হয়ে উঠছেন,—এক কথায়, বর্ণন-চিত্রণে, পূর্বসূরি-সমালোচনায়, সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প সম্বন্ধীয় উক্তিতে, ধর্মসম্পর্কিত ভাষণে, আর সব শেষে সমাজ ও সভ্যতার উপর রবীন্দ্রনাথের 'প্রফেটিক' উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর গদ্য লেখার ভঙ্গী কাল ও স্তর-অনুযায়ী কেমন করে একেকটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে, আর সেই সঙ্গে সকুণ্ঠ কবির একক কণ্ঠস্বর কিভাবে শেষ পর্যন্ত ভাষা ও শব্দ পরীক্ষার তরঙ্গ পার হয়ে অকুণ্ঠ আত্ম-প্রকাশ ও আত্মপ্রত্যয়ের নিরাভরণ তীক্ষ্ণতায় এসে সমাহিত হচ্ছে, নূতন নূতন যুগপর্বের সংঘর্ষে এই নূতন চিন্তা ও ভাষার জীবন-ইতিহাসটুকু, বিবর্তনের সূত্রে, উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে গ্রথিত হয়ে রইল

এই সমন্বিত প্রবন্ধটিতে।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস' একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় রচনা। ইতিহাস-জ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যবোধ কিভাবে যুক্ত হলে সাহিত্য-সন্দর্ভ সার্থক হয়, প্রবন্ধটি তার জীবন্ত প্রমাণ। লেখকের মস্ত গুণ—প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণের নৈপুণ্য। তিনি অনায়াসে বক্তব্যের মূলে গিয়ে পৌঁছুতে পারেন। আর এমন সুসঙ্গত উদ্ধৃতি প্রয়োগ খুব কম নিবন্ধেই দেখা যায়। 'প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই' —রবীন্দ্রনাথের এই প্রথমোক্তি দিয়ে প্রবন্ধের সূত্রপাত। তারপর কবির প্রাচীন ভারত-চেতনা, ভারতীয় সংস্কৃতি-চেতনা এবং ইতিহাস-বোধ কেমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, একটি থেকে আর একটি বোধের উদয়, লেখক তা দেখিয়েছেন অন্বয় ও বিস্তারের সাহায্যে। কবির সংস্কৃতি-চেতনার উৎস তিনটি—বুদ্ধ, অশোক এবং কালিদাস। আর এই ত্রয়ী-প্রীতি রবীন্দ্রনাথকে কি রকম শ্রমশীল নিষ্ঠায় ও সৃজন-প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করেছে, প্রবোধ সেন মহাশয় সেই চরিত্র-পূজারী কবির মনোজগৎ, তার পরিবেশ সৃষ্টির উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথকে শুধু কল্পনার জারক রসেই সঞ্জীবিত করে নি, প্রাচীন কবির ব্যক্তিত্ব-সন্ধিৎসায় অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই কালিদাস-চর্চার এত বিচিত্র শোভা, এত বিভিন্ন পর্যায়। কালিদাসের জগৎকে রবীন্দ্রনাথ নূতনভাবে আবাদ সৃষ্টি করেছেন, আবিষ্কার করেছেন। কালিদাসের কবি-কল্পনা, শুচিতা, সৌন্দর্যবোধ ও প্রণয়াদর্শ রবীন্দ্র-মানসকে কতখানি রসিত ও অনুভাবিত করেছে, তাঁর তপোবন-প্রীতি ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠা ও সত্যকামী জীবন-শিল্প-সংযম সৃষ্টি করেছে আর বাম-দক্ষিণ শিব-কল্পনার অপরূপ অভিব্যক্তিতে প্রেরণা জুগিয়েছে, এ সব তথ্য এই প্রবন্ধে যুক্তি শৃঙ্খলায় পরিবেশিত হয়েছে। কালিদাসের কবি-সত্তা আর রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা কোথায় কিভাবে সম্পৃক্ত, কি চেতনায় উভয়ের মিলন, কোন্ চিত্রে ও অনুষঙ্গে তাঁদের চিত্তান্বয় ঘটেছে—আর কালিদাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতের আত্মিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা শান্তিনিকেতনে কেমন অলক্ষ্যলক্ষ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি সমাজ ও সধর্মের প্রতিষ্ঠায় এবং বিকাশে সহায়তা করেছে—এইসব অন্তর-কথার বিশ্লেষণ-রূপ প্রতিফলিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের শব্দ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে যেগুলির প্রতি কবির অনুরাগ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে ধরা যায়, সেগুলি এককেটি করে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এ শুধু পরিসংখ্যানের যান্ত্রিক কাজ নয়; সংগ্রাহকের যত্ন-শ্রম নিয়ে কবির শব্দভাণ্ডারের উত্তরাধিকৃত, অর্জিত এবং সৃষ্ট সম্পদকে দেখানো হয়েছে ব্যাকরণসম্মত টাঁকার মাধ্যমে। এ ছাড়া, আরো প্রবন্ধ রয়েছে প্রথম খণ্ডে যেমন শ্রীঅজিত দত্তের 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প', শ্রীকানাই সামন্তর 'দামিনী', শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলাভাষা', শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের 'উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ'—যেগুলির প্রতিটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। শ্রীসোমনাথ মৈত্রের 'রবীন্দ্র প্রতিভার বৈচিত্র্য' আর শ্রীমতী লীলা মজুমদারের 'ছোটদের জন্য' রচনা দুটি সংক্ষিপ্ত সাধারণ-ধর্মী রচনা হলেও প্রাঞ্জল, সারবান্ এবং সহজ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাকি লেখাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ', শ্রীঅমলেন্দু বসুর 'রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা', শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকারের 'আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব' এবং শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি'। প্রথম দুটি প্রবন্ধ 'টেকনিক' অর্থাৎ শিল্পমার্গ-সংক্রান্ত রচনা এবং আঙ্গিক-বিচারের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও



রূপ-নির্ণয়। অলোকরঞ্জন কবি কিন্তু তাঁর ভাষা সচেতনভাবেই গদ্য, কড়া হাতে বিশ্লেষণের গদ্য। আর অমলেন্দু বসু এমন একটি সম্পূর্ণ সুন্দর নিবন্ধ লিখেছেন যার মধ্যে তত্ত্বের তীক্ষ্ণতা আবার কাব্যের বিচ্ছুরিত জ্যোতিও আছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও চরিত্রের সামগ্রিক নির্ধারণ না করে অলোকরঞ্জন একটি নির্বাচিত সূত্র বেছে নিয়েছেন—যা দিয়ে 'ফ্যক্‌ট অব ফিকশ্যন' অর্থাৎ উপন্যাস-গঠন রীতির বিবর্তন দেখানো যায়। সেই সূত্রটি তিনি মনে করেন রবীন্দ্র চরিত্রের মূল সূত্র, যার সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির জীবনদৃষ্টিতে একটি অন্তর মিল রয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক ভূমিকাস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-ধারণা ও নির্মাণপদ্ধতির অবতারণা করেছেন এবং "চতুরঙ্গ" "ঘরে-বাইরে" "যোগাযোগ" আর "শেষের কবিতা"র গঠনশৈলী ও 'ডিকশ্যান' সম্পর্কে কয়েকটি এমন মন্তব্য করেছেন যা সূক্ষ্ম ও নিপুণ, যদিও লেখকের কোনও কোনও সিদ্ধান্তে মন সায় দেয় না। বিদেশী তুলনা প্রতিতুলনা এবং সমালোচনার আস্ত-বাক্যে তেমন আস্থা না রেখে, যদি তিনি নিজস্ব বিশ্লেষণ-রীতি ধরে অগ্রসর হতেন, যেমনটি করেছেন "যোগাযোগ" উপন্যাসের বেলায়, তাহলে ফল আরও ভালো হত।

শ্রীঅমলেন্দু বসুর প্রবন্ধে আলোচনার ধারাটি নূতন, অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে। একমাত্র "নবেন্দু বসু 'কবিতার প্রকৃতি'তে এই ধরনের আলোচনা শুরু করেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের পোয়েটিক স্টাইল ও তার বিশ্লেষণ, ইমেজ বা বাক্‌প্রতিমার ব্যবহার, প্রয়োগের সঙ্গতি কাব্যিক সার্থকতা, আবেগের উৎস এবং আবেদনের বৈশিষ্ট্য—এই বিষয়গুলির বিস্তারিত অথচ পারম্পরিক সুসংবদ্ধ আলোচনা পাওয়া যাবে। এই রচনাটি "রবীন্দ্রায়ণ"-ভুক্ত অন্যান্য লেখার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। বিনয়েন্দ্র চৌধুরী একটি সুপরিচিত বিষয় নিয়ে লিখেছেন। লেখাটি আরও তথ্য নির্ভর এবং পূর্ণাঙ্গ করা যেতে পারত। কিন্তু তাঁর বক্তব্য যে গতানুগতিক নয় এবং সংক্ষেপে মূল কথাটি তিনি যে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে জানেন, তার প্রমাণ প্রবন্ধের পঞ্চম অনুচ্ছেদ, শেষ স্তবকটি। আর যে রচনাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বিচারশীল পাঠকের দৃষ্টি ও মনকে তৃপ্ত করতে পারে, সেটি 'আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব'। এই নামকরণের প্রতিটি অংশ তাৎপর্য-মণ্ডিত। য়ুরোপের ক্ল্যাসিক্যল যুগ থেকে বর্তমান কালের 'বিশ্বকবি' আখ্যার ও সংজ্ঞার আলোচনা, উনিশ শতকে বাংলার ভাব-জগতের ধারা, মানবীয় সংস্কৃতি ও ধারণার পটভূমিতে রবীন্দ্র-চিত্তে বিশ্বসমস্যার প্রত্যক্ষ উদয় ও উপলব্ধি, বিশ্বমানব প্রীতি থেকে উদ্ভূত বিশ্বকবির নূতন চেতনা ও সৃষ্টিকর্ম,—এক কথায় কোন্ পরিবেশে, কোন্ কোন্ বিশেষ মনীষার স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ রূপ পরিগ্রহ করেছে, সুনীল সরকার তার ব্যাখ্যা করেছেন। দেখিয়েছেন "সন্ধ্যা-সংগীতে"ই কবি অন্তর্দ্বন্দ্বের পালা সাঙ্গ করে বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্ব-মানবের পথ খুঁজে পেয়েছেন। এইখানেই 'আবির্ভাব' শব্দটির অর্থ সংহত হয়ে উঠেছে। মানস-গঠন ও কবি-কৃতির এ রকম ইতিহাস-সম্মত বিজ্ঞানী আলোচনা ইতিপূর্বে শুধু ধূর্জটিপ্রসাদের "বক্তব্য" গ্রন্থে রবীন্দ্রালোচনায় পাওয়া গিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত, সুনীল সরকার রবীন্দ্রনাথের উপর বোদ্‌লেয়রের তীক্ষ্ণ একাগ্রতার প্রভাব উল্লেখ করে উত্তেজনার মাত্রা কাটিয়েছেন।

প্রথম খণ্ডের পরিচয়পত্র কিছু দীর্ঘ হয়ে গেল এই কারণে যে, এখানকার প্রবন্ধগুলিতে কবির উত্তরাধিকার, অন্তর্দ্বন্দ্ব বিবর্তন সাধনা ও উপলব্ধি, সংক্ষেপে কবির শিল্পরীতির ও মানস তৈরীর ক্রমবিকাশ নানাভাবে একেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। সেই

জন্যই সাহিত্য পাঠকের কাছে এই খণ্ডটি সমাদর লাভ করবে। কিন্তু তাই বলে দ্বিতীয় খণ্ডের ঐশ্বর্য মোটেই কম নয়। প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধগুলি মূলতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈচিত্র্য-বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাগুলি মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের ছবি গান নৃত্যনাট্য এবং শিক্ষা সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার পরিচিতি। অবশ্য কবির সকল চিন্তার প্রকাশই তাঁর নিজস্ব বাক্‌চিত্র ও প্রতিমা-প্রয়োগে পুরোপুরি সাহিত্যিক। তবু মনে হয়, যদি সম্পাদক দ্বিতীয় খণ্ড থেকে সুলিখিত তিনটি রচনা—শ্রীহিরণকুমার সান্যালের 'তিন পুরুষ', সাহানা দেবীর 'কবির সংস্পর্শে' এবং শ্রীশঙ্খ ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথের পত্রধারা' প্রথম খণ্ডে দিতেন, তা হলে ভালো মানাত। অথবা সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলার উপর রচিত প্রবন্ধগুলি তিনটি গুচ্ছে বিভক্ত করে প্রথম খণ্ডে, আর ধর্ম দর্শন শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তা সম্পর্কিত রচনাগুলি পুরোপুরি দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করতেন, তাহলে বোধ হয় সুবিধা হত। অবশ্য সব রচনাগুলি একত্র হাতের কাছে না পেলে সম্পাদকের কোনো পরিকল্পনা কার্যকরী হয় না। যাই হোক, দ্বিতীয় খণ্ডে যা পাওয়া গেছে, তার মূল্য বেশি, বিশেষ পাঠক-শ্রেণীর কাছে। কারণ সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তানায়কত্ব আর কর্মসূচীর বিশদ বর্ণন তাঁর সাহিত্যালোচনার চেয়ে এখনও পর্যন্ত কমই আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতিটি প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেক লেখকই নির্ধারিত বিষয় নিয়ে কিছু-না-কিছু নূতন কথা শুনিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রায় সকলেই স্বক্ষেত্রে প্রতিনিধি-স্থানীয় লেখক এবং নির্দিষ্ট বিষয়সম্পর্কে যোগ্যতার অধিকারী। আচার্য নন্দলাল বসু, চিত্রশিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী কবির ছবি আঁকা, চিত্ররচনার ভিত্তি এবং শিল্পকর্মের পদ্ধতি নিয়ে তিনটি দিক থেকে আলোচনা করেছেন। তার ফলে, কিছু কিছু মতদ্বৈধ থাকলেও, যা স্বাভাবিক, তিনটি প্রবন্ধ ভালো করে পড়লে কবির চিত্ররীতি ও চিত্রচরিত্র সম্পর্কে একটি মূল্যজ্ঞান অর্জন করা যায়, রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার উৎস, উদ্ভাবন ও সিদ্ধি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাসের 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সূচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' লেখাটি মনোরম, তথ্য প্রমাণে উত্তীর্ণ। শ্রীরাজেশ্বর মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত চিন্তা' নিয়ে যে সব প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন, সঙ্গীতবিদ্‌ কোনও কোনও লেখক তার কিছু অংশ অন্যত্র আলোচনা করেছেন। তাহলেও এগুলি দামী কথা এবং পুনরালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মৌলিক চরিত্র-সম্পর্কে এখনও জনমত রীতিমত শিক্ষিত হয়নি এবং বিশেষজ্ঞদের আলোচনাও সম্পূর্ণ ও সংস্কারবর্জিত হয়ে ওঠেনি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিক্ষার ভিত্তি ও অভিমতে যথেষ্ট দৃঢ়তা ছিল, অতএব সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্মে, কথা ও সুরের অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণে, সংযত গায়নপদ্ধতিতে তাঁর পরিকল্পনা ও প্রকাশ ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্ন না হয়েও কতটা মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সে সব প্রসঙ্গ রাজেশ্বর মিত্র নিপুণভাবেই বলেছেন। সবচেয়ে মূল্যবান অংশটি তানবিস্তারের অবকাশ সম্পর্কে কবির মতামত। অলঙ্কারের অতিসমাবেশে-নারী-সৌন্দর্য কিংবা বর্ণপ্রলেপের বাহুল্যে ছবির শোভা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একটি রাগ গাইতে গিয়ে যাবতীয় তানের বিস্তারবৈচিত্র্য ততটাই অবাঞ্ছনীয়। প্রতিটি গান নিজস্ব তাগিদে যেখানে গড়ে ওঠে, কথা দিয়ে যেখানে রাগ-রূপ ফোটাতে হয়, সেখানে তানের যতটুকু অবসর ও প্রয়োজন, ততটুকুই সুপরিমিত-



ভাবে প্রয়োগ করা দরকার। সঙ্গীত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৃষ্টিস্বাধীনতা আর সংযম, এই মূল কথা রাজেশ্বর মিত্র ভালো করে বুঝিয়েছেন। *বিমলচন্দ্র সিংহ 'রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য' নামক তাঁর শেষ রচনাটি যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংলাপ ও কথা সুরের সাহায্যে কতটা সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত রূপায়িত হয়, লেখক কতকগুলি উপযোগী উদ্ধৃতি দিয়ে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে চিন্তা ও কর্মের পরিচয় পাওয়া যাবে ঐ সব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধে—যেমন শ্রীবিনয় ঘোষের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোক-সংস্কৃতি', শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ', *রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পল্লীর উন্নতি : পিতৃস্মৃতি' এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রবীন্দ্র শিক্ষানীতির মূলকথা'। বিনয় ঘোষ তাঁর প্রবন্ধে স্বক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন এবং তথ্য পরিবেশনে কার্পণ্য করেন নি। রবীন্দ্র দাশগুপ্ত একটি গভীরাত্মক বিষয় নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু কি জানি কেন, বোধ হয় ভাষার দিক থেকে কিছু আড়ষ্টতার জন্য, লেখাটি তেমন জমতে পায় নি। রথীন্দ্র-নাথ ঠাকুরের লেখাটি প্রাঞ্জল আখ্যানের সুন্দর নমুনা, শুধু স্মৃতিচিত্র নয়—গ্রামোন্নয়ন চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের ক্রিয়াকলাপের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা। আর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি সম্পর্কে এমন অনেক কথা সাজিয়েছেন ও বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করেছেন মাত্রাবন্ধ যুক্তি ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে যে পড়তে পড়তে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন সংক্রান্ত যা কিছু নিবন্ধ এ যাবৎ পড়েছি, তাদের চেয়ে এ রচনাটি কত সরস ও সংক্ষিপ্ত। 'শিক্ষক' শব্দটির লৌকিক ও বাঙময় অর্থ, রবীন্দ্রনাথের কাছে ঐ শব্দটির প্রকৃত সংজ্ঞা, শিক্ষণরীতি সম্পর্কে কবির নিজস্ব মত ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ, ডিসিপ্লিনের সঙ্গে যুক্তির মিশ্রণ, তাঁর যাবতীয় পরীক্ষা ও সংস্কারের লক্ষ্য ও পরিণাম—এ সব জিনিস একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ-কলেবরে প্রাঞ্জল-ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শিক্ষানীতির 'মূল' কথাটাই লেখকের প্রতিপাদ্য।

রাজনীতি অর্থনীতি ইতিহাস ও বিজ্ঞান—এ চারিটি বিষয়কে একত্র নিয়ে ঐসব বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলির এবার উল্লেখ করতে হয়। এই প্রবন্ধ সমষ্টি আমার কাছে সবচেয়ে অর্থবান এবং মূল্যবান মনে হয়েছে। শ্রীশচীন সেনের 'রাষ্ট্র বনাম সমাজ' বিশেষজ্ঞ-রচনা, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছেও এ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণার অভিনবত্ব পৌঁছে দিয়েছে। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্ররচনায় মুক্তির রাষ্ট্রদর্শন' এই কথাটি পরিচ্ছন্নভাবে বুঝিয়েছে যে কবি প্রোফেশ্যনলভাবে রাজনৈতিক আর দার্শনিক ছিলেন না কিন্তু 'ব্যক্তি' ছেড়ে 'মানুষের' মুক্তি-সন্ধান যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিকত্ব প্রমাণ করে, তাহলে 'মানুষের ধর্ম'-লেখক রবীন্দ্রনাথও আধুনিক চিন্তার সূত্র দিয়ে গেছেন। অর্থনীতির প্রসঙ্গে শ্রীভবতোষ দত্তের 'আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ' অত্যন্ত পরিষ্কার ও গোছানো লেখা। আধুনিক কালের 'কম্যুনিটি প্রজেক্ট' ব্যবস্থার যে মূলনীতি, তা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বুঝেছিলেন এবং সে জন্যই কম্যুনিটিকে স্টেটের চেয়েও বড় বলে মানতেন। "স্বদেশী সমাজ" "সমবায় নীতি" এবং "রাশিয়ার চিঠি" থেকে আর্থিক উন্নতির কার্যকরী উপায় ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে কবির ধারণা, কর্মপদ্ধতি এবং ক্রমিক নৈরাশ্যের একটি পূর্ণ পরিচয় লেখক উপস্থাপিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধ সম্পর্কে আছে তিনটি রচনা—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় ঐতিহ্য', শ্রীগোপাল হালদারের 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগচেতনা' এবং

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা'। প্রথম প্রবন্ধে লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পটুতায় কবির ইতিহাস-প্রীতিজাত ভারতের ঐতিহ্য-সন্ধান, নানা চেষ্টা ও ঔৎসুক্য আর বিস্তারিত চর্চা ও চিন্তার ফলে যে সব সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছিলেন, প্রবন্ধকার তারই ধারাবাহিক পরিচিতি দিয়েছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের সামগ্রিক রূপ গঠন আর ঐক্যসাধনা সংস্কৃতিবান কবির কাছে পরম লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল—এইটাই লেখকের মূল বক্তব্য। শ্রীগোপাল হালদারের প্রবন্ধে তাঁর বিষয়ানুগ 'অ্যাপ্রোচ' বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবির যুগচেতনাকে ও তার বিবর্তনকে ঐতিহাসিক প্রণালীতে তিনি বিচার করেছেন। রবীন্দ্রমানসের পটভূমি নির্ণয় করে তিনি একেকটি পর্বে বিভিন্ন ঘটনা ও সমস্যার সংঘাত ও প্রভাব দেখিয়েছেন কবির জাগ্রত ও গ্রহিষ্ণু চিত্তে। শেষে দেখিয়েছেন, "কালান্তরের" প্রবন্ধাবলী থেকে "সভ্যতার সংকট" পর্যন্ত শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের যুগচেতনা মানবতার পরম সত্যে এসে পৌঁছেচে। গোপাল হালদারের লেখায় মুন্সিয়ানার প্রশংসা করতেই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি ত্রুটির উল্লেখ করা চলতে পারে। এ প্রবন্ধটিতে বিভাগ-বিশ্লেষণ পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণতার সৃষ্টি করতে পারে নি, যা আশা করা গিয়েছিল। সে তুলনায় লেখক হিসাবে কম অভিজ্ঞ হয়েও শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁর প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়কে আরও বিস্তারিত অথচ বিন্যস্ত করতে পেরেছেন। পড়ে মনে হয় লেখক খুব যত্ন নিয়ে লিখেছেন, ভেবেচিন্তে কবির ইতিহাস চিন্তা ও চর্চার এক একটি বিষয়সূত্র ধরে এগিয়েছেন। তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের অভাব ঘটেনি, আর সেই সঙ্গে রচনাটি স্বাভাবিক গতিতে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। উদ্ধৃত উত্তরগুলির গোলকধাঁধায় কোথাও খেই হারিয়ে যায় নি। বিষয়টির মধ্যে জট আছে, কিন্তু লেখায় নেই।

এদিক থেকে তৃপ্তিদায়ক এবং পরিপূর্ণ প্রবন্ধ শ্রীপরিমল গোস্বামীর 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান'। গোপাল হালদারের দৃষ্টি ও লেখার ভঙ্গীর সঙ্গে এ রচনার মিল আছে। আলোচনাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, তথ্যনির্ভর, যুক্তিবাদী এবং আশ্চর্যভাবে রসিত। এ ধরনের রচনা অনেকদিন পড়বার সৌভাগ্য হয়নি। এর মধ্যেও পর্ববিভাগ আছে, বিজ্ঞান-চেতনা বিজ্ঞান প্রীতি এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকামনার ক্রমিক বিবর্তন ও ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখকের দৃষ্টি একাগ্র, ছোট ছোট বাক্যসমষ্টিতে বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার। তথাকথিত অতীন্দ্রিয়বাদী কবির দৃষ্টি ও সৃষ্টির আনন্দ যে বিজ্ঞানী রীতিতে ছোটকে বড়র সঙ্গে, জানাকে অজানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার আনন্দ—এই জায়গাগুলি লেখক গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে লিখেছেন। বিশেষ করে ভালো লেগেছে এ প্রবন্ধের এই কয়টি অংশ—দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ সত্য, উপমায় বিজ্ঞান, একই সত্যের দুটি দিক, বিবর্তনে বিশ্বাস কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ আর বিজ্ঞানে কবিমানসের বিস্ময়কর ব্যাপ্তি। বিস্ময়-প্রকাশ অবৈজ্ঞানিক কিন্তু বিস্ময় যেমন কাব্যের উৎস, তেমনি বিজ্ঞানের অন্ততঃ প্রেরণা। বিস্ময়ে অভিভূত হলে বৈজ্ঞানিক হয়তো মেটাফিজিকস্-এর দিকে ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু কবির সে ভয় নেই। তাই জড়ের মধ্য থেকে প্রাণোদ্গম আর খণ্ড খণ্ড বিচিত্রের মধ্যে অখণ্ড ঐক্য বোধের আনন্দে গান গেয়ে উঠতে তাঁর দ্বিধা নেই।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম' সম্বন্ধে, আর জাতীয় জীবনের সংগঠক হিসাবে তাঁর ভূমিকা নিয়ে দুটি প্রবন্ধ পেলে যেন এই প্রচেষ্টা আরও সার্থক লাগত। যদিও এ দুটি বিষয় প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু স্বতন্ত্র ও একাত্মভাবে হয় নি। 'ধর্ম' বলতে কবি কে বুঝতেন, ধর্মচেতনা তাঁর জীবন ও শিল্পকে কতটা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত



করেছিল, 'পার্সোনাল' কিংবা 'অর্গ্যানাইজড রিলিজ্যন'—কোন্ দিকে তাঁর আস্থা ছিল, এই সব নিয়ে একটি পৃথক আলোচনা আর জাতীয় জীবন সংগঠনে কবির কংক্রীট দান, তাঁর কর্মসূচী এবং উক্তিগুলির সম-গ্রন্থন থাকলে "রবীন্দ্রায়ণ" যেন সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারত।

**বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**

**রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ** (১ম খণ্ড)—প্রফুল্লকুমার দাস। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা-২৯। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ ন.প।

রবীন্দ্রসঙ্গীত অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ে পড়ে—কি কোন নূতন শ্রেণীর অন্তর্গত এই নিয়ে বাদানুবাদ ও বিচার-বিশ্লেষণের এখনো শেষ হয়নি। মনে হয় শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের সমাবেশ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও রবীন্দ্রসঙ্গীত তার কথা, সুর, ছন্দ ও বিকাশ বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণী গঠন করেছে যদিও সে শ্রেণী ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন বিচিত্র বিষয়ে ভারতেরই ভাব ও আদর্শকে বহন করে। তাঁর গানে আছে তাই বৈচিত্র্যের বিন্যাস, কিন্তু একত্বের অখণ্ড অনুস্যূতি এবং অপার্থিব আনন্দলাভের আকুলতা। সুর ও কথার সামঞ্জস্য দিয়ে তিনি অর্ধনারীশ্বর রূপের করেছেন গঠন এবং রস ও ভাবের মধ্যে এনেছেন সুসঙ্গতি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক গ্রন্থই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে করে তাঁর গানকে বোঝার বা গানের ভাব ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার পথ সুগম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন সঙ্গীত সাধক, রসিক ও পরমপ্রেমিক। সঙ্গীত-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে গান-রচনার ধারাও ছিল তাঁর মধ্যে উৎসারিত। প্রতিভাবান গানরচয়িতা তিনিই হতে পারেন যিনি গানসাধনার সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রেরণায় গা ভাসিয়ে নূতন ছন্দে গান রচনা করতে পারেন। নূতন রচনার মাঝেই রচয়িতার প্রতিভা করে আত্ম-প্রকাশ এবং সঙ্গীত-সাহিত্যের ভাণ্ডারও হয় ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

বর্তমান আলোচ্য "রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ" গ্রন্থটির আলোচনা একটু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। গ্রন্থের আলোচনাভঙ্গি সাধারণত একটু ক্ল্যাসিক্যাল স্পর্শযুক্ত এবং শাস্ত্রপন্থী—যা সচরাচর রবীন্দ্রসঙ্গীতের গ্রন্থ-সমালোচনার ক্ষেত্রে চোখে পড়ে না। বর্তমান গ্রন্থটিকে তাই চিরাচরিত ধারার একটু পরিপন্থী বলে মনে হওয়াও বিচিত্র নয়। অথচ স্বাধীন ও সঠিক আলোচনা-শৈলীকে পরিপন্থীই বা বলি কেমন করে।

"রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গে" রচনার সূচনায় গ্রন্থকার সাতটি পাঠক্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তারমধ্যে ছটি ক্রিয়াসিদ্ধ অংশ ও একটি তত্ত্বসিদ্ধ অংশ। শাস্ত্র ও সাধনা নিয়ে সকল দেশের সকল জাতির গ্রন্থ রচিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও যে শাস্ত্রজ্ঞানের উপযোগিতা আছে গ্রন্থকার একথা বলেছেন এবং আমরাও সর্বতোভাবে স্বীকার করি। অনেকের মতে রবীন্দ্র-নাথ ব্যাকরণের বন্ধন এড়িয়েছিলেন বলে তাঁর গান এত স্বচ্ছন্দবিহারী ও লীলায়িত হতে পেরেছিল, আর তারি জন্য সুরের গতি হয়েছিল স্বাধীন। কিন্তু ব্যাকরণের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনার অবতারণা বিশেষভাবে না করলেও তিনি যে একটু সুনিবন্ধ নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন একথা তাঁর বিচিত্র আলোচনার মধ্য থেকে জানা যায়। উচ্ছৃঙ্খলতা ও নিয়মহীনতাকে

তিনি কোনদিন কোন বিষয়ে স্থান দিয়েছেন বলে আমরা মনে করি না। তাছাড়া তাঁর গানের কাব্যধর্মী কথা, সুর ও তাল শাস্ত্রসঙ্গত ছিল, সুতরাং তাঁর গানে ব্যাকরণের জটিলতা প্রকাশ্যভাবে স্থান না পেলেও নিয়মানুবর্তিতাকে তিনি তাঁর জীবনে ও সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়ে গ্রহণ করেছিলেন একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। তাই তাঁর সঙ্গীতের কথা বা সাহিত্য এবং সুর বা রাগ-রাগিণীদের সম্যক পরিচয় পেতে গেলে শাস্ত্র তথা ব্যাকরণ-চর্চার প্রয়োজন আছে বৈকি। তাই গ্রন্থে তত্ত্বসিদ্ধাংশের সমাবেশ করে শিল্পরুচিসম্পন্ন গ্রন্থকার রচনাসৌষ্ঠবেরই পরিচয় দিয়েছেন, অসঙ্গতি কিছু সৃষ্টি করেন নি একথা বলতে পারি।

তত্ত্বসিদ্ধাংশের আলোচনায় গ্রন্থকার একেবারে প্রচলিত নিয়ম-কানুনকে হুবহু অনুসরণ না করে বিচারী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারাকে বেশীর ভাগ অনুসরণ করলে বোধ হয় আরো সুসঙ্গত হত। অবশ্য দু-একটি জায়গায় যে তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি তা নয়। যেমন রাগ পূরবী তথা পূর্বীর প্রসঙ্গে বলেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ পূর্বীরাগের গানে শুদ্ধধৈবত ব্যবহার করেছেন। আবার একই গানে দুই-ধৈবতযুক্ত পূর্বীরাগের ব্যবহার করেছেন.....।' বাঙ্গালাদেশে 'পূর্বী' পূরবী নামে পরিচিত এবং শুদ্ধধৈবতকে নিয়েই সার্থক। রাগ আসাবরীর বেলায়ও গ্রন্থকার বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ আসাবরীরাগের গানে কোমল-ঋষভ ব্যবহার করেছেন।' কিন্তু কেন ব্যবহার করেছেন সেকথা তিনি কোন জায়গায় বলেন নি। এরকম শাস্ত্রসঙ্গত রাগে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন মনোবৃত্তি ও সৃজনীশক্তি নিয়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী স্বতন্ত্র ধারাকে যে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন একথা বলা বাহুল্য।

গ্রন্থকার মাত্রা, ছন্দ ও তাল পর্যায়ে সুন্দর সুসঙ্গত আলোচনা করেছেন যা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিক্ষার্থী ও পথচারীদের একান্ত প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় ও সৃজনশক্তিতে যে মৌলিকতার স্পর্শ ছিল একথা বলাই বাহুল্য। রাগ, তাল, ছন্দ, মাত্রা সকল বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রাচীন ধারায় অনুসরণ করেছেন তেমনি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নূতনতারও আশ্রয় নিয়েছেন। অচলায়তনের বিরুদ্ধে চিরদিনই তাঁর সংগ্রাম, তাই চলা-পথকে গতিরুদ্ধ্বল করতে এবং নূতন পথচলাকে সম্মান ও সম্মতি জানাতে তিনি কসুর করেন নি। রবীন্দ্রনাথ হয়তো ছন্দের বেলায় একেবারে নূতন সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার প্রয়োগ ও বিকাশের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গ্রন্থকার ৬২ থেকে ৭১ পাতা বিভিন্ন তালের ছন্দ ভাগ করে পরিচয় দিয়েছেন যাতে করে শিক্ষার্থীদের পথ-প্রদর্শকের কাজ করবে।

অষ্টম পাঠক্রমের তত্ত্বসিদ্ধাংশপর্যায়ে তিনি বর্ণ, কাকু, রাগালাপ, রাগের প্রকারভেদ, রাগসঙ্গীতে গানের শ্রেণীবিভাগ, এবং গীতিশ্রেণী হিসাবে ধ্রুবপদ, হোরী বা ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, তেলেনা, ত্রিবট প্রভৃতি পরিচয় দিয়েছেন। 'মূল হিন্দী গান ও ভাঙা রবীন্দ্র-সঙ্গীত' পর্যায়ে তাঁর আলোচনা আরো তথ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী রচিত "রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম" গ্রন্থের পর ঠিক এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এ সম্বন্ধে আলোচনা কেউ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ হিন্দী গানের অনুসারী হয়ে অনেক গান রচনা করেছেন, কিন্তু তাই বলে সেগুলি হুবহু অনুসরণ নয়, সেই অনুসৃত রচনার মধ্যে ব্যক্তি ও রচনা-স্বাতন্ত্র্যের স্পষ্ট ছাপ বর্তমান। "রবীন্দ্রস্মৃতি" গ্রন্থে স্বর্গীয়া ইন্দিরাদেবী বলেছেন অনেক পুরাতন বাংলাগানের অনুসরণ করেও রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছিলেন



("সঙ্গীত-স্মৃতি" দ্রষ্টব্য), কিন্তু তাঁর রচিত গানগুলির মধ্যে রচনাচাতুর্য আরো সুস্পষ্ট। "রবীন্দ্রসঙ্গীত-প্রসঙ্গে"র গ্রন্থকার প্রফুল্লকুমার দাস ১১৫—১১৭ পৃষ্ঠায় মূল হিন্দী গানের পাশাপাশি ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেকগুলি গানের পরিচয় দিয়েছেন এবং তাদের বেশীর ভাগই সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থ থেকে নেওয়া। বিষ্ণুপুর-ঘরাণার গানগুলি যে উৎস থেকেই সংগ্রহ করা হোক না কেন, তারা যে সেনী ঘরের গানের প্রতিচ্ছবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এথেকে রবীন্দ্রনাথ যে বিষ্ণুপুর-ঘরাণাকেই তাঁর গানে বা গান রচনায় বেশী সম্মান দিয়েছেন তা বেশ বোঝা যায়। তবে তাঁর সঙ্গীতগুরু বিষ্ণু চক্রবর্তীর প্রভাবকে যে তিনি কোনদিনই তাঁর গানে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি একথা স্বীকার্য।

আলোচ্য গ্রন্থে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষঙ্গ', 'গান ও গায়কি', 'সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথের উক্তি' ও 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা' বিষয়বস্তুগুলি গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। গায়কি ও স্টাইল একই শ্রেণীভুক্ত তবে একটি সঙ্গীতে এবং অপরটি সাহিত্যে ও কাব্যে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও যে গায়কি আছে একথা স্বীকার্য এবং এই গায়কির স্বতন্ত্র রূপ বা ধারাকে অনুসরণ করে গানের প্রতিফলন হলে তবেই রচিত গান হয় সার্থক। প্রচলিত ধারায় নিজস্ব সৃষ্টি স্বীকৃত, কিন্তু সেই ধারার গতিরুদ্ধ্বলতা যাতে নূতন সৃষ্টির চাপে মন্থর বা শুষ্ক না হয় তা সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার।

পরিশেষে আলোচ্য গ্রন্থের রূপায়ণে যে মাঝে মাঝে কোন ত্রুটি নাই সে কথা বলি না। যেমন (১) ৫১ পৃষ্ঠায় 'বর্তমানে ষড়্জগ্রামের মধ্যমকে, ভরতোক্ত অবিনাশী, অবিলোপী ও অলঙ্ঘ্য মধ্যমকে, ষড়্জগণ্য করে গায়ণ বা বাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ষড়্জস্থানের এরূপ পরিবর্তনে...' প্রভৃতি আলোচনাগুলি একটু জটিলতার আশ্রয় নিয়েছে সম্ভবত অপর কোন গ্রন্থের হুবহু আশ্রয় করার জন্য। আলোচ্য বিষয় মূল্যবান, কিন্তু ষড়্জগ্রামের রূপান্তর সম্বন্ধে আরো বিশদ আলোচনা না হলে বিষয়টি ঠিক পরিস্ফুট হয় না। (২) ৫৭ পৃষ্ঠায় রাগের জাতি সম্বন্ধে আলোচনাটি আরো তথ্যপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল, কেন না সঙ্গীতশাস্ত্রে 'জাতি' শব্দটি নানানভাবে সার্থক। শ্রুতি, রাগ ও শ্রেণী এই তিনটির বেলায়াই 'জাতি' শব্দটির অন্তর্নিবেশ দেখা যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়ও দেওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে বক্তব্য, রবীন্দ্রসঙ্গীতসম্বন্ধে প্রকাশিত পূর্ব পূর্ব গ্রন্থ অপেক্ষা বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ, ও সাঙ্গীতিক বিষয়ের বিভাজন-প্রণালী ও বিষয়নির্বাচন বেশ নূতন এবং গঠনমূলক। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল ও আঞ্চলিক সঙ্গীত শ্রেণীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, সুতরাং তার অনুশীলন ও অভ্যাসের জন্য শিক্ষার্থীর শাস্ত্র ও সাধনা বিষয়ে সজাগ থাকা দরকার। গ্রন্থের নিজে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ও উচ্চাঙ্গ ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে অভিজ্ঞ থাকার জন্য গ্রন্থের রচনা, পরিকল্পনা ও রূপায়ণকে এত সবল ও সফল করতে সমর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুশীলন ও অভ্যাসকে তিনি আরো বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করায় সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন বলে আশা করি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিক্ষার্থীগণকে আমরা নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও বিচারশৈলী অনুসরণ করতে অনুরোধ করি।

**স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ**

Gitanjali *By* Rabindranath Tagore. Macmillan & Co Ltd., London. Rs 3.00.

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডনের ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রথম প্রকাশ করেন। য়ুরোপের পাঠকদের কাছে সেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব। ইংরেজী ভাষী এবং সমগ্রভাবে য়ুরোপের উপর এই অপূর্ব ধর্মগীতিগুলির কি প্রভাব হয়েছিল সে কথা এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে অন্যরা বলেছেন এবং বলবেন। আমার স্বদেশে অর্থাৎ আইসল্যাণ্ডে গীতাঞ্জলির আবির্ভাব এবং আমার উপর তার প্রভাবের কথাই আমি বলব, কেননা আমার শুধু সে কথাই বলবার অধিকার আছে।

গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হবার চার বছর পরে এড্ডা এবং সাগার কবিত্বময় আইসল্যাণ্ডের ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হল। অনুবাদ করেছিলেন ম্যাগনাস আরনাসন নামে একজন প্রতিভাধর সাহিত্যপ্রেমিক যুবক, তিনি তখন আমেরিকায় বাস করতেন। একখানা ছোট, সুন্দর বই হয়ে গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হল এবং বইখানি আমার হাতে যখন প্রথম পৌঁছল তখন আমার বয়স পনেরো। আর তৎক্ষণাৎ তার বহুদূর থেকে ভেসে আসা বিচিত্র সূক্ষ্ম সংগীত আমার কৈশোরোচিত ধার্মিকতার গভীর মর্মে প্রবেশ করল। আমি আজো কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে মনের অন্তরতম গহনে তার ধ্বনি শুনতে পাই।

যেমন য়ুরোপের তেমনি আমাদের দেশের পাঠকদের কাছেও গীতাঞ্জলি একটি আশ্চর্য সুন্দর ফুলের রূপ এবং সৌরভ নিয়ে দেখা দিয়েছিল যে ফুল আমরা আগে কখনো দেখি নি। গীতাঞ্জলির অনুপ্রেরণায় বহু কবি কাব্যধর্মী গদ্যরচনার পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সুদূর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতেও কাব্যধর্মী গদ্যের যে প্রচলন শুরু হয়েছিল তার উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমিও যৌবনে সে ধরনের রচনা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সফল হতে পারি নি। আমি সেদিন বুঝিনি যে গীতাঞ্জলির প্রকাশভঙ্গী বা ফর্ম তার মর্মকথা বা বিষয়বস্তুর তুলনায় গৌণ। আমার মনে হয় যে একথা বোঝেন নি বলেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ য়ুরোপীয় ভক্তের অনুকরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। রবীন্দ্রকাব্যের যে নৈসর্গিক ভিত্তি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উষ্ণ আবহাওয়া ও প্রাণবন্ত প্রকাশ য়ুরোপে নাই। পরিবেশের এ পার্থক্যের দরুণ গীতাঞ্জলির সমধর্মী কাব্যসৃষ্টি য়ুরোপে সম্ভব হয় নি। গীতাঞ্জলির কবিতায় ঐশী প্রেরণার প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু তা এক ভিন্নতর আবহাওয়া দ্বারা নির্দিষ্ট অর্থাৎ এক ভিন্নতর সভ্যতার সৃষ্টি। ভারতবর্ষে যে মানুষটি গাছের ছায়ায় বসে আছে ভগবান তার কাছেও উপস্থিত। গৌতম বুদ্ধের চোখে যে দৃষ্টি, অর্ধনগ্ন পথচারী ফকিরের চোখেও সে দৃষ্টির পরিচয় সে দেশে মিলতে পারে। আমাদের দেশে খোলা মাঠে বসে ভগবানের চিন্তা করতে গেলে ঠাণ্ডায় জমে যাবার অথবা ঝড়ে উড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

রবীন্দ্রনাথের ভগবান আশ্চর্য; তিনি বন্ধু, তিনি প্রেমিক, তিনি পদ্মফুল, যে অপরিচিত বিদেশী নদীতে নৌকো ভাসিয়ে বাঁশি বাজিয়ে চলে তার মধ্যেও ভগবানের প্রকাশ। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ইহুদীদের বাইবেল বিষয়ক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভগবানের তুলনা পাওয়া যাবে, চীন দেশের তাও-তেহ কিংয়ের মধ্যেও কখনো কখনো তাঁর পরিচয় মিলবে, কিন্তু মধ্য যুগের পরে য়ুরোপে তাঁর ঠিকানা মেলে না। সে যুগে সন্ন্যাসীরা



প্রকৃতির খোলা হাওয়া থেকে, তার গন্ধস্পর্শ থেকে দূরে, গীর্জার অন্ধকার বন্ধ ঘরে সাধনা করতেন,—সেই কৃচ্ছ্রসাধনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ অনুভূতিও যেন লোপ পেয়েছে। আজকাল য়ুরোপের ভগবান হয় জগৎজোড়া কোন ফার্মের ডিরেক্টর অথবা শিশুর খেলার জগতের কল্পনার সঙ্গী। মৃত্যুকালে অথবা বিপদের সঙ্গীন মুহূর্তেই আমরা তাঁকে স্মরণ করি। হয়তো সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের এই বাস্তব আত্মিকবোধ য়ুরোপের মানুষের মনে বহুকাল বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। প্রাচ্যের তুলনায় আমাদের পার্থিব সম্পদ অনেক বেশি। সে ঐশ্বর্য থেকে আমরা বঞ্চিত কিন্তু গীতাঞ্জলির গানে কবি বলেছেন 'যাবার বেলা এই কথাটাই বলে যেন যাই, যা দেখেছি, যা শুনেছি তুলনা তার নাই'—সে গানে অন্তরের যে ঐশ্বর্য প্রকাশিত, সে তুলনায় আমরা নিঃস্ব।

**হ্যালডর ল্যাক্সনেস**

**রবীন্দ্রনাথ : শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন**—গোপাল হালদার সম্পাদিত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড। কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা

দশটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে দশজন লেখক আলোচনা করেছেন, এবং সেই সংগ্রহ সম্পাদনা করে 'নিবেদন'-এ শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার জানিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় তো বটেই—ব্যাপক ক্ষেত্রে, এশিয়া-আফ্রিকার নব জাগরণের সমকালীন অনন্যসাধারণ এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্য দিয়ে তাই আমরা আমাদের কালের সঙ্গে কালান্তরের সংযোগ অনুভব করি,—'ভাবী কালের আভাসও আমরা লাভ করি'। এই অপরিসীম পরিব্যাপ্তি এবং অপরিসীম গভীরতার তত্ত্ব কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। সম্পাদক নিজেই জানিয়েছেন—'আয়োজন সংকল্পানুযায়ী সুসম্পন্ন হল না। রবীন্দ্র-প্রতিভার কোন কোন প্রধান দিক অনালোচিত রইল, অন্য কোনো কোনো দিকেও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর হয়নি, আলোচনায় ক্রমভঙ্গও অনিবার্য হয়ে পড়েছে।'

এরকম বিপুল ক্ষেত্রে যা ঘটা স্বাভাবিক, তাই ঘটেছে। সেজন্যে কুণ্ঠা নিষ্প্রয়োজন। যাঁরা আলোচনায় যোগ দিয়েছেন, তাঁদের গ্রন্থীত বিষয়গুলি যথাক্রমে এই : 'সার্বভৌম কবি' লিখেছেন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের চিত্ররূপ ও প্রতীক'; শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখাটির নাম 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস'; শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'; শ্রীবিষ্ণু দের লেখাটির নাম 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ'; শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সংস্কৃতি'; সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদার নিজে লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা'; শ্রীসুশোভন সরকার লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার নবজাগরণ'; শ্রীচিন্মোহন সেহানবিশের প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা'; আর, শেষ লেখাটি শ্রীহিরণকুমার সান্যালের 'রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গে'। এই প্রবন্ধ-সংগ্রহের প্রারম্ভে আছে শ্রীযামিনী রায়ের আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির প্রতিলিপি।

'সার্বভৌম কবি' প্রবন্ধে হীরেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আধুনিক কালে মানুষের চিরন্তন

মহিমা রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে সৌকর্যে ব্যক্ত হয়েছে, তার তুলনা নেই; তাঁর মননের এবং কল্পনার ব্যাপ্তি অতুলন; তীব্রতা আর গভীরতার স্বাদও সেখানে অপরিসীম—তবে, তাঁর নিজের কথায়—'মহাকাশে সংখ্যাহীন গ্রহ-নক্ষত্র বিলীন হয়ে গেলেও প্রকৃতির হানি হয় না, কিন্তু পূর্বের দিকে তাকিয়ে ঘাসের যে প্রতিটি ডগা রোজ হেসে ওঠে সেখানে অসীম হৃদয়ের সকল যত্ন এবং কৌশল অবস্থিত না থাকলে তো চলে না। এই তীব্রতা আর গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবির সারিতে না বসিয়ে তাদেরই কাছে, কিন্তু একটু নামিয়ে, জায়গা দেওয়াই হয়তো সমীচীন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে শেক্সপীয়রের মতো যিনি প্রায় প্রশ্নাতীত, তাঁর লেখাতেও গলদের অভাব নেই—এ বিষয়ে ড্রাইডেন, ভল্‌তেয়র, জন্‌সন্‌ প্রমুখ গুণীর বক্তব্য স্মরণীয়।'

প্রধানত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে হীরেন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধাই এ-প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে, তবু এই ধরনের উক্তি একবার নয়,—একাধিকবার ঘটেছে। যেমন তিনি বলেছেন: রবীন্দ্রনাথ কবিতার ক্ষেত্রে 'বিশ্বরূপ দর্শন' করতে পারেন নি,—'শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর যে-রকম 'দৃপ্ত, প্রসন্ন পদক্ষেপ', কবিতার ক্ষেত্রে সে-রকম নয়, এই ধরনের মন্তব্যও আছে। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে শেক্সপীয়র এবং দান্তের চেয়ে একটু নিম্নেশ—'রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে যে এই স্তরের মহাকবিকে স্মরণ করতে হয়, এটাই তাঁর মহত্ত্বের এক প্রমাণ, কিন্তু তাঁদের মহিমা রবীন্দ্রপ্রতিভায় আবৃত হয়েছে কল্পনা করা অসমীচীন।' 'বলাকা'র কোন্‌ কোন্‌ কবিতা যুদ্ধের আগে লেখা, কোন্‌গুলিই বা পরে লেখা, সে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'মহাকবিত্বের যদি কোনো পরীক্ষা থাকে তো "বলাকা"র সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাকে উত্তীর্ণ হয়ে বহুদূরে চলে গেলেন।' তাঁর পরবর্তী কাব্যধারায় ছন্দ আর বিষয়বস্তুর নতুনত্বও লক্ষ্য করেছেন হীরেন্দ্রনাথ, আবার, "পূরবী"তে যে ভূরি পরিমাণে 'সার্থক ও সুশোভন পুনরুক্তি' ঘটেছে, সে-কথাও বলতে কুণ্ঠিত হন নি। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচক-সত্তার প্রসঙ্গও উঠেছে,—অন্যান্য কথাও দেখা দিয়েছে, যদিও কবিসত্তার আলোচনাই এ-প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁরা উগ্র রবীন্দ্র-ভক্ত, তাঁদের এ লেখাটি উত্তেজিত করবে, সন্দেহ নেই। তবে, উগ্রতা এক-এক রকম মেজাজের লক্ষণ,—সকলের মেজাজ সমান নয়। অতএব হীরেন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিগত মন্তব্য যাঁরা উগ্রতর মন্তব্যে চিহ্নিত করবেন, তাঁদের কাছে হীরেন্দ্রনাথের এই কথাটিও পুনরায় নিবেদন করা দরকার যে, 'রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের প্রত্যাশার অন্ত নেই বলেই যেখানে যে কবির কোনো বিশিষ্ট উৎকর্ষের দিব্য জ্যোতি দেখি, তখনই মন সন্ধান করে রবীন্দ্রকাব্যে কোনো অনুরূপ সিদ্ধির আশায়। কিন্তু মহামহীরুহের মহিমারও তো সীমা আছে।' এই সীমা-সচেতনতার দিকে এ-সংকলনের একাধিক লেখকের ইশারা একটু বিশেষভাবেই চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্প ও প্রতীকের আলোচনায় সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'কড়ি ও কোমল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রয়াসে যে খঞ্জতা, তার মূলে কবির কল্পনার অপ্রস্তুতি।' "সোনার তরী"তে পৌঁছেই 'সচল অভিজ্ঞতাকে তাঁর কবিমানস যে প্রথম স্থায়িভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে, সেটা বোঝা যায়। এই তাঁর বিশ্বাস। সোনার তরী-ছিন্নপত্রের সময়টাকে তাই তিনি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ বলে মনে করেছেন। 'সোনার তরী' কবিতায় তিনি 'রূপক-নির্মাণের সাহসিক অভিনবত্ব' লক্ষ্য করেছেন। সোনার তরীতে 'যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী' উক্তিতে পাকাধানের সোনালী সমারোহ বিলুপ্ত হবার যে বেদনা ব্যক্ত হয়েছে,



সেই বেদনার দিকে তর্জনী তুলে, লেখক দেখিয়েছেন 'সোনার ধানের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই স্মৃতি রবীন্দ্র-মানসের সমগ্রে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে অতঃপর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদ-কল্পনায় স্বর্ণবর্ণ স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসাবে আকৃষ্ট হয়েছে।...স্বর্ণবর্ণ "সোনার তরী"-"চিত্রা" পর্যায়ে বহু ব্যবহৃত বর্ণ-প্রসঙ্গ।' এবং এই ধারাক্রমে এগিয়ে গিয়ে, তিনি 'সোনার তরী'র হৃদয় যমুনা', 'পরশ পাথর', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় আর "চিত্রা"র 'দিনশেষ'-এ রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গতাবোধের রূপক-শোভার কথা স্মরণ করেছেন। অতঃপর 'বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাত'-জনিত রূপক 'রাজা', 'প্রভু', 'শিব', 'রুদ্র' ইত্যাদির কথা উঠেছে। একই আবেগে 'ঝড়'-রূপকের এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সংকেতের কথাও বিবেচ্য। সোনার তরী-চিত্রার পরে "ক্ষণিকা"কে তিনি যে অসামান্য রচনা বলে উল্লেখ করেছেন, সরোজবাবুর সে-মন্তব্য খুবই সংগত হয়েছে। "বলাকা"র 'চমকে-ঝলকে'র সঙ্গে "ক্ষণিকা"র 'নদী-জলে পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে'—উক্তির অনুভূতিগত অন্বয়ের ভাবনাও সংগত। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান সম্পূর্ণ করে তোলা সময়সাপেক্ষ কাজ, এবং ছোটো একটি প্রবন্ধের পাত্রে সব কথা নিঃশেষে বলাও সম্ভব নয়। 'পরিশেষ'-এর 'জপমালা'—সংকেতের উল্লেখ করে সেখানে রবীন্দ্রনাথের রূপকমননের একটি পরিণতিচিহ্নের ওপর জোর দিয়েছেন লেখক।

বেশ জোরের সঙ্গেই সরোজবাবু বলেছেন—'যে কবিপুরুষ বাংলা সাহিত্যে টেকনিকের রাজা, জীবনকে খুঁজতে খুঁজতে মৃত্যুসিন্ধুর তীরে এসে তিনি সমস্ত অঙ্গাভরণ পরিহার করেছেন। রিক্ততাই তখন হল বাঙ্ময়। রাজা এতদিনে হলেন ঋষি।'

'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' এবং 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' প্রবন্ধ দুটিতেও এই ধরনের বিশ্লেষণপ্রধান ভঙ্গিই ফুটেছে। তবে, এ-দুটির শেষেরটিতেই আলোচনার অপেক্ষাকৃত বিস্তার আছে। দুটি প্রবন্ধই আরো কিছু জায়গা পেলে ভালো হোতো।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে উইলিয়ম আর্চারের মতামতের ত্রুটি দেখিয়ে বিষ্ণুবাবু আরো অনেকের অনেক উদ্ভট মতামতের কথা জানিয়েছেন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ বৈঠকী আলাপের ভঙ্গিতেই এই দরকারী কথাটিও নিবেদন করেছেন যে 'আমাদের কৈলাস-ভাবনায় বাস্তব কখনো রীতির বিন্যাসে আসতে ভয় পায়নি, আমাদের রিয়ালিস্‌ম্‌ ও অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ অঙ্গাঙ্গী।' তিনি যামিনী রায় এবং রবীন্দ্রনাথ, উভয়ের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করে বলেছেন যে, এঁরা দুজনেই ভারতীয় ভূমিতে আধুনিক শিল্পীর মন সঞ্চার করেছেন। প্রসঙ্গত, একটি বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে রেখার অভিযানে এগিয়ে যেতে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পিমন কতো যে উৎসাহী ছিল, ক্লে-র জরনাল থেকে একটি উক্তির উল্লেখ করে, তিনি পাঠককে শিল্পী-রবীন্দ্রনাথের সে-প্রবণতা অনুভব করবার সুযোগ দিয়েছেন। রেখা, রঙ, বর্ণপারম্পর্য, স্থানবোধ—সব দিক থেকেই রবীন্দ্রচিত্রাবলী যে প্রশংসার বিষয়, এই মোট-কথাটা তিনি বলেছেন। কিন্তু উদাহরণ দিয়ে,—অর্থাৎ যোগ্য প্রতিলিপি যোগ করেই এ আলোচনা সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়। প্রকাশক এদিকটায় সচেতন থাকলে ভালো হোতো।

'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে মার্কসবাদী গবেষককে অবহিত হতে বলা হয়েছে। শেষ বাক্যে লেখক বলেছেন, 'মানবতাবাদী ও সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টির সাহায্যে তিনি যে পথের সন্ধান পেয়েছিলেন তাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করে তোলার দায়িত্ব মার্কসবাদীদেরই পালন করতে হবে।' এবং প্রবন্ধের প্রথম দিকেই তিনি বলে নিয়েছেন—'তিনি বুর্জোয়া-শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডীকে অতিক্রম করে অনেকদূর

অগ্রসর হয়েছেন। তিনি লোকসংস্কৃতির প্রবাহে শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল ইতিহাস ও যুগমানসের প্রতিফলন লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত হননি। সেই প্রতিফলনের ধারার মধ্যে যুগে যুগে সামাজিক অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রামের অভিব্যাক্তিগুলিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে লোকমানসের বিদ্রোহের সুরটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।' কিন্তু লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই কথাই কি আসল কথা? বুর্জোয়া, মার্কসবাদ, বিদ্রোহ ইত্যাদি শব্দ কারণে-অকারণে দেখা দিয়েছে—সে শুধু এই প্রবন্ধটিতেই নয়, আরো কোনো কোনো লেখাতে। তাছাড়া, সম্পাদক ঠিকই বলেছেন, অনেক দিকেই বিস্তৃত আলোচনার যতোটুকু দরকার ছিল, ততোটা হয়নি। হিরণকুমার সান্যালের রবীন্দ্র-নাট্য প্রসঙ্গের কথাই ধরা যেতে পারে। মাত্র দশ পৃষ্ঠার মধ্যে বিষয়টির নির্ভরযোগ্য আলোচনা সীমিত রাখা সাধারণ কোনো লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়, এখানে সেই সীমা মেনেছেন বলেই লেখক সুবিচার করতে পারেননি।

যেমন সরোজবাবুর লেখাটিতে, তেমনি চিন্মোহন সেহানবিশের প্রবন্ধে অনুসন্ধানের সেই স্বকীয়তা আছে যাতে পাঠকের লাভের সুযোগ বেশি। সেহানবিশ মশাই ১৮৭৮-এর "কবিকাহিনী" থেকে 'কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে' ইত্যাদি মন্তব্য তুলে বৃহৎ মানব-সমাজে শোষণ আর অত্যাচার সম্পর্কে কিশোর কাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের যে পীড়া-বোধ ছিল, সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে, রবীন্দ্র-জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক চিন্তার প্রসঙ্গে এগিয়েছেন। 'ওরাই পারবে, দানবকে ঠেকাতে পারবে'—রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের 'ওরা'-তে, আর 'বুদ্ধভক্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি কবিতায়,—এবং গল্পসল্পের 'ধ্বংস' ইত্যাদি শেষ পর্বের কয়েকটি রচনার ওপর জোর দিয়ে, শ্রেণীসংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্য সম্বন্ধে লেখক যে-সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাতে রাজনীতির পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে মনকষাকষি ঘটতে পারে, কিন্তু পাঠকের তাতে ক্ষতি নেই, বরং লাভই,—কারণ এরকম লেখায় ভাববার তাগিদ আছে।

শ্রীযুক্ত সুশোভন সরকার একালের বাংলায় বহুলব্যবহৃত 'রেনেসাঁস' কথাটির অপ-প্রয়োগ সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র করে বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন 'উনিশ শতকের উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষমণি', অন্যদিকে তেমনি সে-যুগের সমস্ত পরস্পরবিরোধী ভাবধারায় তাঁর মন আলোড়িত হয়েছে। একদিকে 'পশ্চিমী দৃষ্টি', অন্যদিকে 'প্রাচ্যাভিমান'—westernism আর orientalism দুই-ই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তাঁর মনে। সুশোভন-বাবু সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে, উনিশ শতকের এই দুই অভিমুখিতা 'দুটি অমূর্ত বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণা, দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নয়।' তীব্র পশ্চিমী ভাব অথবা দেশের হিন্দু-সমাজের অভ্যস্ত সংস্কারানুগত্য—প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ দুয়ের কোনোটিরই একান্ত বশীভূত ছিলেন না। তাঁর জীবনে প্রাচ্যাভিমানের প্রথম ঢেউয়ের চিহ্ন আছে তাঁর ১৮৮২-৮৫ সালের লেখাতে। ১৮৮৬-১৮৯৮ সালের লেখায় পশ্চিমী প্রভাবের উল্লেখযোগ্য তীব্রতা লক্ষ্য করেছেন সুশোভনবাবু—এবং সমুচিত দৃষ্টান্ত, উদ্ধৃতি, ঐতিহাসিক কালক্রম ইত্যাদি বজায় রেখে মাত্র তিরিশ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধটিতে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে রামমোহন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ, শতাধিক বছরের বঙ্গসংস্কৃতির নবজাগরণের কথা বলেছেন—যে নিত্য-আবিষ্কারের শীর্ষমণি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ! আর, সম্পাদক হালদার মশাই ঠিকই বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের অঙ্গ।' তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা' প্রবন্ধে হিন্দুমেলার আমল থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের শেষ



অধ্যায় পর্যন্ত প্রসারিত—স্বাদেশিকতা-চিন্তার বিচিত্র স্তরগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে। তিনি সংগত প্রশ্নই প্রকাশ করেছেন—'যে স্বাদেশিকতা তাঁর আদর্শ—যাতে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের সমন্বয়,—তা কি প্রোলেটেরিয়ান পেট্রিয়টিজ্‌ম-এর স্বগোত্র?'

**হরপ্রসাদ মিত্র**

**রবীন্দ্রবিতান**—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। এ মুখার্জি এন্ড কোং। মূল্য পাঁচ টাকা।
**প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ**—অমিয়কুমার সেন। বিশ্বভারতী। মূল্য পাঁচ টাকা।
**রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য**—শিশিরকুমার ঘোষ। মিত্রালয়। মূল্য আট টাকা।
**রবীন্দ্রপ্রতিভা**—কানাই সামন্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। মূল্য দশ টাকা।

সার্থক সাহিত্যের একটা লক্ষণ এই যে সেই সাহিত্য যুগে যুগে নতুন নতুন জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করে। এই নতুন জিজ্ঞাসা থেকেই নতুন সমালোচনারীতিও দেখা দেয়। ভালো সমালোচনার পূর্বে তাই ভালো এবং মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজন। অ্যারিস্টটলের সমালোচনার সামনে এক মহৎ গ্রীক সাহিত্যের আদর্শ ছিল যদিও সেই সাহিত্য পরিধিতে তেমন বিপুল ছিল না। ইংলণ্ডে শেকসপীয়রকে এবং পরে রোমানটিক সাহিত্যকে অবলম্বন করে সাহিত্যসমালোচনার এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন কবি যখন নতুন সৃষ্টি করেন তখন স্বভাবতই পূর্বাভ্যস্ত রুচি স্বাদগ্রহণে বাধা পায় কিন্তু সেই প্রতিরোধকে নিষ্ফল প্রমাণিত করেই সাহিত্যের মহত্ত্ব উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

আমাদের সাহিত্যে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ—দুজনের সাহিত্যেই এই প্রাণশক্তির লক্ষণ আছে। তাই বোধহয় এই দুজনই তাঁদের রচনাকালের আরম্ভ থেকেই আজ পর্যন্ত নানা বিচিত্র সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়েছেন। আমরা নিঃসংশয় হতে পারি অনাগত কালেও তার বিরাম ঘটবে না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্ভাবনার সীমা নেই। কারণ বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের তুলনা নেই। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালব্যাপী সাহিত্য-সাধনা ভাষাভঙ্গিগত এবং কখনও কখনও মতবাদগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে বলেই নানা বিভিন্ন রুচির সম্মুখীন হয়েছে। ইতিমধ্যে নানা চিন্তা নানা প্রভাব নানা পরিবর্তিত মূল্যবোধ জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্নাতুর করেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যসমালোচনা সেই কারণেই বিভিন্ন আদর্শ ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। আমাদের সাহিত্যের ক্ষুদ্র পরিসরে রবীন্দ্রসাহিত্যসমালোচনা থেকেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে সমালোচনাবস্তুটিরও কোনো অপরিবর্তনীয় সূত্র নেই। অন্তত প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যকে যে সূত্র দিয়ে বিচার করা হত, সেই সূত্রের প্রয়োগ পরে চলে নি। সেইজন্যে সমালোচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যতই সহজ হোক, এই বিচারপদ্ধতি বাঙালির মানসিক বিবর্তনের ইতিহাসকেও ব্যক্ত করে। কোন যুগের পাঠক রবীন্দ্রসাহিত্যে কোন্ বস্তু প্রত্যাশা করে, তাই দিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্যও উপলব্ধি করা যায়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকে। কেউ তাঁকে স্বীকার করেছেন, কেউ করেননি; কেউ তাঁকে বঙ্কিমীযুগের মূল্য দিয়ে যাচাই করতে গিয়েছেন; কেউ খাপ খাওয়াতে পারেননি। তখন থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যসমালোচনার ধারা আমাদের

চিন্তাধারারই বৈশিষ্ট্যবাচক হয়ে আছে।

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত "রবীন্দ্রবিতান" বইখানি এই দিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বই। এই বইতে "কবিকাহিনী"র সমালোচনা ('বান্ধব' ১২৮৫) থেকে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন উপলক্ষে প্রমথ চৌধুরীর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে সমালোচনা পর্যন্ত ছাব্বিশটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই ছাব্বিশটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন ও বিরোধিতা দু' রকমই আছে। এই দুটি মনোভাবই আজ আমাদের কাছে যথেষ্ট কৌতূহলের বিষয়। এককালে বাঙালি পাঠক যে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারেনি বা বুঝতে চায়নি সে জন্যে আজ আমরা তাদের দোষ দেব না। তারা একরকম ভাবনায় ও রুচিতে অভ্যস্ত ছিল, সেদিক থেকে তাদের রবীন্দ্রনাথকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে নেবার বাধা ছিল। তারা ছিল বঙ্কিমী যুগের মানুষ যখন শুদ্ধশিল্পবাদ বলতে গেলে আবিষ্কৃতই হয়নি। সাহিত্যকে নীতিমুকুররূপে দেখা তখন সম্ভব ছিল না। এ নীতি অর্থ শুধু চরিত্রনীতি নয়, এ নীতি বলতে সমাজনীতিকেও বোঝাত। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যুগের কাব্য সার্থক কাব্যই হত না যদি না তার মধ্যে স্পষ্ট কিছু বক্তব্য থাকত। প্রমথ চৌধুরীও তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, তাঁর বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে নাকি 'কি-জানি-কি'র কবি বলা হত। শুধু হৃদয়ের একটা অস্পষ্ট বেদনাবিহ্বলতা মাত্র, যা যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, শব্দের অর্থ দিয়ে যাকে সব সময় নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, তারই কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বেশ বোঝা যায় এরকম অনুভবের মর্মে আছে প্রখর আত্মচেতনা। এই আত্মভাব যখন আর সব চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্ন করল, তখন কবি কাব্যে ভাষা না দিয়ে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে "বিবিধপ্রসঙ্গ" নাম দিয়ে আত্মভাবমূলক রচনা লিখেছিলেন, তাও স্মরণীয়।

এই কল্পনাপদ্ধতি সেকালে খুবই অভিনব ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো দু'-একজন রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রশংসা করলেও মানতেই হবে তাঁরা এই কবিত্বরীতির মর্মমূলে প্রবেশ করেন নি। তাঁদের প্রশংসা নেহাতই সাধুবাদ মাত্র। আজ আমরা হয়তো কিঞ্চিৎ বিস্ময়বোধ করি এই কথা ভেবে যে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনাও সেই পরিবেশে এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল। কিন্তু সত্যই তাতে এমন বিস্ময়ের কিছু নেই। সেকালের দিনে যা ছিল কাব্যের রীতি তাকে তাঁরা বর্জন করে রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিয়েছিলেন একথা বলা চলে না। প্রচলিত কাব্যরীতি ছিল হেমচন্দ্রীয়। হেমচন্দ্রীয় ও রবীন্দ্রীয় রীতির মধ্যে ব্যবধান যে কতো গভীর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্যত্র আছে। হেমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতেই পারতেন না। হেমচন্দ্রের এই স্বীকারোক্তি মন্মথনাথ ঘোষ সংকলিত করেছেন হেমচন্দ্রের জীবনীতে। শুধু তাই নয়, কামিনী রায়ের "আলো ও ছায়া" নামক কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন হেমচন্দ্র। তাতে তিনি কামিনী রায়ের কবিতায় 'আজকালকার ছাঁচ' দেখতে পেয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের এই মন্তব্য কামিনী রায় সম্পর্কে আংশিক সত্য হলেও পরমমূল্যবান্। বাংলা কাব্যের যে ঋতুবদল ঘটতে আরম্ভ করেছে—হেমচন্দ্রের মন্তব্য তারই অভ্রান্ত নিদর্শন। হেমচন্দ্রীয় ও রবীন্দ্রীয় রীতির অত্যন্ত সুষ্ঠু তুলনা করেছেন যদুনাথ সরকার আলোচ্য গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে।

পাঠকসমাজে রুচিভেদ দীর্ঘকাল চলে এলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি সাধুবাদ সত্যকার যুক্তি ও প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। আজ প্রিয়নাথ সেনের সমালোচনা উচ্ছ্বাসপূর্ণ বলে মনে হয় সত্য, তবু তাঁর লেখাতেই রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচনার দুটি মৌলিক রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। রবীন্দ্রকবিমানসের একটা তত্ত্ব



(poetic theory) তিনি নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই তত্ত্ব নির্দিষ্ট হওয়াতে রবীন্দ্রকাব্যের একটা ভিত্তি পাওয়া গিয়েছিল। "মানসী" কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবাদের উল্লেখ করেছিলেন। বলা বাহুল্য এ রকম কোনো সৌন্দর্যচেতনা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এক বিহারীলাল ছাড়া আর কোথাও নেই। সমাজ নয়, নীতি নয়, কল্যাণবোধ নয়—একটা অপূর্ব সৌন্দর্যবোধ যে রবীন্দ্রকবিমানসকে আলোকিত করেছে, প্রিয়নাথ সেনের এই উক্তি রবীন্দ্রসমালোচনার দিগ্‌দর্শন করিয়েছিল। এই সৌন্দর্যবাদের তুলনা আমাদের দেশে নেই পরন্তু এই সৌন্দর্যবাদ দিয়েই ইংরেজিতে উৎকৃষ্ট কাব্যসাহিত্য রচিত হয়েছে। তাছাড়া প্রিয়নাথ সেন ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যের তুলনা করেছিলেন। এই তুলনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আদর্শকেই যে প্রতিষ্ঠিত করল তা' নয়, বাঙালি পাঠকের প্রত্যয় ফিরিয়ে আনল এবং নতুন যুগের রুচি তৈরি হয়ে উঠতে সাহায্য করল। "রবীন্দ্রবিতানে"র অষ্টম প্রবন্ধ মোহিতচন্দ্র সেনের রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকা। মোহিতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ সম্পাদন করতে গিয়ে একটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা লিখেছিলেন। তাতে রবীন্দ্রকাব্যসমালোচনা অধিকতর পরিণত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চিত্ররীতি এবং সঙ্গীতরীতির আভাস তিনিই দিলেন। কবিতার শ্রেণীভাগ করে রবীন্দ্র-কাব্যের বৈচিত্র্যও তিনি দেখিয়ে দিলেন। এই শ্রেণীভাগের দ্বারা এটাও বোঝা গেল যে উৎকৃষ্ট কাব্যের রীতিপদ্ধতি কত আলাদা। তিনি বলেছিলেন, 'তাঁহার অনেকগুলি কবিতা দেবনিশ্বসিতের ন্যায় অহৈতুকী বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধি দ্বারা তাহাদের অর্থ ছাঁকিয়া বাহির করা একপ্রকার দুঃসাধ্য।' এই উক্তির দুটি ফল হয়েছিল। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রমুখ কয়েকজন কাব্যের অস্পষ্টতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। আবার তার উত্তরে অজিত চক্রবর্তী রবীন্দ্রসমালোচনার আর-এক নতুন রীতির ইঙ্গিত দিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত দুটি কারণে সমালোচনা করেছিলেন, কাব্যে দুর্নীতি ও কাব্যে অস্পষ্টতা। দুটি অভিযোগই বাংলা সাহিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দীর রুচির সঙ্গে যুক্ত। 'দুর্নীতি' বলে কোনো কিছু যদি রবীন্দ্রকাব্যে থেকেও থাকে, তবে সেটার উৎস নিশ্চয়ই বাস্তবভাবনামুক্ত সৌন্দর্যবাদে। ফরাসি সাহিত্যে এবং প্রিরাফায়েলাইট ইংরেজি সাহিত্যেও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচর্চার ফলে অনৈতিক রুচি প্রশ্রয় পেয়েছিল। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যেও বস্তুগত চিন্তা ও নীতির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছিল বলে এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদ তখনও আদৃত হয়নি বলে রবীন্দ্রনাথের নতুন কাব্য অনেক দ্বিধার সৃষ্টি করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই মনোভাবেরই প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। অস্পষ্টতার অভিযোগও এর সঙ্গে সম্পর্কিত। যেটা অনুভূতির বিষয় মাত্র, ঠিক বুদ্ধিগ্রাহ্য বা চিন্তাগত নয়, সেটাতে কিছু অস্পষ্টতা আসবেই। নানা ভাবে ভঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় ইশারায় সেই অনুভূতিকে ফোটাতে হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নানা উপলক্ষে বিশেষত "সাহিত্যে"র প্রবন্ধগুলিতে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। পূর্ববর্তী যুগের স্পষ্ট বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্যসর্বস্ব কাব্যরীতির তুলনায় এর পার্থক্যও সহজেই দেখা যায়। কেউ কেউ অনুমান করেন দ্বিজেন্দ্রলালের অস্পষ্টতার অভিযোগ নাকি তাঁর নিজের কাব্যের অতিস্পষ্টতার পরোক্ষ সমর্থন ছাড়া কিছু নয়। একথা সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ দ্বিজেন্দ্র-লালের কাব্য একটা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর স্পষ্ট কাব্যরীতিরই একটা পরিণতি মাত্র।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ সৃষ্টি করে তুলল আর এক শিল্পনিরীক্ষা। অজিত চক্রবর্তী দেখালেন যা উৎকৃষ্ট এবং অকৃত্রিম অনুভূতি মাত্র তাকে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। উৎকৃষ্ট কাব্য অনুভব করায় মাত্র—ব্যাখ্যা করে না। অজিত চক্রবর্তীই কাব্যের মধ্যে কবি-মানস সন্ধানের প্রবৃত্তি জাগালেন। কবির কবিমানসের অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশে আস্থা রেখে নতুন করে এক সমালোচনাবিধি গড়ে দিলেন। এ কবিমানস নিঃসঙ্গ। এই কবিমনটি রসসংগ্রহ করেছে প্রকৃতি এবং জীবন থেকে এবং গড়ে তুলেছে এক আত্মসৃষ্ট অতুল ভাবস্বর্গলোক, তেমনি প্রয়োজনপীড়িত কোলাহলমুখর জীবন ও সমাজের প্রতি কঠিন দায়িত্বের কোনো বন্ধনকেও স্বীকার করেনি। এই ব্যাখ্যার পথ নির্মাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর 'আত্মপরিচয়ে' জীবনদেবতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। অজিত চক্রবর্তীর এই ব্যাখ্যারীতি যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যব্যাখ্যায় এই রীতিই অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। "রবীন্দ্রবিতান"-এর প্রবন্ধ এই যুগ পর্যন্তই সংকলিত হয়েছে। কেননা যথার্থই পরবর্তী কালে আসলে অজিত চক্রবর্তী-প্রবর্তিত রীতিরই কর্ষণ চলেছে মাত্র।

কবিমানসবিচারই যখন সাহিত্যে সমালোচনার নিকষ হয়ে উঠল, তখন তার থেকে বিপিনচন্দ্র পাল যে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, সেই প্রশ্ন কম জোরালো ছিল না। পরবর্তী রবীন্দ্রপ্রশস্তির যুগকে উত্তীর্ণ হয়েও সেই প্রশ্নটি এখনও প্রবল। বিপিনচন্দ্র পালের তীক্ষ্ণ মনীষাকে অবহেলা করা কঠিন যদিও রবীন্দ্রজীবনীকার বিদ্রূপ করে বলেছেন,

'বিপিনচন্দ্র এই প্রবন্ধে ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, ধর্মবোধ, স্বদেশসেবা প্রভৃতি সমস্তই বস্তুতত্ত্বহীন অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বলিতে হয় আজগুবি ও ফাঁকিবাজি। বিপিনচন্দ্র কিভাবে বাক্‌চাতুর্য দ্বারা মহৎ বিষয় ও বস্তুকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই রচনা তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বিপিনচন্দ্র সাহিত্যের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে দেখেন নাই, তিনি তাঁহার জীবনকে ও সাহিত্যকে মিলাইয়া পড়িতে গিয়াছিলেন।'

—রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড (১৩৫৫) পৃ. ৩২৮

বিপিনচন্দ্র পালের এই প্রবন্ধটি "চরিতচিত্রে"র অন্তর্ভুক্ত এবং "রবীন্দ্রবিতানে"ও সংকলিত। এই প্রবন্ধটির উত্তর দিয়েছিলেন অজিত চক্রবর্তী। সুতরাং সেই সব যুক্তি-তর্কের মধ্যে যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু এইটুকুই বলছি যে বাস্তবতার অভাবের কথা এ যুগেও উত্থাপিত হয়েছে যদিও নতুন ভঙ্গিতে নতুন ভাবে।

অজিত চক্রবর্তী প্রবর্তিত সমালোচনারীতির একটি উৎকৃষ্ট ফল অমিয়কুমার সেনের "প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ"। এই বইটি প্রথম বেরিয়েছিল ১৩৫৪ সালে; সম্প্রতি তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অজিতকুমার যেমন কবিমানস অবলম্বন করে কাব্য বিচার করেছেন তেমনি আনুষঙ্গিক কারণে সে-বিচার হয়েছে একটু তত্ত্বঘেঁষা। অবশ্য এককালে সাংখ্য ও বেদান্তের সূত্র ধরে কাব্যের তত্ত্বনির্ণয়ের যে চেষ্টা হয়েছিল, অজিতকুমার সে রকম কিছু করেননি। তিনি রবীন্দ্রমানসেরই একটা তত্ত্ব স্থির করে নিয়েছেন। সীমা-অসীমের তত্ত্ব নামে সেটা পরবর্তী কালে বহুপ্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনোরকম তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে কাব্যরসাস্বাদনের আনন্দে কবিতা আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার সেন। তিনি মনে করেন রবীন্দ্রকবিমানসের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ প্রকৃতিপ্রীতি।



এই প্রকৃতিপ্রীতির লক্ষণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনটিকে যেমন চিনে নিতে পারি তেমনি কাব্যের পরিপূর্ণ মাধুর্যের আস্বাদও পেতে পারি। কথাটা এক হিসাবে ঠিক, কারণ প্রকৃতি রবীন্দ্র-নাথের কাছে কেবল তরুতৃণ নদীগিরি আকাশমৃত্তিকা নয়। মানুষের নৈসর্গিক জীবনটাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতির শান্ত স্বাভাবিক বিকাশের মতোই মানুষের জীবনকে যতক্ষণ বিকাশ পেতে দেখি, ততক্ষণ সে প্রকৃতিরই অঙ্গ এবং সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ অবাস্তব নয়, প্রকৃতি থেকেই সেই চেতনা আহৃত। সৌন্দর্যের একটা কল্পিত রূপ দিয়ে জীবনকে তিনি দেখেননি। ১২৯৮-৯৯ সালে লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

'গোটিয়ের সহিত ওয়ার্ডসওয়ার্থের তুলনা করা যেতে পারে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্যসত্য প্রকাশিত হয়েছে, তা পূর্বোক্ত ফরাসি সৌন্দর্যসত্য অপেক্ষা বিস্তৃত। তাঁর কাছে পুষ্পপল্লব নদীনির্ঝর পর্বতপ্রান্তর সবটাই নব নব সৌন্দর্য উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে। কেবল তাই নয়, তার মধ্যে তিনি একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখতে পাচ্ছেন—তাতে করে সৌন্দর্য অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা লাভ করেছে।'

সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যে সৌন্দর্য জগৎ ও প্রকৃতিরই একটা দীপ্তি ছাড়া কিছু নয়। বলাই বাহুল্য প্রকৃতি কথাটি গ্রন্থকার ব্যাপক অর্থে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সরই তাঁর আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে এসেছে। রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন যুগে প্রায় সব রকম বিষয় এবং সমস্যাই তিনি বিচার করেছেন। যেখানে মানুষের প্রবৃত্তি-বেগ এবং দ্বন্দ্বসংঘাত প্রবল, সেখানে অবশ্য সে প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে সরে এসেছে—প্রকৃতির শান্তি ও সংযম তাতে পীড়িত হয়েছে, সৌন্দর্যও খণ্ডিত হয়েছে। প্রকৃতির এই ব্যাপক চেতনাকে লেখক স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর মাধুর্যপূর্ণ অথচ স্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে প্রচুর উদ্‌ধৃতি সহযোগে বুঝিয়েছেন। ভাষা অনাড়ম্বর বলে হঠাৎ মনে হয় আলোচনায় বুঝি তেমন গভীরতা নেই। কিন্তু বিস্মিত আনন্দের সঙ্গে দেখি রবীন্দ্রকাব্যের ভাব এবং প্রকাশরীতির কোনো জটিল বৈশিষ্ট্যকেই তিনি এড়িয়ে যান নি। প্রকৃতি-চেতনায় উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ, বৈষ্ণব কবি ও কালিদাসের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, সন্ধ্যাসঙ্গীতে বিষাদবোধ ও ভাষার নবীনরীতি, চিত্ররীতি ও সঙ্গীতরীতি, চেতনার ইন্দ্রিয়ান্তরণ, মৃত্যুচেতনা, নারীসৌন্দর্য বর্ণনায় প্রকৃতির সহযোগিতা, সোনার তরী-চিত্রার যুগে সৌন্দর্যবোধের বিশিষ্ট প্রকৃতি, গীতাঞ্জলিতে বর্ষা, গীতিমাল্যে বসন্ত, গীতালিতে শরৎ ঋতুর প্রাধান্য, বলাকায় প্রকৃতির স্বল্প উপস্থিতি, উত্তরজীবনে প্রকৃতির ভিন্ন পরিবেশ 'আমি-বোধ' 'মানবসচেতনতা', মনের নানা অধ্যাত্মসঙ্কট—সবই চমৎকার নিরলংকার ঋজুতায় বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে লেখকের গভীর শ্রদ্ধা প্রশস্তিবাচক বিশেষণ মাত্রে পর্যবসিত হয় নি তেমনি আবার ভাষাও মনোরম ভারসাম্য হারায় নি। কোনো মুদ্রাদোষ কোনো অতিশয়োক্তি কোনো আবেগবন্যা কোথাও যে দেখা যায় নি এটা লেখকের সংগতি-বোধেরই ফল। বরং কোনো কোনো সময় মনে হয়েছে সংযম রক্ষা করে আলোচনার ফলে বক্তব্যবিস্তারে বরং কার্পণ্যই এসেছে। রবীন্দ্রকাব্যের একাধিক ব্যাসকূট তিনি অবলীলা-ক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন। পড়তে পড়তে মনে হয় সত্যকার রসিকের মতোই তিনি 'অন্তরঙ্গসহ রসাস্বাদন' করছেন,—পণ্ডিতের মতো বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হন নি। অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে এই দিক দিয়ে তাঁর মিল আছে। আজকের মননাভিমানী পাঠকের কাছে

এই বিশুদ্ধ রসালাপ পরম তৃপ্তিদায়কও বটে, কেননা মননের আড়ম্বর না থাকলেও মননের বিষয়গুলিকে লেখক কখনোই বাদ দেন নি।

কিন্তু এখনকার সমালোচনার সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে বিশ্লেষণের দিকে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যাঁরা বিশ্লেষণের আড়ম্বর করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে রবীন্দ্রকাব্যে সত্য নেই সত্যাভাস মাত্র আছে, তাঁদের বিশ্লেষণের মানদণ্ড ছিল সমাজনীতি। তাদের বিশ্লেষণে সত্য নেই এ কথা বলব না, কেননা তাঁরা যে ভূমি থেকে এই কথা বলেছিলেন, সে-ভূমিতে এই কথার যৌক্তিকতা আছে কিন্তু আজ আমরা বুঝি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সে ভূমির সৃষ্টিই নয়। অজিত চক্রবর্তী এই নূতন ভূমিটির সন্ধান দিয়েছিলেন। এই নতুন পদ্ধতিতে আবার নতুন বিশ্লেষণ-প্রয়াস দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রমানসের কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ অভিনবত্বকে মেনে নিয়ে নিখিল কাব্যসৃষ্টির মানদণ্ড দিয়ে এ কাব্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগ প্রথম করেন শশাঙ্কমোহন সেন ও পরে মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলালের মধ্যে পূর্বযুগের প্রভাব কিছুটা থেকে গিয়েছে আবার রবীন্দ্র-প্রতিভার মহত্ত্ব-স্বীকারে এবং রসাস্বাদনেও তিনি অসাধারণ। তাঁর 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' প্রবন্ধটি পড়লে দেখা যায় চিত্তাগদা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই অভিযোগ তিনি মানেন যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের পদ্ধতিতে একেবারেই নয়। সমাজসত্যের দিক দিয়ে তিনি চিত্রাঙ্গদা কাব্যের বিচার করেননি করেছেন সামগ্রিক জীবনসত্যের দিক দিয়ে। মোহিতলালের এই পদ্ধতির আভাস "জয়ন্তীউৎসর্গ" গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধেই দেখা গিয়েছিল। পরে বাংলা রবীন্দ্র-সমালোচনার একটি শক্তিশালী ধারা এই পথেই গড়ে উঠেছে। এর মধ্যেও অবশ্য নানা রীতিভেদ আছে। সম্প্রতি-প্রকাশিত শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের "রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য" বইখানি এই পদ্ধতির একটি দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করতে পারি। কি মনোভাব নিয়ে লেখক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তা তাঁর মন্তব্যেই বোঝা যায়—

'আমরা যেন রবীন্দ্রকাব্যবিচারে পাতঞ্জল যোগসূত্র, মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক জড়বাদ বা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের আবর্তে না পড়ি।

বৈপরীত্যের বীজ প্রকৃতিতে নিহিত, বস্তুজগতের অবচেতন পৃথকীকরণে, প্রাণলোকের উদ্‌ভ্রান্ত সংঘর্ষে, চিত্তবৃত্তি ও ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন প্ররোচনায়। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় কাল ও ইতিহাস উপেক্ষিত, ঐতিহাসিক বা দ্বান্দ্বিক জড়বাদের বিচারে শাশ্বত সত্য অস্বীকৃত, ঈশ্বর নিখোঁজ। চেতনা বা ইতিহাসের কোন্ স্তরে এ বিরোধের অবসান ও কোন্ পূর্ণ সত্যের অক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে কাব্য ও জীবনের জন্মলাভ?' (পৃ. ২০)

এই বিরোধের মীমাংসার সন্ধান করতে গিয়ে নতুন বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনার উদ্‌ভব হয়েছে। অধ্যাত্মবাদী বা জড়বাদী উভয়েই তাদের নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রবীন্দ্র-মানসের ব্যাখ্যা করতে গিয়েছেন। নিজেদের মূল্যবোধে অত্যাসক্তির ফলে বিপরীত প্রমাণ-গুলিকে তাঁরা হয় অস্বীকার করেছেন নয় তুচ্ছ করেছেন। কিন্তু যাঁরা আসক্ত নন তাঁরা কি করবেন? তাঁরা বিচার করবেন—

'রবীন্দ্রকাব্যালোচনায় এ ধরনের প্রসঙ্গের অবতারণাকে 'তত্ত্বকথার কচকচি' বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না, কেননা ব্যষ্টি ও সমষ্টির অভিব্যক্তি তার নানাবিধ সম্ভাবনা, শাশ্বত ঐতিহ্যের অস্তিত্ব রবীন্দ্ররচনা স্বীকার করে এবং ঐতিহ্যের অভিব্যক্তির বেদনা ও মহৈশ্বর্য রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণস্বরূপ। রবীন্দ্রকাব্য জীবনের প্রায় সব দিক স্পর্শ করেছে।' (পৃ. ২০-২১)



তাই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনে "প্রান্তিক" ও "প্রান্তিক"-পরবর্তী বিভিন্ন কাব্য আলোচনা করে তিনি কোনো নির্দ্বন্দ্ব সমাধানে উপনীত হতে পারেন নি। তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিচিত্র দিকগুলি কাব্যে গ্রহণ করে নিয়েছেন কিন্তু সব-গুলিকে মেলাতে পারেন নি, বোধহয় মেলানো যায় না বলেই। "প্রান্তিক" কাব্যের অপূর্ব আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন,

'রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার লেখায় সমন্বয় বা দ্বন্দ্ব-খণ্ডনের চেয়ে দ্বন্দ্বের প্রাধান্যই প্রকাশ পেয়েছে বেশি। তাতে তার কাব্যরস কমেনি বরং বেড়েছে। অন্তরাকাশের ছায়াপথ পার হয়ে নবচৈতন্যের আলোকতীর্থে মানবযাত্রার গতি, কিন্তু আকাশপথ আলো-আঁধারে মেশা, মৃত্যু ও মায়ার নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ সেই অন্তরীক্ষলোকে। আশ্চর্য তটস্থ সেই জগতে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেছেন, অথচ তার সম্পূর্ণ মানচিত্র তাঁর করায়ত্ত হয়নি। আত্মিক ও বৌদ্ধিক উভয়সঙ্কটে দোলায়িত রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্বের পথ অতিক্রম করেই আমাদের নিকটাত্মীয়। দুঃখের রাত্রেই তিনি আমাদের অন্তরতম, যদি তাঁকে চিনে নিতে পারি।' (পৃ. ৮২-৮৩)

এই দ্বন্দ্বের তীক্ষ্ণতম কাব্যরূপ ফুটেছে "প্রান্তিকে"। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি মহাশূন্যে জ্যোতির সন্ধানে দৃষ্টি মেলে দিয়েছেন, কিন্তু—

বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ ভৈরব নররাগে
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মূরতি
তাই ফিরাইয়া দিলে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতায় পর্যন্ত এই অজ্ঞেয়তার ছায়া প্রসারিত।

সম্ভবত এই কারণেই শ্রীযুক্ত ঘোষ রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের বিচার আরম্ভ করেছেন "প্রান্তিক" থেকেই যদিও "পুনশ্চ"র গদ্যকবিতা নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করে নিয়েছেন ভূমিকায়। সত্যই, প্রান্তিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যের বিষয় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই। তাই তাঁর রচনায় 'আমি' বা 'আমার' শব্দের ছড়াছড়ি—এটা শ্রীযুক্ত ঘোষ লক্ষ্য করেছেন। এর আগে কাব্যে অনেকটা আমি-নিরপেক্ষভাবে জীবনের কথা এসেছে যদিও রবীন্দ্রমানস চিরদিনই মন্ময়। এখন কবি যেন সচেতনভাবে নিজের চিন্তাভাবনার জাল বুনে চলেছেন। এ কথা সত্য, "পুনশ্চ" কাব্য থেকেই কবিমানসের মোড় ফিরতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু লেখকের দিক থেকে বলা যায় যে "পুনশ্চ" কাব্যে আসলে সে রকম কোনো দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে নি, যে দ্বন্দ্বকে তিনি উত্তরকাব্যের বিশেষত্ব বলে নির্দিষ্ট করতে চান। "পুনশ্চ"র গদ্য-ছন্দ সম্বন্ধেও তার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। লোকজীবনের প্রতি আগ্রহ থাকলেও রবীন্দ্রনাথ লোকজীবনে মিশে যেতে পারেন না, তাই গদ্যছন্দে লোকভাষার চিহ্ন নেই। মোটের উপর পুনশ্চ কাব্য কবিমানসের সাফল্যের জয়চিহ্ন বহন করে না। "পুনশ্চ", "নবজাতক", "সানাই" প্রভৃতি কয়েকটি কাব্যে সাময়িক বা বাস্তবধর্মী বিষয়ের প্রাধান্যও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক জীবনকে ভোলেননি কিন্তু লেখকের মতে 'রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ অনৈতি-হাসিক ততক্ষণই তিনি রবীন্দ্রনাথ। ইতিহাসের সামনাসামনি হলেই তিনি বিভ্রান্ত; নৈতিকতা, অলৌকিকতা অযৌক্তিকতার আড়ালে আশ্রয়প্রার্থী।' (পৃ. ১৩০)

শ্রীযুক্ত ঘোষ এই বইয়ে অনেক বলিষ্ঠ উক্তি করেছেন। পূর্বকাব্যে রবীন্দ্রনাথ অন্তর-তম তর্পণ নিবেদন করেছেন আনন্দপুরুষের পাদপীঠতলে; কিন্তু উত্তরকাব্যে প্রকৃতিদর্শনের আনন্দগাথার পরিবর্তে পাচ্ছি মানবদর্শন। এ কথা সত্য। ব্রাত্য বা অন্ত্যজ মানুষ শুধু

নয় সাধারণভাবে মানবজাতি নতুন আকারে কবিচেতনাকে অধিকার করেছে। এই জন্যে বহু কবিতায় নানাপ্রসঙ্গে মানুষ বা মনের মানুষের উল্লেখ করেছেন কবি। কিন্তু 'মনের মানুষ' কি বাউলের ঈশ্বর? বিস্মিত হলাম লেখক রবীন্দ্রোক্ত 'মহামানব' শব্দটির অর্থ ধরেছেন 'সুপারম্যান' বা মানবত্রাতা। এই সূত্র ধরে তিনি রবীন্দ্রচিন্তার সমালোচনাও করেছেন—

'কবিচিত্তের নিঃসঙ্গতা মহামানব বা নবজাতক কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে। অপরের সাহায্যে মুক্তি, এ চিন্তা কতদূর ভারতীয় তা বিচার্য। রাবীন্দ্রিক মহামানব কবির স্বভাব বা স্বধর্মানুযায়ী গড়ে উঠেছে।' (পৃ. ২২৩)

কিন্তু সত্যই রবীন্দ্রনাথ 'মহামানব' বলতে 'সুপারম্যান' বোঝেন না। তিনি বোঝেন মহামানবজাতিকে। 'ঐ মহামানব আসে' গানটিতে তিনি তাঁর স্বপ্নে-দেখা ঐক্যবদ্ধ, সংস্কার-মুক্ত ব্যক্তিত্ব-বিকশিত মানবজাতিরই জয়গান করেছেন। *Religion of Man* গ্রন্থে সেই মহামানবধর্মই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। "শিশুতীর্থে"র নবজাতককেও শ্রীযুক্ত ঘোষ ধরে নিয়েছেন কোনো অতিমানবের কল্পনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক কোমৎ জননীক্রোড়ে শিশুমূর্তি কল্পনা করে যে মানবতার রূপ এঁকেছিলেন, শিশুতীর্থের শিশু সে ছাড়া আর কেউ নয়।

আশ্বস্ত হলাম এই দেখে আমাদের পূর্ব-আলোচিত "প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ" বইতে প্রসঙ্গত আমাদের ব্যাখ্যাই স্বীকৃত হয়েছে।—

'এই নবজাতক কোনো একটি বিশেষ মানবত্রাতা নন। জগদ্ব্যাপী অত্যাচার ও অনাচারের রক্তপ্লাবনের পঙ্কিল পথে নূতন যুগের গণদেবতারূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।' (পৃ. ২০২)

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের বইটিতে যেসব অপূর্ণতা আছে, তিনি নিজেই তার উল্লেখ করেছেন। অতএব তার পুনরুক্তি অনেকখানি নিরর্থক।

শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তের "রবীন্দ্রপ্রতিভা" প্রথম দর্শনেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতি সুন্দর ছাপা বাঁধাই কাগজ। রবীন্দ্রনাথের একটি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত হওয়ায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। তা ছাড়া লেখক সযত্নে গ্রন্থের টীকা সম্পাদনা করেছেন। "রবীন্দ্রপ্রতিভা" বইটি যেমন নিছক গবেষণামূলক নয়, তেমনি কোনো সাহিত্যসূত্র আবিষ্কারের বা ব্যাখ্যার চেষ্টাও নয়। বইটি বিভিন্ন ধরনের রচনার সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা যেমন আছে, তেমনি আছে রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকটি চরিত্রের আলোচনা। চিত্রকলা ও সঙ্গীত নিয়ে যেমন দুটি অধ্যায় আছে, তেমনি আছে 'রবীন্দ্র-কাব্যের নেপথ্যবর্তিনী' অর্থাৎ রবীন্দ্ররচনার প্রেরণারূপিণী কাদম্বরী দেবী, 'রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত পাণ্ডুলিপি, মালতী পুঁথি এবং মজুমদার পুঁথি, 'রূপসৃষ্টি : মায়ার খেলার রূপান্তর'। এগুলিতে পাই অবচেতন রবীন্দ্রমানসের ব্যাখ্যা।

শ্রীযুক্ত সামন্তের সমালোচনাকে রবীন্দ্রসমালোচনার কোন্ ধারার অন্তর্ভুক্ত করব জানি না। তাঁর লেখা সমান নয়। কখনো তিনি রসমগ্ন, কখনো বিশ্লেষণপরায়ণ, কখনো গবেষক, কখনো রম্যতাধর্মী। তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে চমৎকার দীপ্তির সাক্ষাৎ পাই, আবার কখনো ভাবোচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে যাই। লেখকের 'আবেগমিশ্রিত ভক্তি' যদি পাঠককে অভিভূত না করে, তবে সত্য সত্যই তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যবর্তিনী' 'ছিন্নপত্রাবলী' বা 'শিশু' প্রবন্ধে নতুন চিন্তার খোরাক পাই। শ্রীযুক্ত সামন্তের সমালোচনাপদ্ধতি মোটের উপর



বিবরণধর্মী। তিনি নিজে যেভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য আস্বাদন করেছেন, ঠিক সেই ভাবেই আমাদের কাছেও উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। এইজন্যই "রবীন্দ্রপ্রতিভা"য় প্রায়শঃই স্বগতভাষণের সম্মুখীন হই। ভাষাও অলংকৃত, বাক্যগঠন জটিল। এগুলি লেখকের মুদ্রাদোষ মাত্র। লেখকের শক্তি অন্যত্র এবং সে শক্তি অত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্।

**ভবতোষ দত্ত**

**শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ**—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত। রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি। কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নেই, আমাদের জিজ্ঞাসারও অন্ত নেই। কিন্তু তাই বলে শুধু বিস্ময়ের বশবর্তী হয়েই আমরা রবীন্দ্রসমীক্ষায় প্রবৃত্ত নই। ভারতবাসীর আত্মজিজ্ঞাসার ক্রমবর্ধমান তীব্রতাও এ বিষয়ে বর্তমানে যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক বটে। এই আত্ম-জিজ্ঞাসা বর্তমানে ঊনবিংশ শতাব্দীর আত্মজিজ্ঞাসা থেকে গভীরতর তাৎপর্য বহন করছে। ঊনিশের শতকের আত্মজিজ্ঞাসার মূলে প্রধানত আত্মরক্ষার চেতনাই মুখ্য ছিল। ভারতবর্ষের বিশাল বটবৃক্ষকে আশ্রয়রূপে ব্যবহার করতে করতে ভারতবর্ষ তার সমগ্রতা নিয়ে জিজ্ঞাসুদের মনে স্পষ্ট হতে থাকে। আলবেরুণী থেকে সুরু করে ভারতীয়দের যে অবিভাজ্যতার কথা আমরা শুনে আসছি, ঊনিশের শতকেই সেই অবিভাজ্যতার মূল কোথায় তা অনুধাবনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। বাংলাদেশে বঙ্কিম বিবেকানন্দ থেকে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত ভারতবর্ষের জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তিই ধর্মকে এই অবিভাজ্যতার নিধান বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধেও বারে বারে ধর্মকে খুঁজে পাওয়া গেলেও, তিনি ধর্ম বলতে যা বুঝেছেন তা পূর্ববর্তীদের থেকে গভীরার্থবোধক। এই বোধের গভীরতার জন্য রবীন্দ্রনাথ গোটা ভারতবর্ষের চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতবর্ষ যে শুধু ত্যাগের কথাই বলেনি, নিষ্কাম সাধনার কথাই বলেনি, আনন্দের কথাও বলেছে, তার বৈরাগ্য যে দুর্বলের বিরক্তি নয়, সেখানে যে রাজা এবং ঋষি অভেদে বর্তমান ছিল, রবীন্দ্রনাথ তার পূর্ণ তাৎপর্যকে বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন বলেই, বৈষ্ণব কবিদের আবেগনির্ভর জীবনদৃষ্টির প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করেও, তার প্রভাবকে নানাভাবে অঙ্গীকার করেও, রবীন্দ্রকল্পনা বারে বারে যে রূপকের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেছে তা হল হর-পার্বতীর রূপক। এই রূপকেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের দ্বন্দ্বময় সমগ্রতাকে বারে বারে উদ্ভাসিত করেছেন। এই দ্বান্দ্বিক সমগ্রতা অবশ্য কবির বিশ্ববীক্ষাসম্ভূত—কিন্তু অনেকাংশে তা ভারতবর্ষের প্রকৃতির দান। তাই রূপকের এই ক্লাসিক আধারে কবির ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি দেখেছেন ভারতবর্ষের ধর্ম, জীবনের এই দুই দিককেই ধারণ করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের এই সমগ্রতাসন্ধান আরো স্পষ্ট হয় যখন বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত-জিজ্ঞাসার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভারত-জিজ্ঞাসার প্রতি তুলনা করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভারত-জাগরণ মানে হিন্দুইজমের পুনরুদয়। রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ মানে ভারত-সমাজ; সে শুধু হিন্দু বৌদ্ধ জৈনদের মর্মের ভারতবর্ষই নয়, তার পাশে পাশে প্রবহমান লোকসাধনার হার্দ্য ভারতবর্ষও। আবার, তাঁর বিশ্ব আবিষ্কার প্রতিবারেই ভারত আবিষ্কারও বটে।

বিশ্বে তিনি যেমন বয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন তাঁর ভারতবর্ষকে, ভারতবর্ষেও তেমনি বারে বারে বয়ে এনেছেন বিশ্বকে। কেন না সমগ্র না হলে মুক্তি নেই। যে কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথ—তাঁর সেই বিশাল অসামান্য কবিত্ব এই বোধির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই বঙ্কিম যেমন ব্যক্তির মুখ তাকিয়ে অনুশীলনাদর্শ রচনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি ব্যক্তিত্বের মুখ তাকিয়ে মানুষের ধর্মের কথা ভাবেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি সকল সময়েই বিশ্বসাপেক্ষ—তাঁর বিশাল কবিত্বের মূল কথাও এইখানে।

১

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায়, তা সে তাঁর ভারতবোধবিষয়ক আলোচনাই হোক, অথবা তাঁর শিল্পরীতি সংক্রান্ত আলোচনাই হোক,—তা রবীন্দ্রচেতনার সমগ্রের পটে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্ধের হস্তীদর্শনের কিম্বদন্তী প্রয়োগ করে রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার খণ্ডীভবন অনিবার্য বলে মেনে নেওয়া উচিত নয়। বর্তমান সংকলনের কতকগুলি রচনার বিষয়-নিহিত তাৎপর্য সত্ত্বেও এই খণ্ডীভবনের দুর্ভোগের হাত থেকে তারা বাঁচে নি। সেক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তের ও শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ ও মতানুধ্যান সংক্রান্ত আলোচনা দুটি এই গ্রন্থের দুটি অন্যতম আলোচনা যেখানে তাঁদের বক্তব্য প্রতিপাদনে গোটা রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবেছেন। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত তাঁর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অন্বয়বোধকে প্রচলিত প্রথানুযায়ী উপনিষদের জের বলে মেনে নেন নি। আবার তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পথগামী কিছু একটা বলেও স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের অন্বয়বোধের মধ্যে অখণ্ড জীবনের যে অনুভূতি বিদ্যমান, সে অখণ্ড জীবনের তিনটি দিক। তিনটি দিক মিলে সেই অন্বয়বোধ। এই তিনটি দিক হল—ব্যক্তিজীবন, মহামানবতা ও বিশ্বপ্রবাহ। বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানবজীবনের অখণ্ডতার যোগের বিষয়টি উপনিষদ-ধৃত। কিন্তু মহামানবতাসংক্রান্ত অখণ্ডতা-বোধ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত বর্তমান প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের এই নিজস্ব বোধের বিবর্তন ও পরিণতি আলোচনা করেছেন। তিনি প্রবন্ধটিকে তত্ত্বালোচনায় পর্যবসিত করেন নি। বরঞ্চ কবির কাব্যের রশ্মিতেই বিষয়টির গম্ভীর গহনকে আলোকিত করেছেন। অবশ্যই হিবার্ট লেকচারের তত্ত্বগত আলোচনায় শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত আজো অক্লান্ত, কিন্তু কবি-জীবনের সমগ্রের প্রেক্ষাপটে সেই তত্ত্বের সার্থকতা সন্ধান এই প্রবন্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একথা তাই এ প্রবন্ধের উপযুক্ত উপসংহার যে—'উপনিষদ হইতে বচন তুলিয়া তুলিয়া বা পাশ্চাত্য হিউম্যানিস্টগণের লেখা হইতে বচন তুলিয়া তুলিয়া গোটা রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যা করা চলে না।' রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের লেখা পড়ে তাঁকে পশ্চিমী হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার যে ঝোঁক তার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের চিন্তায়, মানুষের মূল্যেই পৃথিবী মূল্যবান এই যে-বোধ আধ্যাত্মিকতা-বিমুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল তার ব্যাখ্যায় অবশ্যই পশ্চিমী হিউম্যানিস্টদের ডাকার দরকার নেই। কিন্তু, মিলের শিষ্য হয়েও বঙ্কিমচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরময় উপসংহার খুঁজতে হয়েছে[১]—পশ্চিমী হিউম্যানিস্টদের প্রদত্ত শিক্ষার স্বক্ষেত্রেই যখন নানা Imperfect

[১] মিলের উপসংহারে যে ধর্মের সম্বন্ধে দ্বিধাযুক্ত মনোভাব দেখা দিয়েছিল ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্রই সে কথা প্রথম জানান। তাতে বোঝা যায় মিলকে বঙ্কিম কী রূপে দেখতে পেলে খুসি হতেন।



Synthesisএর পরবর্তী পরিণতি দেখা দিল, বঙ্কিমের ঈশ্বরময় উপসংহার তখন বিস্ময়কর নয়। সে স্থলে রবীন্দ্রনাথ কেন পরিশেষে আধ্যাত্মিকতার 'আবরণ' মুক্ত হবার চেষ্টা করলেন শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের প্রবন্ধটিতে সেই কারণটি সত্যই আলোচিত হয়নি। ধর্মীয় গোষ্ঠীবিমুক্ত পরেশবাবুতে, চরঘোষপুরের নাপিতের মধ্যে এই সর্বপ্রকার আবরণ থেকে মুক্তির পূর্বাধ্যায় রচিত হয়েছে। অবশ্যই ধর্মীয় আবরণ-বিমুক্তি ও আধ্যাত্মিকতার আবরণ-বিমুক্তি এক কথা নয়। কিন্তু আবরণগুলো এক এক করে খসেছে। তারই প্রথমস্তর পরেশবাবুতে। তার দ্বিতীয় স্তরের ইঙ্গিতও গোরাতেই বিদ্যমান—তিনি আনন্দময়ী। উপসংহারের রবীন্দ্রনাথের মানব-বোধ, মানব-মূল আধ্যাত্মিকতা নয়, আধ্যাত্মিকতা-সমৃদ্ধ মানবতাও নয়। এই হল রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী বিশুদ্ধ মানববোধ—যার যাত্রা নিঃসন্দেহে সদর স্ট্রীটের সূর্যালোক থেকে। রূপনারাণের কূলে যে জগৎ-বোধ অবশেষে সংগৃহীত, তা জগৎ জীবনের মূল্যেই মূল্যবান। মহামানবের ধারাকে উপলব্ধির পথে ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা একটা স্তরে রবীন্দ্রনাথের অগ্রগতির পথে বিপুল সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু কবির মধ্যে মানববোধ যত নিজস্ব পরিণতি লাভ করতে থাকে ততই সেই সাহায্যের প্রত্যক্ষ ভূমিকা শেষ হয়েছে। ভারতবর্ষের লোকসাধনাতেই হয়ত তার ইঙ্গিত ছিল। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত তার ইঙ্গিতটিকে ধরেছেন কিন্তু পরিণতির বিশালতাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন।

শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের রবীন্দ্রনাথের সত্যানুধ্যান প্রবন্ধটির কথা শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের লেখাটির সঙ্গেই আলোচ্য। শ্রীযুক্ত দত্তও একথা বিশ্বাস করেন যে সমগ্রতা ছাড়া রবীন্দ্র বিচার সদাই খণ্ডিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সত্যের স্বরূপ সন্ধানের দীর্ঘ ইতিহাসের পর্যালোচনায় শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের মত তিনিও অনলস। এ বিষয়ে তথ্যময় রবীন্দ্রজীবন থেকে নানা আলোকসম্পাতী তথ্য ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানবিক ঐক্যানুভূতির তত্ত্ব, তাঁর জীবন সংক্রান্ত সত্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশমান রূপকে তিনি সাগ্রহ জিজ্ঞাসায় জানতে চাওয়ার ফলে বৈদান্তিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এসেছে। গতিশীল সত্যের বৈচিত্র্যকে নানাভাবে জানতে জানতে বিশ্বসাপেক্ষ রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব 'জীবনের অখণ্ড চঞ্চল রূপপ্রবাহের সমগ্রতাকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে'। শ্রীদাশগুপ্তের ন্যায় তিনিও উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল-অমিলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, হিবার্ট লেকচার প্রভৃতির তত্ত্ব আলোচনা করেছেন, এবং তিনিও কবিকীর্তির সঙ্গে তাঁর সত্যজিজ্ঞাসার নানামুখী আলোকরশ্মির যোগ কোথায় তা দেখিয়েছেন। শ্রীযুক্ত দত্ত তাঁর প্রবন্ধটির শেষে রবীন্দ্রনাথের উপসংহারক 'সর্বজনীন মানবত্ববোধের অবর্ণ যুগান্তর' বলে আখ্যাত করেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিমী মানবতাবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা না দেখিয়েও এই সিদ্ধান্তের স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করেছেন। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত দত্ত উভয়েই রবীন্দ্রনাথের সত্যবোধের বা মানবতাবোধের ক্রমপরিণামকে তাঁর অন্তরের দিক থেকে আলোচনা করেছেন। এই ক্রমপরিণাম রচনায় বাইরের যে ঘটনা এবং শক্তির প্রতিক্রিয়া কার্যকরী ছিল তাদের কথা প্রায় বলেন নি। নেশনতন্ত্রের সঙ্কট, প্রথম মহাযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে কবির প্রতিক্রিয়া শুধু তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদকেই রচনা করেনি, 'চিন্ময় মানবসত্তার ধ্যান' কবি এই সমস্ত ভূমিতে বসেই করেছিলেন বলে, সেই ধ্যানাসনের প্রসঙ্গে এরাও আলোচ্য। এই সকল প্রসঙ্গের অনুপস্থিতির জন্য ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধের মূল্যবান উপসংহার আকস্মিক বলে ভ্রম হয়।

বস্তুতঃ গোটা রবীন্দ্রনাথের যে ইঙ্গিত শ্রীদাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত দত্তের প্রবন্ধে উপস্থিত যে কোনো পন্থায় রবীন্দ্রোপলব্ধির জন্য তা বিশেষ মূল্যবান। অন্যথা রবীন্দ্রনাথ কখনো হয়ে পড়েন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কাটাকুটি খেলার আশ্চর্য সামগ্রী, অথবা তত্ত্বের ফিতে দিয়ে সৌন্দর্য পরিমাপের ব্যর্থ প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত সমুদয় আলোচনাকেই শেষ বিচার পেতে হবে তাঁর কবিত্ব প্রসঙ্গের সঙ্গে বদ্ধ হয়ে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনাথ ও ভারতধর্ম, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের মর্মবাণী, নন্দগোপাল সেনগুপ্তের রবীন্দ্রমনের দার্শনিক ভিত্তি এবং সোমনাথ মৈত্রের রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি মূল সুর আন্তরিকতায় আবেগময় হলেও সমগ্র রবীন্দ্রনাথে সন্নিবিষ্ট কোনো প্রসঙ্গালোচনা নয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ এবং নির্বিশেষ কোনো রূপই আলোচিত হয়নি। মনে হল সম্পাদকমণ্ডলী লেখক নির্বাচনে যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন বিষয়-সূচী রচনায় সে পরিমাণ মনঃসংযোগ করেন নি। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়েছে এই যে বহু পুরাতন কথা একই সঙ্গে অনেকে আবৃত্তি করেছেন। এতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এরকম একটা সংকলনে আমরা তদতিরিক্ত কিছু আশা করি।

সেদিক থেকে শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে কিছু বস্তুপূর্ণ কথা শোনা গেছে। প্রবন্ধকারের বক্তব্য এককথায় এই, 'রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে যে মত পোষণ করিতেন তাহা বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে'। শিবাজী এবং রণজিৎ সিংহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যকে লেখক রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসবেত্তার দৃষ্টিতে খণ্ডন করতে চেয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ আরোপিত, বিশেষ বলভিত্তিক ঐক্যকে সাময়িক বলে মনে করেন। এই জন্যই নানক ও রণজিৎ সিংহের প্রসঙ্গ তিনি আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মজুমদার বলছেন, 'শিখ সম্প্রদায় যুদ্ধ বিদ্যায় বিশারদ না হইলে প্রবল মুঘল রাজশক্তি খুব সম্ভবতঃ ইহাকে পিষিয়া ফেলিত। যদি তর্কচ্ছলে ধরিয়া লওয়া যায় যে মুঘলশক্তি শিখদের প্রতি উদাসীন থাকিত, তাহাদের যাত্রাপথে কোনো বাধা দিত না—তাহা হইলেই কেবল বাবা নানকের পাথেয়ের সাহায্যে তাহারা ভারতের সমাজে ও ধর্মে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনিতে পারিত? নানকের ন্যায় রামানন্দ কবীর দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগের বহু সাধক তাঁহাদের শিষ্যদিগকে অনেক পাথেয় দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আজ কেবলমাত্র কবীরপন্থী প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য সম্প্রদায়ই তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।' গুরু গোবিন্দ, রণজিৎ সিংহ প্রমুখের সামরিক নায়কত্ব ব্যতীত নানকের বাণী ভারতবর্ষকে স্পর্শ করতে পারত না—একথা বলতে হলে ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের একটা অধ্যায় সম্বন্ধে চূড়ান্ত অন্ধতা অবলম্বন করতে হয়। চৈতন্যদেব তাঁর কালেই প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করে ভারতবর্ষের বৃহদংশকে স্পর্শ করেছিলেন—নিশ্চয় সাময়িক নেতৃত্বের সহায়তায় নয়। বাংলাদেশ নিজেকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিল বৈষ্ণবযুগে, এবং সে সময় সে তার অনুভবের গৌরবকে, গৌরবের অসামান্যতাকে অন্যত্রও বিস্তারিত করেছিল, রবীন্দ্রনাথই একথা আমাদের ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বভাবতঃই এই চিত্ত-সম্প্রসারণ বলভিত্তিক না হয়েও কালজয়ী হতে পেরেছিল। বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত মজুমদারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূলগত তফাৎ এইখানে যে শ্রীযুক্ত মজুমদারের চোখে অখণ্ড বা গোটা ভারতবর্ষের বিষয়টি কখনো নেই। হিন্দুজাতি, শিখজাতি, মারাঠিজাতি—ভাবনাগুলো যদি এই পদ্ধতিতে চলে তাহলে শ্রীযুক্ত মজুমদারের কথাই ঠিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষের কথাই বারে বারে ভেবেছেন। আর সমগ্রের কথা ভাবতে গেলে ঐক্যসূত্র আবিষ্কারের



কথাও ওঠে। তারই সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সমাজের কথা ভেবেছেন—রাজলক্ষ্মীর সাধনা অপেক্ষা সমাজলক্ষ্মীর সাধনার কথা বলেছেন[১]। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাঁর দৃষ্টিপাত বরঞ্চ ভারত-ইতিহাসের সমাজভিত্তিক আলোচনা। 'তাঁর এই মত যে দেশ গ্রহণ করেনি' তাতে এদেশের রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃবৃন্দের অন্তর্দৃষ্টির স্বল্পতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। আমাদের বহু দুর্ভাগ্যের মূল কোথায় তাও বোঝা যায়।

শ্রীযুক্ত মজুমদারের প্রবন্ধটিতে যে আংশিকতা তা দূর হতে পারত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পর্ক সংক্রান্ত কোনো সার্থক আলোচনায়। ঊনিশের শতকের ভারতবোধের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের ভারতস্বরূপ সন্ধান শুরু হয়েছে। সে কারণে ঊনিশের শতকের বাংলাদেশে এ বিষয়ের প্রস্তুতি পর্বের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথ ও ঊনবিংশ শতাব্দী নামক প্রবন্ধে এই তাৎপর্যকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কোনো আগ্রহ নেই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গদ্যভঙ্গিতে এমন একটা অস্থির, শততরঙ্গ ভঙ্গপ্রবণতা বিদ্যমান যার তুলনা বুঝি ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনের অস্থিরতার মধ্যেই শুধু মেলে। ঊনবিংশ শতক সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য সব কথাই এই প্রবন্ধে আছে এবং কতকগুলি কথা পূর্বজ্ঞাতও বটে। এই পূর্বজ্ঞাত কথাগুলির পুনরাবৃত্তিতে আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না, যদি দেশকালে ধৃত রবীন্দ্রমানসের পরবর্তী বিবর্তন সম্ভাবনা সতথ্য আলোচিত হত। সমস্তটা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ যা ছিলেন তার বিবরণ। যা ছিলেন তার ব্যাখ্যা নয়। প্রকৃত ইতিহাস কার্যকারণ সূত্রের ব্যাখ্যা ও পরিণতির কথা বলে।

২

এবং সঙ্গে সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রতিভার কোনো বিশেষ দিক নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করি তখন আমরা যদি সেই বিশেষ দিক বা অধ্যায় কবির সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে কোন্ নিগূঢ় যোগে বিশিষ্ট সে কথা আলোচনা না করি তবে সে আলোচনা নিঃসন্দেহে আংশিকতা-দুষ্ট। তিনি কবি হয়েও ঔপন্যাসিকের কলম তুলে নিয়েছিলেন, অথবা লেখক হয়েও ছবি আঁকতে বসেছিলেন—এ সমস্ত মন্তব্যে স্পষ্টই বোঝা যায় যে কবির সৃজনী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মন্তব্যকারদের পরিচয় একান্তই আপাত। রবীন্দ্রনাথের কোনো কিছুই একটা কিছু হয়েও, আর একটা কিছু হয়ে ওঠা নয়। শিল্পের সর্বাঙ্গলে পর্যটন করেছিলেন তিনি সৌখীন রীতি বিলাসের তাগিদে নয়, বারে বারে শিল্পের আলোয় জগৎ-জীবনের স্বরূপের সন্ধান এর মূলে। সে কারণে রবীন্দ্রনাথের শিল্পধারগুলির বিভিন্ন বৈপরীত্যের মাঝে ঐক্যবিষয়ক সূত্র আবিষ্কার-বাসনায় আমরা যেমন অতি সরলীকরণের আশ্রয় নেব না,

[১] When we remember that Indians had more of Society than of the State, that her religious have penetrated into the inmost recesses of living, that Hinduism is more of a culture than of a religion or a philosophy in the European sense, that Buddhism, Jainism, Islam, Sikhism other religions have survived more by diffusion than by political prestige then this absence of sociological approach is not only a criminal conduct but a blunder of the first magnitude.

—*On Indian History* (A Study of Method)—Dhurjati Prasad Mukherji

তেমনি এক-একটি শিল্পরাজ্যের স্বরাজ-সাধনাকে সার্বভৌম বলেও মেনে নেব না। ছিন্নপত্র ও রবীন্দ্রদর্শন সংক্রান্ত মনোজ্ঞ আলোচনায় শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী কবির সে সময়ের চিন্তাজগতের নানা টানাপোড়েনের কথা কিছুই বলেননি। নবপ্রকাশিত ছিন্নপত্রাবলীর ১৫২ নং ও ১৫৩ নং চিঠি দুটির কথাই শুধু বলা হচ্ছে না, পৃথিবীর ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঔদাস্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক একান্ত সাময়িক ধারণা এযুগে জন্মলাভ করেছিল। নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার একটা নতুন ব্যাখ্যা এখানে মেলে। ছিন্নপত্রকে তৎকালীন কবিজীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখার জন্যই লেখিকা এটিকে হারিয়েছেন। তেমনি শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত বা ভূতের গল্প শীর্ষক আলোচনায় শিক্ষাপ্রদ ভূমিকা রচনা করেছেন বটে, কিন্তু বলি-বলি করেও একটা কথা বলে উঠতে পারেননি যে রবীন্দ্রনাথের ভূতের গল্প ব্যর্থ মানুষের গল্প বলেই এত আবেদন-ময়। এই মানুষদের কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কম। সে কারণে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অতিপ্রাকৃত-রস সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন —শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য এ সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিতই করেননি। সেই বিচারেই বলা যায়, কাজি আবদুল ওদুদের পঞ্চভূত, শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা এবং শ্রীক্ষিতীশ রায়ের অন্তগামী রবি অথবা শ্রীশান্তা দেবীর রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিঃসন্দেহেই হৃদয়গ্রাহী আলোচনা মাত্র। মন্ময় আলোচনা এ সমস্ত ক্ষেত্রে লেখকদের লক্ষ্য ছিল তাঁরা তাতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। পাঠ এবং ব্যাখ্যার সমাবেশে এরা প্রথাবদ্ধ আলোচনার অন্তর্গত। বরঞ্চ হরপ্রসাদ মিত্রের রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য ইন্দ্রিয় সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে নূতন আলোক-সম্পাতী প্রয়োজনীয় আলোচনা। যদি শ্রীযুক্ত মিত্র বোদলেয়র-এ্যালান পো-প্রমুখ অনাবশ্যক আলোচনার ভার কমাতেন—তাহলে সংক্ষিপ্তির জন্য বক্তব্যের সৌন্দর্য বাড়ত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে'-রচনায় লেখকের প্রকৃত রসিক মনের যথার্থ আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তিনিও কি রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রগুলির একটি বিশেষ স্বরূপ আলোচনায় এদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কোন্ বিশিষ্ট ধারণায় স্বতন্ত্র সে কথা বলবেন না? কাব্য এবং কথাসাহিত্য মিলিয়ে চরিত্রগুলির বহিরঙ্গের রেখাপরিচিতি গ্রহণের পথনির্দেশে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় অভ্রান্ত। কিন্তু এ জাতীয় চরিত্রকল্পনার পটভূমি বিশ্লেষিত হয়নি। সে কারণেই দাক্ষিণ্যের অন্তরালবর্তিনী যে দৃঢ়তা তার স্বরূপ ব্যাখ্যাও যথাযথ হল না। মেজবৌ নোয়া হয়ে উঠল না কেন সে ইঙ্গিত তিনি নির্ভুলভাবে আমাদের দিয়েছেন, কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা ঘন হতে পারে না যখন দেখি হৈমন্তীর আত্মমর্যাদার শেষ-পরিচয়প্রসঙ্গ তিনি প্রায় উত্থাপনই করলেন না।

অনুরূপভাবেই রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সংক্রান্ত শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ রায়ের আলোচনাটির জন্য লেখকের শ্রম এবং নিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানিয়েও, অভিযোগকে স্তিমিত করে আনতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সংক্রান্ত বিবর্তনের পর্যায়গুলিকে রথীন্দ্রবাবু নিপুণ-ভাবে সন্নিবেশিত করেছেন এবং আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অতিক্রম কেন অবলীলাক্রমে ঘটেনি সে সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যও শ্রীযুক্ত রায় করেছেন। কিন্তু বোঝা গেল না কেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পময় গদ্য—(প্রবন্ধের গদ্য) বঙ্কিমের প্রবন্ধের গদ্যের চেয়ে মন্থরগতি। শ্রীযুক্ত রায় সম্ভবতঃ সজ্ঞানে এই বিশেষ প্রশ্নটির পাশ কাটিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্যের অভিনিবিষ্ট ছাত্র হয়েও কেন চলতি বাংলার বিশাল ইডিয়ম-সম্পদকে তাঁর গদ্যে প্রায় অপাংক্তেয় করে রেখেছেন? এই প্রশ্নটিকে পাশ কাটানোর জন্যই রবীন্দ্রনাথ কেমন করে চলতি বাংলার ইডিয়ম-সম্পদকে অগ্রাহ্য করেও "সবুজপত্রে"র পরে বাংলা কথ্য-



ভঙ্গিকে স্বাধিকার দিলেন, তাকে ভিন্ন শক্তিতে জোরালো করে তুললেন সে আলোচনা বাদ গেছে। আর দৃষ্টিভঙ্গির এই একপেশে ব্যবহারের জন্যই গদ্যে 'চলতিভাষার প্রতিষ্ঠা'-ব্যাপারটি যে সাধুভাষা থেকে 'চলতিভাষা বেরিয়ে পড়ার' ব্যাপার নয়, ক্রমবর্ধমান বিষয়োপলব্ধির অনিবার্য তাগিদ এর পশ্চাতেও ছিল, যেমন ছিল "পুনশ্চে"র গদ্য-ছন্দের প্রবর্তনের পশ্চাতে—সে কথা বলতেই ভুল হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গহনতার প্রসঙ্গে ছাড়া তাঁর গদ্যরীতির সমস্যা আলোচিত হয়েছে বলেই এই সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।*

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসাহিত্য প্রবন্ধটি সংকলনের আর একটি উজ্জ্বল রচনা যেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি পৃথক চেহারার দেখা পাই। লোকসাহিত্য গবেষণার সূত্রপাতের জন্য বাংলার সাহিত্য সাধকেরা রবীন্দ্রনাথের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানাবেন। রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতি-প্রকরণ ব্যবহার করেছেন, শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য তার যোগ্য আলোচনা করেছেন এবং এই পদ্ধতি-প্রকরণই যে আধুনিকতম গবেষণার ভিত্তি হতে পারে তা জানিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র হিসাবে তাঁর কবিত্বরস পিপাসাকে নির্দেশ করেছেন। তিনি নিজে জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপক। সেই স্নিগ্ধতায় রচনাটি সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গল্পে লোক-সাহিত্যের প্রভাব কোন্ পর্যায়ে কতখানি এ আলোচনা একেবারেই শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য এ আলোচনায় বাদ দিয়েছেন। সমস্তটি পড়ে মনে হল সেটা তাঁর বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল না। সে হিসাবে প্রবন্ধের নামকরণ ঈষৎ ত্রুটিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হল। রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য আলোচনার পদ্ধতি প্রকরণ যখন তাঁর আলোচনার বিষয় তখন নামকরণেও সেই ইঙ্গিত বাঞ্ছনীয় ছিল।

৩

এই সংকলনে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রবীন্দ্রসংগীত, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্বমনা : বাক্‌পতি, শ্রীসুকুমার সেনের রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর রবীন্দ্রনাথের অভিনয়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভোরের পাখী ও শ্রীশচীন সেনের রবীন্দ্রসাহিত্যে গণআন্দোলন সেই জাতীয় প্রবন্ধ যাকে বলা যায় তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি শেষ পর্যন্ত স্মৃতিকথায় পর্যবসিত হলেও তা তাঁর মত জ্ঞান-প্রবীণের স্মৃতি বলেই আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয়। রবীন্দ্রনাথকে নানা বিশেষণে নানা সময়ে আমরা ভূষিত করেছি, কিন্তু বিশ্বমনাঃ কথাটি কবির যথার্থ পরিচয়-বাচক। ভোরের পাখী প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্র-চিত্তের প্রত্যুষলগ্নের কথা বিস্তৃত তথ্যভারে সমৃদ্ধ। শ্রীযুক্ত সেন অবশ্যই মাত্র তথ্যের স্তূপে বদ্ধ থাকেননি। তখনকার অস্ফুট কবিকীর্তির সাহায্যে রবীন্দ্রমানসের নেপথ্যলোককেও

---

*J. Middleton Murry তাঁর সুবিখ্যাত The Central Problem of Style নামক নিবন্ধে স্তাঁদালের প্রদত্ত styleএর একটি সংজ্ঞাকে খুব তারিফ করেছেন। স্তাঁদালের দেওয়া সংজ্ঞাটি এই, 'Style is this: to add to a given thought all the circumstances fitted to produce the whole effect that the thought ought to produce.'

Murry সাহেব এই সংজ্ঞা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন... 'thought' does not really mean 'thought'; it is a general term to cover intuitions, convictions, perceptions and their accompanying emotions before they have undergone the process of artistic expression or ejection.

উদ্ভাসিত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। ছিন্নপত্রাবলীতে সেরুপীয়রের ওথেলো সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার কথা কবিই আমাদের জানিয়েছেন। কবি-জীবনের উষা-লগ্নেই যে রক্তাঙ্কিত বিয়োগনাট্য সম্বন্ধে কবির বিরূপতা গড়ে উঠছিল—শ্রীযুক্ত সেন তা আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চাভিলাষের উদ্দীপনের প্রয়াসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটা মাত্র ইঙ্গিত না দিয়ে যদি শ্রীযুক্ত সেন আর একটু ব্যাখ্যা করতেন, তাহলে পরবর্তী কালের বঙ্কিম-রবীন্দ্র সম্পর্কটির উৎস বোঝার কাজে সহায়তা পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথের গল্পে রূপক ও রূপকথা এবং রবীন্দ্রসংগীত প্রবন্ধ দুটি উদ্দিষ্ট বিষয়ের কালানুক্রমিক বিবর্তনের বিবরণ। যোগ্য হাতে লেখা বলে পরবর্তী আলোচনায় সাহায্য করবে। সেদিক থেকে শ্রীযুক্তবিজনবিহারী ভট্টাচার্যের ইংরাজীশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী-পাঠন সম্বন্ধে একটি সংবাদ-জ্ঞাপক প্রবন্ধমাত্র। শতবার্ষিকী বৎসরে এ আশা করা অন্যায় হবে না যে রবীন্দ্রচর্চা ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ করবে। এবং এ ব্যাপারে আমরা কেবল যে পুনঃপুনঃ দলিত পন্থাতেই পা ফেলছি তা নয়। জিজ্ঞাসার অভিনবত্ব এবং গভীরতার প্রমাণও মিলছে। তার কারণ শতবার্ষিকের বৎসরে আমাদের যেটি পরম লাভ বলে মনে হয়, সেটি হল, আমাদের মধ্যে আংশিক-দৃষ্টি পরিহারের একটা শক্তিশালী প্রেরণা দেখা দিয়েছে। 'তাঁর প্রাণময় রহস্য যে আমাদের কাছে শেষ হয় না'—আমরা সেই অশেষকে কবির সমগ্র প্রাণলীলার সঙ্গে মিলিয়ে সন্ধান করেছি। এই পথেই রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধেয়।

**সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়**

**রবিচ্ছবি**—প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত। গীতবিতান। কলিকাতা ২৬। মূল্য ছয় টাকা।

'বইখানিকে প্রধানত ঘটনা ও তথ্যমূলকভাবে রচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। রবীন্দ্র-পরিচয়কে খানিকটা ঘনিষ্ঠতর করে তুলতে ও রবীন্দ্রজীবনীর উপকরণ সংগ্রহের কাজে বইখানির কিছু মূল্য থাকতে পারে মনে করেই এই কাজে উদ্যোগী হয়েছি'—"রবিচ্ছবি" গ্রন্থের লেখক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 'নিবেদন' অংশে এই মনোভাব বিবৃত করে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে [ মা নিষাদ ] লেখক জানিয়েছেন 'তাঁর সাহিত্য এবং তাঁর জীবন উভয়ই আমাদের অবশ্য পাঠ্য। কাব্যের মায়াজালের অন্তরালবর্তী রূপকারকে আমাদের চিনতে হবে শুধু তাঁর রচনাসৃষ্টির আলোকপাতে নয়, তাঁর জীবনালোকের রশ্মিপাতেও'। (পৃঃ ১৪)

লেখকের উদ্দেশ্য অভিনন্দনযোগ্য এবং আনন্দের কথা তিনি তাঁর এই প্রয়াসে সিদ্ধকাম হয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা-গ্রন্থের বিপুল সমারোহের মধ্যেও "রবিচ্ছবি" গ্রন্থখানি বিদগ্ধ পাঠকের-দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখক প্রায় ছ'বছর বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন এবং পরেও তাঁর যোগ ছিন্ন হয়নি। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য লাভ করেছেন, কবির স্বজীবনের পর্যালোচনা শুনেছেন, "অরূপরতন" নাট্যাভিনয়ে কবির সঙ্গে অভিনয়ে নেমেছেন, দিনের পর দিন নানা রূপে দেখেছেন গুরুদেবকে। শুধু কবির সাহিত্যকর্মের আস্বাদন নয়, কবির ব্যক্তিজীবনের বিশেষ-বিশেষ ঘটনাকে জানা, তাঁর নেপথ্য কর্ম তথা অন্তরঙ্গরূপের পরিচয় লাভ করা পরম সৌভাগ্য। সেইজন্যই কবির দীর্ঘজীবন পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন পর্বে যাঁরা



পথসঙ্গী ছিলেন তাঁদের স্মৃতিচারণ কবির চরিতগ্রন্থে রচনার দিক থেকে মূল্যবান পাথেয়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "রবীন্দ্রজীবনী" চার খণ্ডে প্রকাশ করেছেন—সে এক ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা! তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনায় চিঠিপত্র, মৌখিকভাষণ, স্মৃতিকথা, দিন-লিপি, সংবাদপত্রের তথ্য ও মন্তব্য সকলকিছুর যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করেছেন। "রবিচ্ছবি" গ্রন্থে বিবৃত ও উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য কবিকে ও কবিকৃত নানা কর্মকে আমাদের কাছে আরও সুপরিচিত করে তুলেছে। কাজেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে একথা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার্য।

চোদ্দটি প্রসঙ্গে সজ্জিত "রবিচ্ছবি"র প্রথমটির নামকরণ লেখক করেছেন 'মা নিষাদ'। এই নামকরণে লেখকের রুচির পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই জীবহত্যার বিরোধী ছিলেন। এই বিরোধিতার বীজ বুঝি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোরের সন্ধিস্থলের একটি ঘটনায়। শান্তিনিকেতনের হরিশমালী সুরুলের কুঠির জঙ্গলে যে চঞ্চল-সুন্দর খরগোসটিকে মেরেছিল তার 'নিদারুণতা চিরকালের মতো আমার মনে মুদ্রিত হয়ে আছে' (৪.৪.৩৭-এ কবির পত্রের অংশ)। শিলাইদহ অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে চরে পাখী মারা যে কবি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন সে তথ্য লেখক আমাদের জানিয়েছেন আর কবি নিজে উল্লেখ করেছেন—"যোগাযোগ" উপন্যাসে বিপ্রদাসের জমিদারিতে মধুসূদনের সাহেব বন্ধুদের পাখী হত্যা নিয়ে যে-আলোচনা আছে সেটা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য'। (পৃঃ ১০)। এই ধরনের বহু তথ্য লেখক আমাদের জ্ঞাপন করেছেন। 'প্রভাত-রবি' রচনাটির বক্তব্য শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের অনুলিখিত এবং পরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিমার্জিত হয়েছিল বলে কবি ঐ নাম দিয়েছিলেন। এই রচনাটি বিশেষ মূল্যবান এই কারণে যে এখানে কবি নিজে স্বজীবনের পর্যালোচনা করেছেন। সেই অপূর্ব (অনেকটা যেন স্বগত) ভাষণ পড়তে পড়তে আমরা কবিকে যেন নতুন করে দেখতে পাই। পদ্মা-বিধৌত শিলাইদহ অঞ্চলের প্রতি কবির যে কী গভীর আকর্ষণ ছিল তার পরিচয় পাই কবির ১৯৩৬ সালের (অর্থাৎ মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে) উক্তিতে।

'আজ জীবনের সায়াহ্নে বসে বসে ভাবি, আর একবার পদ্মার বুকে সেই নির্জনচারী জীবনে ফিরে যাব। ঠিক সেই স্পর্শ হয়ত পাব না, কিন্তু জীবনের চক্রগতি পূর্ণ হবে, গ্রামের স্নেহচ্ছায়ায়, প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্যের মধ্যে নদীতীরে একদা যে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, আজ তারই অবসানবেলায় আবার ফিরে যাব সেই নদীরই কোলে।'

আবার আমাদের এ তথ্যও জানা হল যে একদা রবীন্দ্রনাথ "রাজর্ষি" উপন্যাসের শেষ ভাগের সঙ্গে 'দালিয়া'-র গল্পাংশ জুড়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনার পরিকল্পনা করে-ছিলেন (প্রমাণস্বরূপ লেখক কবিরচিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি দাখিল করেছেন)—এই সূত্রে 'নাট্যপ্রসঙ্গ' ও 'অভিনয় উৎসব' রচনাদুটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে "বাল্মীকি-প্রতিভা"র অভিনয় থেকে (১৮৮১) নৃত্যনাট্য "শ্যামা"র অনুষ্ঠান (২২শে শ্রাবণ, ১৯৪০) অবধি রবীন্দ্রকৃত নাট্যাভিনয়ের স্থান-কাল নির্দেশিত হবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কখন কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার উল্লেখ আছে।

পরেরটিতে 'বৃক্ষরোপণ' উৎসবের বর্ণনার চিত্ররূপ সুন্দর হয়েছে। 'রবীন্দ্র পরিচয় সভা' রচনাটির তথ্যগত মূল্য আছে। দুঃখের বিষয় এই সভার মুখপত্রস্বরূপ প্রকাশিত পত্রিকাখানির মোট তিন সংখ্যার দুটি সংখ্যাই লুপ্ত বা অপ্রাপ্য। 'স্বাক্ষর লেখন', 'নাম-করণের বৈশিষ্ট্য' রচনা দুটি রবীন্দ্রানুরাগীদের দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করবে। আর একটি

অনবদ্যরচনা 'দিনেন্দ্রনাথ'। "রবিচ্ছবি" গ্রন্থে 'দিনেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ প্রক্ষিপ্ত নয় বরং অনিবার্যভাবে সংবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'সকল গানের ভাণ্ডারী' বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁর প্রসঙ্গ উত্থাপন এ-গ্রন্থে সর্বতোভাবে সঙ্গত হয়েছে। দিনেন্দ্রনাথের ব্যক্তি-রূপ ও শিল্পী-রূপ দুটি দিকই লেখক নিখুঁতভাবে এঁকেছেন এজন্য তিনি প্রশংসার্হ। এই গ্রন্থের আর একটি স্মরণীয় বস্তু রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ভাষণগুলির অনুলেখনের সুবিন্যস্ত তথ্যপঞ্জী। এটি করে দিয়েছেন রবীন্দ্রসদনের কর্মী ও 'রবীন্দ্ররচনাকোষ' সংকলয়িতা শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব —তিনি এজন্য আমাদের সাধুবাদ অর্জন করেছেন।

ভালো লাগাই সাহিত্য-আলোচনার প্রথম ও শেষ কথা। "রবিচ্ছবি" গ্রন্থখানি পড়া শেষ করে বলতে পারি, ভালো লাগল। ঝরঝরে গদ্য ও সুচারু বাক্‌ভঙ্গি গ্রন্থখানির আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। লেখক তাঁর কথা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি অপরূপ চিত্র এঁকেছেন, সেটি উৎকলন করে এ-গ্রন্থের আলোচনা শেষ করি—

শ্যামলীর ছোট্ট আঙিনায় একটা চেয়ারের উপর বসে আছেন ধ্যানমগ্ন কবি। মাথা ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, চোখের দৃষ্টি মুদিত, এক হাতের উপর আর এক হাত কোলে ন্যস্ত। সমস্ত মুখমণ্ডলে এক আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত জ্যোতি। মনে হল, দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে যেন তিনি প্রভাতের মাধুর্যরস শুষে পান করে নিচ্ছেন।

**দেবীপদ ভট্টাচার্য**

**কবি-প্রণাম**—বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লি। কলিকাতা ৭। মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে প্রকাশিত বহু সংকলন গ্রন্থের মধ্যে "কবি-প্রণাম" অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভা অবলম্বন করে বাংলাদেশের কবিসমাজ স্বরচিত কবিতায় তাঁদের হৃদয়ানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। অর্ধশতাব্দীর অধিককালব্যাপী রবীন্দ্ররবণের এই ছন্দোময় অভিব্যক্তি আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বাঙালির সারস্বত সাধনা বিচিত্র লীলায় উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কবিতাগুলিও তার একটি বিশেষ দিক। এর যেমন ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তেমনি আছে কাব্যপ্রত্যয়গত মূল্য। লিরিক ও সংগীত ব্যক্তিহৃদয়ের স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হলেও, রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কে এগুলিকে একজাতীয় কাব্যভাষ্যও বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন কয়েকটি কবিতা এখানে সংকলিত হয়েছে, যাদের পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা ছিল। রবীন্দ্রনাথের বয়োজ্যেষ্ঠ কবিরা কিভাবে তাঁকে সম্মানিত করেছেন, তার পরিচয় এ সংকলনে মিলবে। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কবিতা কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এই আপনভোলা মানুষটি কনিষ্ঠভ্রাতার গৌরবে হৃদয়ের অকুণ্ঠিত আশীর্বাদ জানিয়েছেন। ছন্দের অভিনবত্ব, অবলীলাকৃত অন্ত্যমিল ও সরস কথোপকথনের অন্তরঙ্গ ভঙ্গি 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর কবির সম্পূর্ণ উপযুক্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথের এই কবিতাটি সংকলনটির একটি বিশিষ্ট সংযোজন। "বাল্মীকি প্রতিভা"র অভিনয়দর্শন করে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একদা যে সংগীত রচনা করেছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে তা



সংকলিত হয়েছে। বিশ্বজ্জন-সমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়ির তেতালার ছাদে স্টেজ বেঁধে অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ সাধারণের সম্মুখে সেইদিন প্রথম অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ও এই উপলক্ষে যে কবিতা রচনা করেছিলেন, সেটিও সংকলিত হয়েছে। কবিতা দুটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। তবে রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতাটির কাব্যমূল্যও আছে।—তিনি তাঁর মুগ্ধ মনের পিপাসাকে বাণীবদ্ধ করেছেন—

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভুলি'
একদৃষ্টে আঁখি মেলি'
চেয়ে আছি ওরই পানে স্বপ্নময়ী পিপাসায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিতাটি কবির পঞ্চষষ্ঠী জন্মদিনে রচিত। সুতরাং রচনার কালক্রমের দিক থেকে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা দুটিকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া উচিত। কবিতা দুটি রবীন্দ্রজীবনের একটি তাৎপর্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক ঘটনাকেই রূপ দিয়েছে। এই দুইটি কবিতা সংযোজন করে সম্পাদক ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

অমৃতলাল বসুর কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একদা তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বন করে প্যারোডি রচনা করেছিলেন। অমৃতলালের প্রহসনে উচ্চশিক্ষিতা নারীচরিত্রের বিকৃতি দেখানো হয়েছে, ব্রাহ্মসমাজও তাঁর বিদ্রূপশরাঘাত থেকে রেহাই পায়নি। পুরাতন মূল্যবোধকেই তিনি আঁকড়ে রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার অসামান্যতাকে তিনিও অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রপ্রতিভার দুটি মূলসূত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির যুগ্মলীলারস রবীন্দ্রমানসকে সুষমামণ্ডিত করেছে। অমৃতলাল রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদৃষ্টির স্বরূপ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : 'সৌন্দর্য সনেতে নাই পশুর ব্যাভার॥'

রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের বরণ ও বন্দনা সংকলনটির উল্লেখযোগ্য অংশ। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখ কবি কখনো সচেতনভাবে আবার কখনো বা অজ্ঞাতসারেই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ষীয়ান সমকালীন কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভূমিকা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি-ভ্রাতা সম্বোধন করে "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে একাধিক কবিতা লিখেছিলেন। সংকলিত কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রবরণের রূপবৈচিত্র্য নানা ভাবানুষঙ্গ ও উপমার মাধ্যমে রূপপরিগ্রহ করেছে। "কড়ি ও কোমল" পড়ে বিমুগ্ধচিত্ত দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে যে কবিতা লিখেছিলেন ('হে রবীন্দ্র তোমার ও সুন্দর সনেট') সেটি তাঁর এইজাতীয় কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আলোচ্য সংকলনে সেই কবিতাটি গৃহীত হলে আরো ভালো হতো। রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত কবিতার মধ্যে কাব্যধর্মের দিক থেকে অক্ষয়কুমারের কবিতাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমারের কবিজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের একটি আত্মিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। বিহারীলালের ভাবশিষ্য হিসাবে এই সগোত্রীয়তা অসম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সূর্যোদয়ের চিত্রকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ সুকুমার পটভূমিকায় ফুটিয়ে তোলা

হয়েছে। অক্ষয়কুমারের রোমাণ্টিক কবিকল্পনা রবির আবির্ভাবকে পরমরমণীয় করে তুলেছে।

অর্ধ-নিদ্রা- জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি—কবি!

পরবর্তীকালের কবিদের কণ্ঠে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের নম্র ভঙ্গিটি আরো সহজ হয়ে উঠেছিল। কবি এর মধ্যে নোবেল প্রাইজ পেয়ে বিশ্ববন্দিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ সমকালীনদের কবিতায় রবীন্দ্রকাব্যের সুর ও টেক্‌নিকের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। এইকালের কবিদের মনোভাব রবীন্দ্রস্নেহধন্য সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

গান গেয়ে তুষি গানের রাজারে
গঙ্গারে পূজি গঙ্গাজলে;
পঞ্চাশতের পান্থশালায়
সাজাই তোমারে পুষ্পদলে।

এ যুগের কবিরা যথার্থই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাব-ভাবনা ও প্রকাশরীতি অবলম্বন করেই তাঁরা রবীন্দ্রবন্দনাসংগীত রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব যে কিভাবে বাংলা কাব্যে বিস্তৃত হচ্ছিল, এ যুগের কবিদের রচনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—

(ক) ফুকারিয়া দিকে দিকে তৃষার্তের তপ্ত-বিভীষিকা
প্রলয়-পিনাক,
উজ্জ্বল পিঙ্গল জটা নেমে আসে রুদ্র-রৌদ্র শিখা
ধূসর বৈশাখ।
(রবীন্দ্র-বন্দনা : হেমেন্দ্রলাল রায়)

(খ) রূপ-সায়রে ডুব দিয়ে কী তুলে অরূপ রতন
শোভার সার গাঁথিলে হার নিখিল চিত্ত-হরণ!
(রবীন্দ্রনাথ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী)

রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাব এ যুগের বাংলা কবিতায় যে কতখানি সক্রিয়, তা উদ্ধৃত দুটি কাব্যাংশ থেকেই প্রমাণিত হবে। সুগঠিত ছন্দোবন্ধ, শব্দচয়ন ও সমাসবন্ধ বাগবিন্যাসের গূঢ়তা রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যপাণির আশীর্বাদে সার্থক হয়ে উঠেছে। কবির আইডিয়ার সূক্ষ্মরস আহরণ করেই কবিবন্দনাকে রূপবান করা হয়েছে। তারাশঙ্করের কবিতায় শুনি—

মেঘ-স্বপ্ন উত্তরীয় সম
শোভিত বিশাল বক্ষে ইন্দ্রধনু বর্ণসুষমায়;
অম্বরচুম্বিত ভাল, উদাসীন অনন্ত সন্ধানী,
হিমানীচন্দন লিপ্ত, শোন নিত্য প্রভাত সন্ধ্যায়
আকাশগঙ্গার পারে সূর্য চন্দ্র তারকার বাণী;

রবীন্দ্রনাথের অজস্র দাক্ষিণ্যে বাংলার কাব্যকুঞ্জে বসন্ত সঞ্চারিত হয়েছে, পুষ্পস্তবকের বর্ণগরিমায় বাংলা কাব্যে যৌবনের বিচিত্র অঙ্গরাগ শিল্পিত হয়েছে। মনের পরিধি যেমন বেড়েছে, তেমনি ভাবের সূক্ষ্ম সংবেদন কাব্যপ্রত্যয়কে ক্রমশ অন্তর্মুখী করেছে। রবীন্দ্রকাব্য আস্বাদনের মধ্যেও বহুমুখী বৈচিত্র্য এসেছে। রোমাণ্টিক মনের সহজ আস্বাদন



মনোজ বসুর কবিতায় রূপ পেয়েছে—

—আজি নও আর কারো,
সারা মনে মোর তোমার কবিতা—পালাও কেমন পারো।

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনব্যাপী যে হিরণ্ময় পূষণ্ বন্দনা করেছেন, পরবর্তীকালে সেই সুরের সঙ্গেই কণ্ঠ মিলিয়ে রবীন্দ্রানুসারী কবিরা তাঁদের আদিত্যবন্দনা করেছেন—

হে পূষণ্
উজ্জ্বলন জ্যোতির্লোকে করো উদ্‌ঘাটন
হিরণ্ময় দ্বার।
স্বপ্নশেষ যাত্রাশেষ হয়েছে আমার।
সে পুরুষ হেরিতেছি আমি
আমারই অন্তরে, যিনি তব অন্তর্যামী। (স্বপ্নশেষ : কানাই সামন্ত)

রবীন্দ্রনাথ একালের কাছে মানবমহিমার চূড়ান্ত পরিণাম। তাই তাঁকে ঘিরে নানা সমূহ আইডিয়া উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিদের কাছে এক প্রদীপ্ত প্রেরণায় পরিণত হয়েছেন—

(ক) যাঁর মাঝে মূর্ত হ'ল মানুষের অমৃত পিপাসা
তাঁহারে প্রণাম। (প্রণাম : প্রেমেন্দ্র মিত্র)

(খ) বড় ছোট, পুরাতন এ পৃথিবী—আমরা যে মহাপক্ষ পাখি,
কে চিনাইলে কবি, ছিনু ভাল ছিনু বন্দী নষ্টনীড়ে থাকি।
(কবি : অজয় ভট্টাচার্য)

(গ) অন্ধকার শিহরিয়া দূরান্তরে সভয়ে মিলায়,
জীবন চঞ্চলি ওঠে নৃত্যশীল আনন্দলীলায়,
কুঞ্জে ফোটে পুষ্প রাশি রাশি।
(রবীন্দ্রনাথ : হুমায়ুন কবির)

(ঘ) তুমি যে রয়েছ কবি, পৃথিবীতে তাই
ভালোবাসা মরেনি আজিও॥
(সঞ্চয়িতা : প্রণব রায়)

একালের তরুণতর কবিরা যুগের যন্ত্রণার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল প্রত্যয় থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ অনন্ত পরমায়ুর কবি, মানব-মুক্তির শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা। জীবনের ব্যথাদীর্ণ রক্তাক্ত মুহূর্তেও তাই রবীন্দ্রসংগীতের নূতন তাৎপর্য—

বৈশাখের শুভ্র স্বপ্ন যত
প্রত্যহ রক্তাক্ত হবে, জানি আমি; এই ত্রস্ত প্রাণে
আবার নামবে রাত্রি, তা-ও জানি; সবুজ ময়দানে
ছিঁড়ে যাবে ঘাসের জাজিম, তীব্র বেদনার শীতে
হৃদয় হলুদ হবে।
—তবু এই মুহূর্তে অন্তত
স্মৃতির বিবর্ণ ঝাঁপি ভরে রাখি রবীন্দ্রসঙ্গীতে।
(সঙ্গী সঙ্গীত : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

সংকলন গ্রন্থটিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে : বন্দনা, সংগীত ও বিলাপ।

'সংগীত' অংশে অতুলপ্রসাদ সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ খ্যাতনামা কবি ও গীতিকারদের সংগীত সন্নিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গানের রাজা, তাই তাঁকে ঘিরে একটি সুরের জগৎ রচিত হয়েছে। সুরের ইন্দ্রজালে তিনি আমাদের হৃদয়ের গোপন উৎস মুক্ত করেছেন—'সুরের গোপন কথা পাঁপড়ি মেলায়।'

বাইশে শ্রাবণকে ঘিরেও বাংলা কাব্যের একটি অধ্যায় রচিত হয়েছে। কবির মৃত্যুদিন জাতীয় জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল, তাকে কবিরা বেদনার অশ্রু অর্ঘ্যে আরতি করেছেন—

শুচিশুভ্র মেঘমালা ঘনীভূত হবে যেথা মোদের অন্তরে,
অমল তুষার পুঞ্জে বিরচিবে হে সুন্দর তব মুখচ্ছবি।
(রবীন্দ্রস্মৃতি : সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র)

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের '২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮' ও মোহিতলালের 'তর্পণ'—কবিতা দুটি সংকলিত হয়ে 'বিলাপ' অংশটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতাটির আঙ্গিক চাতুর্য ও সুরবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রকাব্যের বাক্যাংশগুলি নিয়ে গদ্যাত্মক ভঙ্গিতে কবিতাটি রচিত হয়েছে। মোহিতলালের কবিতায় দীর্ঘবিতানিত ছন্দ, শব্দগাঢ় পদবিন্যাসের মন্থরতা এক দার্শনিক মননশীলতায় মণ্ডিত হয়েছে। কবিতাটি রবীন্দ্রমানসের কাব্যভাষ্যও বটে। উমা দেবী ও শশিভূষণ দাশগুপ্তের কবিতায়ও রবীন্দ্র-কাব্যের রূপময় ব্যাখ্যা উদ্ভাসিত হয়েছে। রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসবের ব্যর্থমূর্তি কোনো কোনো তরুণ কবিকে পীড়িত করেছে—তবুও তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় বিশ্বাস রেখেছেন আধুনিক কবি—

তবু আসবে তুমি ভাবি অন্য মনে
এই পোড়ো জমি ভেঙে অন্যতর সকাল বেলায়
ঘরভরা শূন্যতা সরিয়ে দীপ্তপূর্ণ ;
কিন্তু কবে ?
দ্বিতীয় ভারতবর্ষে দ্বিশতবার্ষিক উৎসবে॥
(শতবর্ষ পরে : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত)

সংকলনের কয়েকটি কবিতা সুরস্বাতন্ত্র্যের জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তার মধ্যে হলো : ২২শে শ্রাবণ স্মরণে (পরিমল গোস্বামী) ও বাইশে শ্রাবণ (সজনীকান্ত দাশ)। পরিমল গোস্বামী 'আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে' কবিতার একটি চমৎকার প্যারোডি করেছেন। সজনীকান্ত দাশের কবিতার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও আপাতবিরোধী তির্যক মন্তব্যটি যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি লক্ষ্যভেদী—

যাঁহারে হনন করি তুমি হবে চিরজীবী, অনাদৃত বাইশে শ্রাবণ,
তাঁহার বিয়োগ ব্যথা যতদিন বাজে বুকে ততদিন তোমারে ধিক্কার—
কৃষ্ণের চরণমূলে যে ব্যাধ হানিল বাণ সে লভিল অমর জীবন,
মহৎ জীবনে এক টানিলে সমাপ্তি রেখা, সাহসী, তোমারে নমস্কার।

"কবি-প্রণাম" সংকলনটি থেকে বাংলা কাব্যের গতিপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে। সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় যা বলেছেন তার যাথার্থ্য অনস্বীকার্য : 'জীবনযাত্রা ও প্রতিবেশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, দেশ ও কালের এই পরিবর্তনের সঙ্গে কবিতাগুলির ভাব, ধ্বনি ও বাচনভঙ্গী বহুল পরিবর্তিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু



সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ কবিতারই অন্তর্নিহিত প্রভাব রাবীন্দ্রিক।'

**রথীন্দ্রনাথ রায়**

**রবীন্দ্রনাথ**—দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ইস্টলাইট বুক হাউস। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অজস্র রচনা চোখে পড়েছে, খ্যাত অখ্যাত নবীন প্রবীণ বহু লেখকই কবির প্রতিভার পরিমাপে নিযুক্ত হয়েছেন, কখনো আত্মনিযুক্ত কখনো বা প্রকাশক-নিযুক্ত। যে সমস্ত লেখা পড়েছি, তাদের অধিকাংশ হয় লেখকের পূর্বতন বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি (কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রণ) কিংবা নতুন কিছু বলবার মোহে ন্যায়সূত্র-ছিন্ন কতকগুলি বাক্যের সমাহার। কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা যে পড়িনি, তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য।

"রবীন্দ্রনাথ" নামধেয় এই সংকলনগ্রন্থ 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি'র উদ্যোগে প্রকাশিত। এবং অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত এই গ্রন্থে যাঁদের রচনা সঙ্কলিত হয়েছে, তাঁদের অনেকেই "রবীন্দ্রায়ণ" ও অন্যান্য সংকলন-গ্রন্থেও অংশগ্রহণ করেছেন। স্বভাবতঃই তাঁরা তথাকথিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক কিংবা সাহিত্যিক (সংখ্যায় অধ্যাপকই বেশি)। বর্তমান সংকলনে অবশ্য এমন কয়েকজন উপস্থিত, যাঁদের রচনা আগে বিশেষ পড়িনি। কিন্তু বলতে ভালো লাগছে তাঁদের কারো কারো রচনায় আন্তরিকতার, আত্মবিশ্বাসের ও সর্বাঙ্গীণ রচনাসৌষ্ঠবের পরিচয় পেয়েছি।

সংকলনের দুই প্রান্তে দু জন প্রথিতযশা অধ্যাপক—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সরোজকুমার দাস, প্রথমজন লিখেছেন 'বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথ', দ্বিতীয়জন 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন'। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতে রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক সাধনা 'পেশাদার ভাষা-তাত্ত্বিকের মত ছিল না' কিন্তু তা যে 'অনন্যসাধারণ' ছিল 'তাহার পরিচয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা ছন্দ বিষয়ে আলোচনায় ভূরি ভূরি আছে।' তাঁর মতে, 'রবীন্দ্রনাথের ভাষার উপর অধিকার এবং ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করিলে, সত্যই তাঁহাকে বাক্‌পতি বলিয়া সংবর্ধনা করিতে হয়।'

রবীন্দ্রপ্রতিভা যে কতখানি সর্বন্ধর কত বিচিত্রপথগামী ছিল পাঠক তার কিছুটা পরিচয় যেমন পাবেন প্রবীণ ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের লেখায়, তেমনি পাবেন নবীন অধ্যাপক দীপংকর চট্টোপাধ্যায়ের নিবন্ধে। 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-চেতনা'র লেখকও 'রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না...তিনি ভালভাবেই জানতেন, এ পথের সাধনা স্বতন্ত্র এবং সিদ্ধিও ভিন্ন ধরনের' উক্তি সত্ত্বেও কবির "বিশ্বপরিচয়"গ্রন্থকে বিশিষ্ট রচনার মর্যাদা দিয়েছেন; বলেছেন 'বিশ্বপরিচয়ের মত একটি চটি বইয়ের রচয়িতা হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে অনেক কৃতী বিজ্ঞানীও লজ্জিত হতেন না।' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মূলত সাহিত্যস্রষ্টা হলেও বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন, 'বৈজ্ঞানিক অনুশীলনপদ্ধতি সম্বন্ধে' বিশেষ আস্থাবান ছিলেন এবং "বিশ্বপরিচয়" রচনাতেই শুধু নয়, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থাতেও বিজ্ঞানকে উপযুক্ত স্থান দিয়ে তাঁর বিজ্ঞানচেতনার প্রমাণ দিয়ে গেছেন।

কি সম্পর্কে না ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ? সঙ্গীততত্ত্ব, ইতিহাস, শিক্ষাতত্ত্ব এমন কি সমবয়-নীতি পর্যন্ত। মনে পড়ে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে তাঁর সভাকবি হরিষেণ 'নিশিত-বিদগ্ধমতি' বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন, এই বিশেষণ একালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাকে সার্থকভাবে প্রযোজ্য? রবীন্দ্র-চিন্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরও কয়েকটি রচনার উল্লেখ করতে হয়; যেমন, সুধীরচন্দ্র রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শ',' এবং প্রিয়তোষ মৈত্রেয়র 'রবীন্দ্রনাথের আর্থনীতিক চিন্তা'। দুটি প্রবন্ধই তথ্যনিষ্ঠ ও সুলিখিত। প্রথম-জনের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব ও আদর্শ রবীন্দ্রনাথেরই মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ' উক্তিটি যতখানি সত্য ঠিক ততখানিই সত্যগর্ভ দ্বিতীয় জনের মন্তব্য যে রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি-প্রাসঙ্গিক রচনায় 'ঔপনিষদিক মানবতাবাদ ও প্রগতিশীল অর্থনৈতিক চিন্তার সমাহৃত রূপ' পরিদৃশ্যমান।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পদচারণার ইতিহাস এতই সুবিদিত যে সে সম্পর্কে নতুন কোন কথা বলা সহজ নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চিন্তা সম্পর্কে কিছু জানবার কৌতূহল হয়। ঠিক এই বিষয় অবলম্বী কোন নিবন্ধ আলোচ্য সংকলনে অনুপস্থিত। তবে কাজী মোতাহার হোসেনের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' এবং অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ' একত্রে মিলিয়ে পড়লে সাধারণভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে উল্লেখ্য তথ্য ও তত্ত্বগুলি জানা যায়। বিশেষ করে শেষোক্ত প্রবন্ধ অর্থাৎ 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ' প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তথ্যের সার্থক সমন্বয়ে বিশিষ্ট রচনা বলে দাবি করতে পারে।

রবীন্দ্রচিত্রকলা সম্পর্কে প্রবন্ধ আছে। নাম 'দন্তুর সভ্যতার শিল্পী রবীন্দ্রনাথ', লিখেছেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখাটিতে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে বিচার করার যে-চেষ্টা আভাসিত সেটা ভালোই। তাঁর মতে '১৯৩০ পর্যন্ত সুপরিচিত কবি রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্যজগতে যে ভূমিকা, তার সঙ্গে পরবর্তী দশকের চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তাটা দূর সম্পর্কের' এবং এই মতের সমর্থনে তিনি ১৯৩০-এর পরবর্তী কবিতা থেকে ইতঃস্ততভাবে অংশ উদ্ধৃত করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে 'এ যুগের কবিতা ও ছবিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলি আত্মীয়তাসূত্রে পরস্পরাবদ্ধ।' তাঁর এ মন্তব্য অর্থহীন এমন কথা বলছি না, কিন্তু জ্যামিতির উপপাদ্যের মত স্বীয় বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করবার যে-প্রয়াস তাঁর নিবন্ধে বিদ্যমান, তা সমর্থনীয় নয়। দুটি প্রশ্ন তাঁকে করি : প্রথম, রবীন্দ্রচিত্র-ধৃত যে ফ্যান্টাস্টিক জন্তুর বা বীভৎসরসের কিংবা অবচেতনলোকের যে নিঃশব্দ প্ররোচনার কথা তিনি বলেছেন, তাদের সাহিত্যগত সমান্তর কি শুধু ১৯৩০-পরবর্তী কবিতাবলীতেই অনুসন্ধেয়? ১৯১৬ সালে প্রকাশিত "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে পাঠক যে 'আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু'র (কবির বর্ণনায় : 'তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে'; শচীশের ডায়েরির অন্তর্গত) সাক্ষাৎ পায়, সেই জন্তুই ১৯৩০-পরবর্তী রবীন্দ্রচিত্রে কি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে নি? দ্বিতীয়, "বলাকা" বা বলাকাপর্বেই কি কঠোর, পরুষ, অনেক সময় ভয়ঙ্কর রূপক বা চিত্র (চিত্রকল্প কথাটি আমার কাছে অর্থহীন বোধ হয়) আত্মপ্রকাশ লাভ করে নি (যেমন, কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগরসাথে মিশে : বলাকা ৫; সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত জ্বালায়ে মশাল-আলো : বলাকা ৪২; পক্ষান্তরে, ১৯৩০-পরবর্তী কবিতাবলীতে কি এমন উদাহরণ নেই যা 'পুরোন কাব্যের চেনা রূপক ও প্রতীকের সুকুমার মার্জিত জগত'-এর (উদ্ধৃতি চিহ্নান্তর্গত অংশ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের)? "পুনশ্চ" গ্রন্থের 'সুন্দর' বা



"আরোগ্য" গ্রন্থের 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' ইত্যাদি কি চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধ এবং সত্য ও সুন্দরের ধ্রুপদী ঐশ্বর্যে কবির আস্থানির্ভরতার পরিচয়বাহী নয়? সারত, রবীন্দ্র-নাথের মত প্রতিভাদের ক্ষেত্রে ঘটনামাত্রই দুয়ে দুয়ে চার হয়ে দেখা দেয় না। তাঁদের ক্ষেত্রে বিচার করতে হবে তাঁদের সার্বিক ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে। অবশ্য শ্রীবন্দ্যো-পাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত যে-প্রেমিস থেকে জাত তা হল সাহিত্যিক ও চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুই ব্যক্তিত্ব এবং এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টির জন্যে কবি নিজেই মুখ্যত দায়ী (তাঁর উক্তি : কবিতার রবীন্দ্রনাথ আর ছবির রবীন্দ্রনাথ এক নয়)। তবে আগেই বলেছি, চিত্রী রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে বিচার করার চেষ্টার জন্যে লেখক প্রশংসা পেতে পারেন এবং রবীন্দ্রজীবনের শেষ দশ বছরের সাহিত্য-ও চিত্র-ফসলের মধ্যে সম্পর্ক লক্ষণীয় রকমের।

"রবীন্দ্রনাথ" সংকলনে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা সম্পর্কে কোন রচনা নেই। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস প্রাসঙ্গিক রচনাগুলি কি মনোযোগের যোগ্য নয়? না কি 'পশ্চিম-বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি'তে সাহিত্যমনা কোন ইতিহাসের অধ্যাপক নেই? তেমনি নেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে সামগ্রিক কোন আলোচনা। শিশির চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের দুখানি উপন্যাস' প্রবন্ধটি "চতুরঙ্গ" ও "ঘরে বাইরে"-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। স্বভাবতঃই ঐ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রতিপ্রকৃতি, মানব-চরিত্রায়ন, জীবনের বিভিন্ন সমস্যার রূপায়ণ ইত্যাদি বিষয়ে সামগ্রিক কোন ধারণা পেতে সাহায্য করে না। এ জন্য অবশ্য লেখক দায়ী নন। প্রবন্ধটি পড়ে ভালো লাগার কারণ তাতে আমি আমার একটি ব্যক্তিগত মতের সমর্থন পেয়েছি। সেটি "চতুরঙ্গ" বিষয়ে। "চতুরঙ্গ" আমার মতে বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় উপন্যাস, তথাকথিত মনস্তত্ত্ব-প্রধান বাংলা উপন্যাসে একটি অপরিহার্য দিকস্তম্ভ। উপন্যাস রচনার রীতিবিচারে যাঁরা "চতুরঙ্গ"কে আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত বলেছেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই একটি বিশিষ্ট রচনারীতি সর্বত্র প্রযোজ্য হতে পারে না, বিষয়ভেদে উপন্যাসের মাধ্যমভেদ হয়, "গোরা"র আদর্শে "চতুরঙ্গ" রচনা সম্ভব হয় না।

আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থে রবীন্দ্রসাহিত্য-বিষয়ক অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অমলেন্দু বসুর 'হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট'। সাম্প্রতিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক বসু কবির রচনাবলীর বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে 'রবীন্দ্রনাথের সৃজনীচিত্ত বিষয়মগ্ন ও আত্মমগ্ন।' বিভিন্ন সংকলনে ও পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়েছে রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-উৎসবে বাংলা প্রকাশনজগত আর কিছুর জন্যে না হোক একজন সমর্থ রবীন্দ্রসাহিত্য-ব্যাখ্যাতাকে উপস্থিত করার জন্যে ধন্যবাদ পেতে পারেন। অপর উল্লেখ্য রচনা সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্যের 'চরিতসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ', যার প্রতিপাদ্য 'তাঁর জীবনীমূলক প্রবন্ধগুলি subjective বা ভাবগত-সত্যদৃষ্টি মণ্ডিত।' নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্র-নাথের মানবিকতা' এবং সরোজকুমার দাসের 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন' প্রবন্ধদ্বয়ও আলোচ্য সংকলনের সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।

পরিশেষে, "রবীন্দ্রনাথ" নামীয় সংকলন-গ্রন্থটি রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ঐ জাতীয় অজস্র সংকলন-গ্রন্থের মধ্যে বিশিষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে।

**কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত**

**মহামানবের সাগর তীরে**। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, কলিকাতা ২০। মূল্য চার টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এদেশের প্রাত্যহিকতা যেন নির্ভার হয়েছে, দিন-রজনীর রং কিছু বদলেছে—এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। মনে হওয়া স্বাভাবিক, কয়েক দশক আগে যেমন দেখা গেছে তেমন রবীন্দ্রগতপ্রাণ এখন হয়ত ক্রমেই বিরলদৃষ্টান্ত, তবু রবীন্দ্রপ্রতিভার সহৃদয়বিদগ্ধ অথচ নির্মোহ সত্যানুসন্ধানে এই কালও সানন্দে মগ্ন। গত কয়েক মাসে প্রকাশিত অজস্র সংকলনগ্রন্থ তার প্রমাণ। এই সব সংকলনগ্রন্থ যাঁরা সাগ্রহে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, একটিমাত্র সংকলনগ্রন্থে রবীন্দ্রচারিত্র্য উন্মোচন বাতুল কল্পনা। এর ফলে যেসব সংকলনের অন্তর্গত প্রবন্ধে এযাবৎ অনালোচিত অথবা অগভীর আলোচনায় অপূর্ণ বিভিন্ন রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ গভীর ও ব্যাপক সত্যাশ্রয়ী বিশ্লেষণে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে শুধু সেই সংকলনগুলি সঙ্গত কারণেই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে।

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত এই সংকলন গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য নির্দ্বিধায় স্বীকার্য। অ-বঙ্গভাষী ভারতীয় ও বিদেশীদের বাঙলা ভাষায় রচিত রবীন্দ্র-প্রশস্তি গ্রন্থখানিতে সংকলিত। অ-বাঙলাভাষী ভারতীয় ও বিদেশীদের যে সব গদ্য ও পদ্য রচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে কিছু কিশোরোচিত হলেও কয়েকটি প্রবন্ধ বৈদগ্ধ্যের লক্ষণাক্রান্ত। অন্তত সেই ক'টি প্রবন্ধকে শুধু সস্নেহে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। দেবপ্রিয় বলিসিন্‌হার 'বুদ্ধপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ', পিয়ের ফালোঁর 'একটি নমস্কারে', এস কৃষ্ণমূর্তির 'জীবনস্মৃতির ছেলেবেলা', এন রুক্মিণী স্বামীর 'গীতাঞ্জলির মর্মকথা', উমাশংকর যোশীর 'কুমু একটি পাখি' এবং আরও দু'একটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গ-বিশ্লেষণ গভীর। কয়েকজন প্রবন্ধকারের বাক্যগঠন ও শব্দবাছাই নিপুণ। কুমারী তান ওয়েনের 'রবীন্দ্রনাথ ও চীন' তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকটি প্রবন্ধে এই প্রত্যয় প্রকাশিত যে, রবীন্দ্র-নাথের প্রসারিত দৃষ্টি ভৌগোলিক সীমানিরপেক্ষ।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ লিখিত ভূমিকা দু'টি বইটির সম্পদ।

সুধাংশু ঘোষ